শ্রীশ্রীসারদা দেবী

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

মডেল পাব্‌লিশিং হাউস
২এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক : এস্. মণ্ডল
বিদ্যামন্দির, ঢাকুরিয়া

প্রথম সংস্করণ : ১৮ই ভাদ্র, ১৩৪৭
চতুর্থ সংস্করণ : ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৬০

মূল্য : পাঁচ টাকা

মুদ্রাকর : শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপক্রমণিকা

আরম্ভ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত জননী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর লোকপাবনী জীবন কথা সমগ্রভাবে এই প্রথম প্রকাশিত। তাঁহার শ্রীপদে স্থানলাভের (১৭ই পৌষ, ১৩২৫) কিছুকাল পূর্ব হইতে প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ তাঁহার চরিতানুধ্যান ও তদীয় সন্তানগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে লেখকের হৃদয়পটে তাঁহার যে রূপ ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহাই ভাষায় প্রতিফলনের চেষ্টা করা হইয়াছে। অন্তর্যামিনীরূপে তিনিই প্রেরয়িত্রী।

তাঁহার শিষ্য সন্তানগণের ভিতর দিয়া অনুপ্রেরণা আসে। বরিশালে শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়ের নিকট স্বামী সারদানন্দ মহারাজের কথা সংগ্রহ করিতে বসিয়া আপনা হইতে কিছু শ্রীশ্রীমার কথা লিখিত হইয়া যায়, এবং সুরেনবাবু তাঁহার সম্বন্ধে অপ্রকাশিত কথাসমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য লেখককে অনুরোধ করেন। সেদিন ১৩৩১ সালের রথযাত্রা। অতঃপর রাঁচিতে ১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে, গুরুভ্রাতা শ্রীসুরেন্দ্রকান্ত সরকার ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘটকের উদ্দীপনায় অসংখ্য বাধাবিঘ্নের মুখেও পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার সঙ্কল্প করা হয়।

উপাদান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির স্থানে স্থানে শ্রীশ্রীমার প্রথমার্ধ জীবনের কতিপয় মুখ্য ঘটনা সন্নিবেশিত আছে। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' নামক পুস্তকে তাঁহার জীবনের কতকগুলি ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে জানা যায়। জীবনী লিখিবার সময় এই পুস্তক-গুলির সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

ঠাকুরের সময়কার যে-সকল স্ত্রী-ভক্ত দীর্ঘকাল শ্রীশ্রীমার সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন মাত্র জীবিত, এবং মার মন্ত্রশিষ্যগণ— তন্মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোকান্তরিত—দেশময় ছড়াইয়া: এমতাবস্থায় ইঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মার জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগকে কানপুর হইতে রেঙ্গুন পর্যন্ত নানাস্থানে গমন করিতে ও প্রায় দুইশত ভক্তের সঙ্গে মেলামেশা অথবা পত্রব্যবহার করিতে হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ জানাইয়া পত্রিকায়ও বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্যগণের অধিকাংশই তাঁহার সঙ্গে জীবনে মাত্র দুইতিন দিন বা দুইএক বার মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তাহারা তাঁহার দুইএকটি উপদেশ বা দুইএকটি

আচরণের কথা ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারেন না। ঐসকল উপদেশ ও আচরণের স্মৃতি তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের মুখ্য অবলম্বন; সুতরাং তাঁহাদের উক্তিতে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা অল্প। যাঁহারা মার প্রতিবেশী বলিয়া ঘনঘন তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইতেন, এবং যাঁহারা তাঁহার কাছে আসিয়া দুইএক মাস বা দুদশ দিন অবস্থান করিতেন, তাঁহাদিগকেই তিনি নিজের জীবনের অনেক ঘটনা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিতেন; কখন বা তাঁহারাই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতেন। এই সকল কথা অল্প সময়ের ব্যবধানে লিখিত না হইলে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা অধিক। আমরা লিখিত ও অলিখিত দুইপ্রকার বিবরণই পাইয়াছি, এবং সম্ভবস্থলে একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির উক্তি মিলাইয়া গ্রন্থের উপাদান নির্দোষ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বক্তা নিজেই যে ঘটনা বা কথা সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করিতে অক্ষম উহাকে গ্রন্থমধ্যে স্থান দেওয়া হয় নাই। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির সহায়তার জন্য যাঁহাদের নিকট হইতে উপাদানসমূহ সংগৃহীত, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমার ভাষা

শ্রীশ্রীমা দেশে অবস্থান-কালে, বিশেষতঃ দেশের লোকদের সহিত কথাবার্তায়, দেশে প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং কলিকাতায় অবস্থান-কালে, বিশেষতঃ কলিকাতার লোকদের সহিত কথাবার্তায়, কলিকাতার ভাষা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু কলিকাতার ভাষা ব্যবহার করিবার সময়ও উহার সঙ্গে দেশের ভাষার কতকগুলি বিশেষত্ব মিশিয়া যাওয়া অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। মার মুখোচ্চারিত ভাষা বিবরণ-দাতারা যেমন বলিয়াছেন বা লিখিয়া দিয়াছেন, আমরা প্রায় সেইরূপই রাখিয়াছি। কারণ, তাহাতে মার মুখের কথা অনেকটা সংরক্ষিত থাকার সম্ভাবনা।

বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র একরূপ ভাষার প্রচলন নাই। জয়রামবাটী-অঞ্চলের কথ্য-ভাষার কয়েকটি বিশেষত্ব নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

(১) জয়রামবাটী-অঞ্চলের কথ্যভাষায় তিনকালেই ক্রিয়ার পরে 'নি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। অতীতকালে 'নি' ও 'নাই' এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ হয় এবং 'নি' অপেক্ষা 'নাই' শব্দের প্রয়োগ অধিক। 'নেই' শব্দের ব্যবহার একেবারেই নাই। (২) ক্রিয়ান্তে কেবল 'লুম' ব্যবহৃত হয়; 'লেম' বা 'লাম' ব্যবহৃত হয় না। (৩) 'ভিতর' 'উপর' প্রভৃতি শব্দ অবিকৃত থাকে; উহাদের আদ্যস্বরের গুণ হয় না। কোন কোন ক্রিয়াপদে আদ্যস্বরের বিকল্পে গুণ হয়: যেমন,—দিবে, দেবে। কোন কোন শব্দে অন্ত্যস্বরের বিকল্পে পরিবর্তন হয়: যেমন,—পূজা, পূজো; (বহুবচন-সূচক) গুলি, গুলো; ইচ্ছা, ইচ্ছে। (৪) কতকগুলি

শব্দের মধ্যস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণে কলিকাতার মত দ্বিত্ব হয় না : যেমন,—এখুনি, সবাই। (৫) কতকগুলি ক্রিয়াপদে মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ অকারান্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় : যেমন,—কুলত (কুলাইত), জুড়বে (জুড়াইবে), শুকতে (শুকাইতে), ঘুমব (ঘুমাইব), বেরয় (বাহির হয়), উঠতেন (উঠাইতেন), ফুরতে (ফুরাইতে), বুলতে (বুলাইতে)। (৬) 'কাউকে' শব্দের প্রয়োগ নাই; 'কারুকে' বা 'কাকেও' ব্যবহৃত হয়। নিম্নোক্ত পদগুলিতেও কলিকাতাদি স্থানের সঙ্গে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে : বোজাতুম (বোঝাতুম), ত্থফুর, জ্যোৎসনা, শাস্ত্রি, অদিষ্টে, রান্তে (রাঁধতে), নপুরে, (নেপুরে), গিরস্তের, ঠিঁ য়ে।

সঙ্কেতের অর্থ

গ্রন্থমধ্যে [আ], [ই] ইত্যাদি সাঙ্কেতিক চিহ্নসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে। [আ]= আশুতোষ মিত্র প্রদত্ত বিবরণ। [ই]=ইন্দুমতী দেবী প্রদত্ত বিবরণ। [উ]=উমেশচন্দ্র দত্ত প্রদত্ত বিবরণ। [গ]=গণেন্দ্রনাথের সংগ্রহ; বা গণেন্দ্রনাথ প্রদত্ত বিবরণ। [ত]= তপানন্দ-স্বামী প্রদত্ত বিবরণ। [ধ]=ধর্মানন্দ-স্বামীর সংগ্রহ। [ন]=নলিনবিহারী সরকার প্রদত্ত বিবরণ। [নি]=নিকুঞ্জদেবী প্রদত্ত বিবরণ। [প্র]=প্রভাকর মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত বিবরণ। [বি]=বিভূতিভূষণ ঘোষ প্রদত্ত বিবরণ। [ম]=মহাদেবানন্দ-স্বামী প্রদত্ত বিবরণ। [স]=সৎসঙ্গানন্দ-স্বামী প্রদত্ত বিবরণ। [সু]=সুরেন্দ্রকান্ত সরকার প্রদত্ত বিবরণ। [দি]=স্বামী সারদানন্দের দিনলিপি। [পুঁ]=শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি। [লী]= শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ।

সুরেন্দ্রকান্ত সরকার, নলিনবিহারী সরকার, বিভূতিভূষণ ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত ও প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই পাঁচটি পূর্ণনামের পরিবর্তে সুরেনবাবু, নলিনবাবু, বিভূতিবাবু, উমেশবাবু ও প্রবোধবাবু লেখা হইয়াছে।

চরিত্রাঙ্কনের ধারা

শ্রীশ্রীঠাকুরের মত শ্রীশ্রীমার জীবনেও মানব-সুলভ বা লৌকিক এবং দেবত্বের সূচক বা অলৌকিক ঘটনাবলী পাশাপাশি বিদ্যমান। মানবভাবের প্রাধান্য সত্ত্বেও, মানবীয় আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের দেবস্বরূপ যেখানে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত, লৌকিক ও অলৌকিক মধুর সামঞ্জস্যে সম্মিলিত, মানুষ দেবতাকে ও দেবতা মানুষকে আলিঙ্গন করিয়া অভিন্ন মূর্তিতে প্রতিভাত, সেখানে অলৌকিক ব্যাপার ছাঁটিয়া বাদ দিয়া কেবলমাত্র লৌকিক ব্যাপার লইয়া চরিত্রাঙ্কন-চেষ্টা অস্বাভাবিক; এবং ঐরূপ চেষ্টার বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়াও মনে হয় না। সেইজন্য, শ্রীশ্রীমার জীবনলীলা প্রকাশ

করিতে যাইয়া আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর ব্যাখ্যাতা স্বামী সারদানন্দ মহারাজের অনুগামী হইয়া তাঁহাকে 'দেব-মানব'রূপে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি।

শেষ কথা

লেখার কাজ একজনের দ্বারা সম্পন্ন হইলেও উহার সঙ্গে শ্রীশ্রীমার অনেক ত্যাগী ও গৃহী সন্তানের উদ্যম জড়িত। মার উপর ঐকান্তিক ভক্তি-ভালবাসার জন্যই তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে মার সেবকসন্তান শ্রীগণেন্দ্রনাথ ও শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুহৃদ্বর শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আন্তরিক যত্ন সহকারে শ্রীশ্রীমার কোষ্ঠীবিচার করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তৎকৃত বিচারপ্রণালী জ্যোতির্বিদ্‌গণের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অশেষ করুণায় তাঁহার আবির্ভাবের শততম বর্ষ পূর্ণ হওয়ার মুখে গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আমাদের সংগৃহীত বিবরণসমূহের মধ্যে প্রকাশের যোগ্য যাবতীয় বিষয়ই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নানা সূত্র ধরিয়া বিশেষ বিশেষ ঘটনার কালনির্ণয় করিতেও এবার সক্ষম হইয়াছি বলিয়া মনে হয়। 'শ্রীম' বা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তদীয় সহধর্মিণী শ্রীমতী নিকুঞ্জদেবীর মুখে শুনিয়া কিছু কথা তাঁহার দিনলিপিতে লিখিয়া রাখেন; উহা নিকুঞ্জদেবী প্রদত্ত বিবরণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কোন কোন অধ্যায়ের নাম-পরিবর্তন বা নাম-সংক্ষেপ করা হইলেও বিষয়বস্তু প্রায় পূর্ববৎ আছে এবং 'শ্রীস্বামিজী ও শ্রীমহারাজ' শীর্ষক একটি নূতন অনুচ্ছেদ পরিশিষ্টে যোজিত হইয়াছে। নিবেদনমিতি।

বিনীত—গ্রন্থকার

সূচীপত্র



শ্রীশ্রীসারদা দেবী

প্রথম অধ্যায়

জন্মভূমি জয়রামবাটী

বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্রগ্রাম জয়রামবাটী পল্লী-লক্ষ্মীর বিচরণ-ভূমি। এতদঞ্চলের ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত গ্রামগুলির মধ্যে ইহা সমধিক শস্যপূর্ণ ও জনাকীর্ণ। ঘনঘন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাঁকুড়ার বহুসংখ্যক গ্রামের মত জয়রামবাটীকে মোটা ভাতকাপড়ের অভাবগ্রস্ত হইতে সচরাচর দেখা যায় না। বিদেশী সভ্যতার কেন্দ্রস্থল নগরসমূহ হইতে দূরে অবস্থান করায় পল্লীবাসীরা বর্তমান কালেও স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত।

গ্রামের উত্তরপাশে একখানা শস্যশ্যামল ক্ষুদ্র মাঠ; অক্লান্তকর্মা কৃষককুল তাহার গ্রাম-সন্নিহিত অংশে আশুধান্য, রবিশস্য, ইক্ষু, গম ও বিবিধ শাক-সব্‌জি উৎপাদন করিয়া থাকে। মাঠখানি পার হইয়া গেলে দেখা যায়, স্বচ্ছসলিল ক্ষুদ্রনদ 'আমোদর' উত্তরদিক্ হইতে আসিয়া, জয়রামবাটীর সন্নিকটে পূর্বাভিমুখে বাঁকিয়া, গ্রামের উত্তরসীমা নিরূপণ করিতেছে। নদের ওপারে দেশড়া নামে বৃহৎ গ্রাম। পশ্চিম বাঙ্গলার অধিকাংশ নদনদী প্রায় বুজিয়া আসিলেও, এই স্বল্পপরিসর নদটি আয়তনের তুলনায় গভীর এবং বারমাসই তাহাতে জল থাকে। শ্রীশ্রীসারদা-মাতা বালিকা-বয়সে ছোটছোট ভাইদিগকে সঙ্গে লইয়া এই আমোদরে 'গঙ্গাস্নান' করিতে আসিতেন। ক্রীড়াচঞ্চলা বালিকার ধূলি-লুণ্ঠিত বস্ত্রাঞ্চলের মত আমোদর এমনই মনোহর-গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইতেছে যে, এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির উত্তর প্রান্তেই দুইটি মনোহর উপদ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে। তন্মধ্যে পূর্বোত্তর কোণের উপদ্বীপটি কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশান। উহা বট-অশ্বত্থ-আম্রাদি-বৃক্ষসমাকীর্ণ হওয়ায় ছায়া-নিবিড় এবং বকুল-গুলঞ্চাদি-পুষ্প-গন্ধে

আমোদিত। শ্রীসারদানন্দ-মহারাজ মাতৃদর্শনে আসিয়া এই শ্মশানের কেন্দ্রস্থলে, অধুনালুপ্ত আমলকী-বৃক্ষের তলায় ধ্যানমগ্ন হইতেন।

জয়রামবাটীর পূর্বদিকে, আমোদরের অপর পারে তাজপুর নামে অনতিবৃহৎ গ্রাম; দক্ষিণে জিবট্যা, দক্ষিণপশ্চিম কোণে মসিনাপুর, পশ্চিমে শিহড়। চতুষ্পার্শ্ববর্তী ঐসকল গ্রামের কোনটিই জয়রামবাটী হইতে এক মাইলের অধিক দূরবর্তী নহে। জয়রামবাটীর নিজস্ব কোন হাট না থাকায় কায়িক পরিশ্রমে নিজেদের জমিতে উৎপন্ন যৎসামান্য তরীতরকারীতেই গ্রামের লোক সন্তুষ্ট থাকে। কদাচিৎ বস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিতে হইলে তাহাদিগকে সাড়ে তিনক্রোশ উত্তরে কোতুলপুর, তিনক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে কয়াপাট, কিংবা দুইক্রোশ দক্ষিণপূর্বে কামারপুকুরে যাইতে হয়। কামারপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান—পুণ্যভূমি।

জয়রামবাটীকে কেন্দ্র করিয়া অদূরবর্তী অনেকগুলি গ্রাম শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার একতরের, কিংবা উভয়েরই স্মৃতিচিহ্ন বুকে লইয়া ধন্য হইয়া আছে। তন্মধ্যে আনুড়, শ্যামবাজার, শিহড় ও কোয়ালপাড়া প্রধান। গ্রামস্থ ভক্তিমতী মেয়েদের সঙ্গে আনুড়ে ৺বিশালাক্ষী-দর্শনে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বালক শ্রীগদাধর দেবীর ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্তন-রঙ্গ—উহার আকর্ষণী শক্তি দেখিতে অভিলাষী হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামবাজারে সাত অহোরাত্র সঙ্কীর্তন-বিলাসে মত্ত হইয়াছিলেন। শিহড়ে ঠাকুরের পিতৃষ্বস্রীয় ভগিনীর বাড়ী এবং মার মাতুলবাড়ী থাকায় বাল্যাবধি উভয়েরই তথায় বহুবার গমনাগমন হইয়াছিল। বিষ্ণুপুর হইয়া কলিকাতা যাতায়াতের পথে মা কোয়ালপাড়ায় দুইএক দিন বা দুইএক ঘণ্টা বিশ্রাম করিতেন। তিনবার সেখানে কিছু অধিককাল বাসও করিয়াছিলেন। কোয়ালপাড়া তাঁহার 'বৈঠকখানা'।

আয়তনে জয়রামবাটী ক্ষুদ্র হইলেও এবং উহাতে জমিদার বা তেমন ধনী লোকের বাস না থাকিলেও, গ্রামে আনন্দোৎসবের একেবারে অভাব ছিল না। এখনও চব্বিশপ্রহরীয় বা অষ্টপ্রহরীয় হরিবাসর, বারোয়ারী কালীপূজা, শীতলাপূজা ও দোল-দুর্গোৎসবে গ্রামের লোক যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করে; এবং সম্ভব হইলে, সকলে মিলিয়া যাত্রাগানেরও ব্যবস্থা

করিয়া থাকে। যাত্রাগান শুনিবার জন্য মাতুর-বগলে গ্রামান্তরে যাওয়ার প্রথা জনসাধারণের মধ্যে আজিও অব্যাহত আছে।

শিবের গাজন উপলক্ষ্যে পূজা দিতে ও মেলা দেখিতে জয়রামবাটীর লোক সন্নিকটস্থ শিহড় গ্রামে যায়। শিহড়ের 'শান্তিনাথ' শিব ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ দেবতা।

বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম শ্রীধর্ম ধর্মঠাকুরে পরিণত হইয়া পশ্চিম বঙ্গের স্থানে স্থানে, সাধারণতঃ কূর্মপ্রতীকে, অদ্যাপি পূজা পাইতেছেন। জয়রাম-বাটীর 'যাত্রাসিদ্ধি-রায়' নামক ধর্মঠাকুরের মন্দির এক সময়ে ঐ অঞ্চলে ধর্মপূজার প্রভাব বিজ্ঞাপিত করে। গ্রামের জাগ্রত দেবতা ৺সিংহবাহিনী ত্রিমূর্তিতে বিরাজিতা থাকিয়া, শুধু গ্রামবাসীদিগকেই নহে, দূরবর্তী স্থানের লোকদিগকেও নিজমন্দিরে নিত্য আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন। শারদীয় দুর্গাপূজার সময় কালিকাপুরাণোক্ত বিধানে সাড়ম্বরে দেবীর অর্চনা হইয়া থাকে।

সর্বোপরি, শ্রীশ্রীমার জন্মস্থানের উপর ইষ্টকনির্মিত বৃহৎ মন্দিরের দুগ্ধ-ধবল চূড়া ও সেই চূড়ার শিখরদেশে 'মা'-নামাঙ্কিত নিশান বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইয়া সকলকে আজ জয়রামবাটীর মহাপীঠত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দূরদূরান্তর হইতে, এমন কি সুদূর আমেরিকা হইতেও, তীর্থযাত্রীর দল যানবাহনাদির অসুবিধা তুচ্ছ করিয়া, জয়রামবাটীর পূতমৃত্তিকা-স্পর্শে ধন্য হইবার বাসনায় ছুটিয়া আসিতেছে। যাঁহার আবির্ভাবভূমি বলিয়া, যাঁহার দিব্য লীলাবিলাসের অক্ষয় স্মৃতিসমূহ চিত্তলোকে সঞ্চিত রাখিয়াছে বলিয়া, জয়রামবাটী চিন্ময়ধামরূপে ভক্তমানসে স্ফুরিত হইতেছে, সেই মানবীরূপিণী দেবীর চরণপদ্মে বারবার প্রণত হইয়া তাঁহার জন্মাদি-কথা যথাশক্তি বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

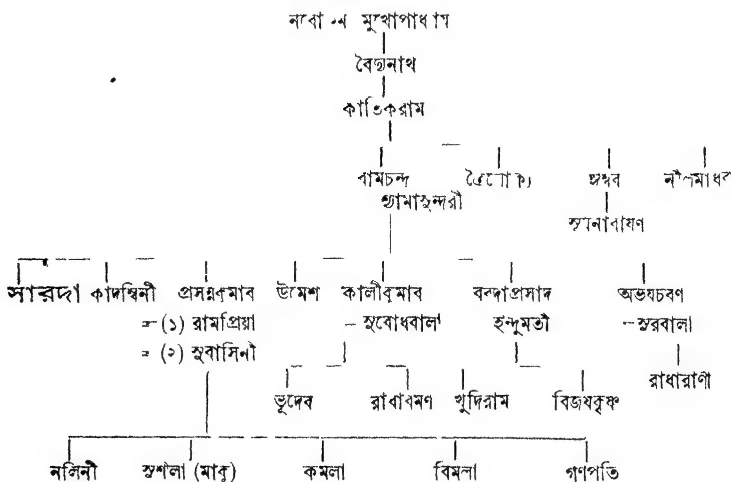
দ্বিতীয় অধ্যায়

আবির্ভাব

জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।[১] পুরুষানুক্রমে 'রাম'-মন্ত্রের উপাসক রামচন্দ্রের স্বীয় ইষ্টে ঐকান্তিকী ভক্তি ছিল। তিনি দরিদ্র হইলেও পরোপকারী এবং নিরতিশয় নিরভিমান ছিলেন। যথাকালে শিহড়ের হরিপ্রসাদ মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। শ্যামাসুন্দরী সর্বগুণে স্বামীর অনুরূপা ছিলেন। তাঁহার নির্মলচরিত্র ও দৃঢ়চিত্ততার কাহিনী এখনও জয়রামবাটীর লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এই দরিদ্র অথচ পরমভক্ত পিতামাতার ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়া শ্রীমতী সারদা সংসারে আগমন করেন। পরবর্তী কালে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে স্বীয় পিতামাতার গুণাবলী এইরূপে কীর্তন করিতে শুনা যাইত ঃ আমার

---

১ রামচন্দ্রের বংশধারা নিম্নোক্তরূপ ঃ



মুখুজ্যে-ব্রাহ্মণেরা প্রাচীনকাল হইতে জয়রামবাটী গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন। বিষ্ণুপুরের রাজার দানপত্র দেখিয়া এইচ্, ডসন্ সাহেব নিষ্কর জমি ভোগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে যে সমস্ত ছাড় ও তায়দাদ করিয়া দেন, সেই সকল হইতেই ইহা সপ্রমাণ হয়। গ্রামের বাঁড়ুজ্যে-ব্রাহ্মণেরা মুখুজ্যেদের দৌহিত্র-বংশ।

বাবা পরমভক্ত ছিলেন, পরোপকারী। বাবা বড় রামভক্ত ছিলেন, নৈষ্ঠিক। মার কত দয়া ছিল—লোকদের কত খাওয়াতেন, যত্ন ক'ত্তেন। কত সরল!

ত্রৈলোক্যনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র ও নীলমাধব নামে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ তিন সহোদর তাঁহার সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারে বাস করিতেন। তন্মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের পর অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। নীলমাধব অবিবাহিত।

শ্রীমতী সারদার জন্ম সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। ঘটনাটি এইরূপ: এক সময়ে শিহড়ে উত্তরপাড়ায় পিত্রালয়ে অবস্থান-কালে শ্যামাসুন্দরীর খুব পেটের অসুখ করে। তিনি তথাকার এল্লা-পুকুরের পাড়ে শৌচে যান; কিন্তু তাড়াতাড়ি স্থান-নিরূপণ করিতে না পারিয়া, একটি বেলগাছের তলায় বসিয়া পড়েন। ঐ বেলতলার ঈষৎ ব্যবধানে গ্রামের কুমারদের একটি পোয়ান ছিল—এখনও আছে। শ্যামাসুন্দরী শুনিতে পাইলেন, সেই পোয়ান হইতে ঝন্‌ঝন্ করিয়া শব্দ উঠিল; আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাইলেন, বেলগাছ হইতে একটি কচি ছোট মেয়ে লাফাইয়া পড়িয়া বাহুপাশে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যান। অনেকক্ষণ এইভাবে পড়িয়াই ছিলেন। পরে সকলে তাঁহাকে খুঁজিতে গিয়া বেলতলায় অচৈতন্যভাবে পড়িয়া আছেন দেখিতে পায়। জ্ঞানলাভের সঙ্গে শ্যামাসুন্দরী অনুভব করিলেন, মেয়েটি তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছে![২]

এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বে রামচন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তাঁহার কলিকাতা গমনের সঙ্গেও একটি অনুরূপ ঘটনা জড়িত রহিয়াছে। একদিন

---

২ আমরা শ্রীশ্রীমার ভ্রাতৃজায়া শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবীর নিকট ঘটনাটি যেমন শুনিয়াছি সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিলাম। ইন্দুমতী তাঁহার শাশুড়ী শ্যামাসুন্দরীর মুখে শুনিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, বারবার শুনিয়া শুনিয়া ইহা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী সুশীলাবালা দত্ত বলেন: একদিন সন্ধ্যার পর আমি মার পায়ে তেল মালিশ করিতেছি, এমন সময় নলিনী ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া হঠাৎ তাঁহাকে বলিল, 'পিসীমা, ঠাকুরকে লোকে ভগবান বলে, আর ভগবান ব'লে শ্রদ্ধাভক্তিও করে; তা না হয় মানলুম—শুনেচি

দ্বিপ্রহরে আহারের পর সংসারের অভাব অনটনের কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়েন। সেই অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন, একটি ছোট হেমাঙ্গী বালিকা তাঁহার পিঠের উপর পড়িয়া দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে। বালিকার রূপ ও হাতের মূল্যবান অলঙ্কার তাহার অসাধারণত্বের পরিচয় দিতেছিল। শান্তস্বরে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে গো তুমি?' মেয়েটি কোমলকণ্ঠে কহিল, 'এই আমি তোমার কাছে এলুম!' ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্ন-বিবরণ আলোচনা করিয়া তাঁহার ধারণা হইল, মা-লক্ষ্মী কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন। এই সময়ে অর্থার্জনের চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে মনে করিয়া তিনি কলিকাতা যাওয়ার সঙ্কল্প করেন।[৩]

কলিকাতায় ব্রাহ্মণের কিরূপ অর্থাগম হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে তাঁহার পরবর্তী মানসিক অবস্থা হইতে এই বিষয়ে তিনি কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। যাহা হউক, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পত্নীর দর্শন ও অনুভবের কথা অবগত হইলেন। ঘটনা অভাবনীয় হইলেও তাঁহার সরলবিশ্বাসী, ভক্তিপ্রবণ চিত্ত ইহাতে কোন সন্দেহ করিল না। ঈশ্বরের বিধান মানুষের অজ্ঞেয় ও অলঙ্ঘনীয় জানিয়া ব্রাহ্মণ-দম্পতী নিজেদের দেহসুখে উদাসীন হইলেন; এবং ভক্তিপূতহৃদয়ে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে দেব-সন্তানের জন্ম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দিনের পর দিন অপগত হইয়া গর্ভসঞ্চারের কাল হইতে দশমাস পূর্ণ

যে, তাঁর মার গর্ভে হাওয়া ঢুকে তাঁর জন্ম হ'য়েছিল। কিন্তু তোমাকে লোকে এত দেবতা ব'লে মান্য করে কেন?' মা বলিলেন, 'আমার মা আমার মামার বাড়ীতে বেলতলায় শৌচে যান। সেই সময় দেখেন, এক ছয়সাত বছরের পরমাসুন্দরী কন্যা বেলগাছে ঝুলচে। দেখেই মা ব'সে পড়েন। কন্যাটি বেলগাছ থেকে নেমে এল; মা আর কন্যাটিকে দেখতে পেলেন না, তাঁর মনে হ'ল, যেন একটা হাওয়া তাঁর গর্ভে ঢুকচে। তখন তিনি অচৈতন্য হ য়ে যান।'

* স্বামী শ্যামানন্দ কলিকাতায় মার বাড়ীতে শ্রীযুক্তা গোলাপ-মার নিকট উহা শুনিয়াছিলেন। গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমার মুখ হইতে ঘটনাটি শুনিয়াই নীচে প্রসাদ দিতে আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন।

হইয়া আসিল ; এবং হেমন্তের অবসানে শীতের কুজ্ঝটিকায় দশদিক্ আবৃত হইল দেখিয়া গর্ভাশ্রিতা দেবীও স্বরূপ গুণ্ঠিত করিয়া ধরাতলে অবতরণের উদ্যোগ করিলেন। সন ১২৬০ সাল বা ১৭৭৫ শকাব্দে, সৌর পৌষের অষ্টম দিনে, গুরুবারে, মুখ্যচান্দ্র অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে, রাত্রি দুই দণ্ড নয় পল সময়ে, অতিশুভক্ষণে শ্যামাসুন্দরী এক দিব্যলক্ষণা সুকুমারী প্রসব করিলেন। রামচন্দ্রের দরিদ্র কুটীর মঙ্গলধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রামখানির ঘরে ঘরে সেই শুভবার্তা বিজ্ঞাপিত করিল।

অনন্তর বিহিত কর্মাদির যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিয়া রামচন্দ্র জ্যোতিষীকে ডাকাইয়া কন্যার জন্মপত্রিকা সম্পাদন করাইলেন।[৪] লগ্নাদি নিরূপণান্তে তাঁহার রাশ্যাশ্রিত নাম শ্রীমতী ঠাকুরমণি দেবী এবং লোকপ্রচলিত নাম শ্রীমতী সারদা রাখিয়া ব্রাহ্মণ-দম্পতী স্নেহবিগলিতচিত্তে কন্যার লালন-পালনে মনোনিবেশ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিবাহকথা

শ্রীমতী সারদার অলৌকিক জন্ম-ঘটনা অপরের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার না করিলেও তাঁহার মাতাপিতার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। উহা তাঁহাদের বাৎসল্যবৃত্তিকে ভক্তিমিশ্রিত করিয়া এক নূতন আকার দান করিয়াছিল। ফলে, রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরী অনেক সময় বিস্মিতনেত্রে কন্যার মুখপানে তাকাইয়া কত কি ভাবিতেন। কিন্তু পরক্ষণেই অপত্যবাৎসল্য এবং সংসারের শত তাড়না আসিয়া তাঁহাদিগকে সকল কথা ভুলাইয়া দিত। মায়িক জগতে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কন্যার প্রতি

---

[৪] শ্রীশ্রীমার কোষ্ঠী-বিচার পরিশিষ্টে দেখুন। মূল কোষ্ঠীতে তাঁহার সাধারণ নাম 'সারদাসুন্দরী' লেখা ছিল। তখনকার দিনে শ্যামাসুন্দরীর কন্যার 'সারদাসুন্দরী' নাম স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু পরবর্তী কালে 'সুন্দরী' স্থলে 'মণি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমরা তাঁহার নামের এই মধ্যবর্তী অংশ অনতিপ্রয়োজনীয় মনে করি।

রামচন্দ্র আজীবন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন, শুনা যায়। আর শ্যামাসুন্দরী শেষ বয়সেও কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কতবার বলিয়াছেন, 'মাগো, তুই যে আমার কে মা! আমি কি তোকে চিনতে পাচ্চি মা?' কন্যা তাহাতে বাহ্যিক বিরক্তি প্রকাশ করিয়া উত্তর দিয়াছেন, 'কে আবার, কে আবার? আমার কি চারটে হাত হ'য়েচে? তা হ'লে তোমার কাছে আসব কেন?' যদি বা গর্ভধারিণী কখনও বলিতেন, 'সারদা, তোমার মতন আমার যেন [জন্মান্তরে] একটি মেয়ে হয় মা! স্বামীর ধন থাকবে। ছেলেপুলে নিয়ে বড় জ্বালাতন!' তাহাতেও কন্যা রাগিয়া উত্তর দিতেন, 'আবার আমাকে টানচ? তোমার ছেলেপুলে আমি আবার এসে মানুষ করি!' তথাপি গর্ভধারিণী পুনঃপুনঃ বলিতেন, 'তোমাকেই যেন আবার আমি পাই মা!' [ই]

পিতামাতা ব্যতীত খুল্লতাত নীলমাধবও শ্রীমতী সারদাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। অবিবাহিত নীলমাধবের সংসারে অন্য অবলম্বন না থাকায় এই ভ্রাতুষ্পুত্রীটি বিশেষভাবে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের সাংসারিক অবস্থা কোন কালেই তেমন সচ্ছল ছিল না। সেইজন্য, নিজেদের যে অল্প কয়েক বিঘা লাখেরাজ জমি ছিল, তাহার চাষ-আবাদ ও যাজন-কার্য ব্যতীত, সংসারের ব্যয়নির্বাহের জন্য সম্ভবমত অন্য উপায়ও দেখিতে হইত। তাঁহারা তুলার চাষ করিতেন এবং নিজেদের ক্ষেত্রোৎপন্ন সেই তুলা হইতে পৈতা কাটিবার ব্যবস্থা করিতেন। শ্যামাসুন্দরী তুলার ক্ষেতের মধ্যে বালিকাকে—পরবর্তী কালে অন্যান্য সন্তানদিগকেও—শোয়াইয়া রাখিয়া নিজে তুলা তুলিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শ্রীমতী সারদার স্বভাবের এক অপরূপ স্বতন্ত্রতা বিকশিত হইয়া উঠিল। অন্য মেয়েদের সঙ্গে চঞ্চলা হইয়া খেলাধূলা করিতে তাঁহার তেমন আগ্রহ দেখা যাইত না। বালিকা যেন আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণা—আপনাতেই আপনি বিভোরা। একজনকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'আমার যখন খুব কম বয়েস, সে সময় আমি একলা থেকে যখন যে কাজ ক'র্তুম, ঠিক আমারই মতন আর একটি মেয়েও সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ

ক'ত্ত'—হাসত', তামাসা ক'ত্ত'; কিন্তু অন্যলোক এলেই আর তাকে দেখতে পেতুম না। দশ এগার বছর পর্যন্ত এ রকম হ'য়েছিল।' [উ][১]

দেখিতে দেখিতে পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিয়া শ্রীমতী সারদা ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিলেন। তৎকালে ঐ দেশে বাল্যবিবাহ-প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল—এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সুতরাং উপযুক্ত সম্বন্ধ আসিলে বালিকাকে পাত্রস্থা করিতে কাহারও আপত্তির কারণ ছিল না; এবং বিধিনির্বন্ধে উপযুক্ত সম্বন্ধ আসিতেও বিলম্ব হইল না। এখন আমরা সেই বিষয়েরই অবতারণা কবিব।

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে শ্রীগদাধরের দীর্ঘ দ্বাদশবৎসর-ব্যাপী সাধনার প্রথম পাদ অতীত হইয়াছে; এবং ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব ব্যাকুলতা ও তন্নিবন্ধন কার্যগুলি সংসারী লোকের চক্ষে বায়ুরোগীর আচরণবৎ প্রতীত হইয়া কামারপুকুরে অতিরঞ্জিত আকারে জননী শ্রীমতী চন্দ্রমণির কর্ণে পৌঁছিয়াছে। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারের বিয়োগদুঃখ অপগত হইতে না হইতে, অতি আদরের কনিষ্ঠপুত্র বায়ুরোগাক্রান্ত হইয়াছে শুনিয়া জননী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবিলম্বে তিনি পুত্রকে কামারপুকুরে নিজ সকাশে আনয়ন করাইলেন এবং তাঁহার রোগশান্তির জন্য স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুঁক হইতে আরম্ভ করিয়া ওঝা আনাইয়া চণ্ড-নামানো পর্যন্ত লোকপ্রচলিত অনুষ্ঠানসকল একে একে করাইয়া যাইতে লাগিলেন। কামারপুকুরে আসিয়া জগন্মাতার প্রায় নিত্য দর্শনাদি লাভ হইতে থাকায় গদাধরও ক্রমশঃ সুস্থির ভাব ধারণ করিলেন।

সাংসারিক সকল বিষয়ে একান্ত উদাসীনতাই গদাধরের বায়ুরোগের প্রধান কারণ মনে করিয়া তাঁহার ঐভাব দূর করিবার জন্য মাতা চন্দ্রমণি ও মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বর এখন তাঁহাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইলেন। মাতাপুত্রে গোপনে পরামর্শ করিয়া সকল বিষয় স্থির করিলেও

---

[১] ঠাকুর তাঁহার সাধনকালের প্রায় প্রারম্ভ হইতে নিজের অনুরূপ আকারবিশিষ্ট এক যুবক-সন্ন্যাসীর দেখা পাইতেন। ঐ সন্ন্যাসি-মূর্তি তাঁহার ভিতর হইতে যখন তখন বাহির হইয়া তাঁহাকে সকল বিষয়ে উপদেশ করিতেন।

গদাধরের উহা জানিতে বিলম্ব হইল না। আপত্তি করার পরিবর্তে তিনি সমধিক আনন্দই প্রকাশ করিলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া, মনোমত পাত্রীর অন্বেষণে ব্যর্থকাম ভ্রাতাকে পাত্রীব সন্ধানও বলিয়া দিলেন : 'জয়রামবাটীব বামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে, দেখগে যা।' শ্রীগদাধবেব স্বয়ং পাত্রী-নির্বাচনেব কথায় শ্রীমতী সাবদার শৈশবেব একটি কৌতুকাবহ ঘটনা মনে পড়ে। শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ-পুঁথিতে আছে :

একবার প্রভুদেব হৃদযেব ঘবে।
জনেক গাযক তথা গায একদিন।
শুনে জুটে নবনাবী নবীন প্রবীণ॥
নাবীদেব মধ্যে এক কন্যা কবি কোলে।
শুনে গান একসঙ্গে নারীদেব দলে॥

. ... .

অনুবযাঃ শিশুমেযে কোলে ছিল যাব।
গীত সমাপনে এক আত্মীয তাঁহাব॥
আদবে কহিলা বালিকায সম্বোধিযা।
এ-লোক—কাবে চাহ কবিবাবে বিযা॥
অমনি দেখান বালা তুলি দুই কবে।
সন্নিকটে সমাসীন প্রভু গদাধরে॥

অল্পদিনেব মধ্যেই বিবাহেব সকল কথা স্থিব হইয়া গেল এবং শুভদিনে শুভক্ষণে রামেশ্বর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জয়রামবাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহাব শুভ পরিণয়-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করাইলেন। বিবাহে কন্যাপক্ষকে তিনশত টাকা পণ দিতে হইল। তখন ১২৬৬ সালেব বৈশাখের শেষভাগ; শ্রীগদাধর চতুর্বিংশতি বৎসবে এবং শ্রীমতী সারদা ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

বিবাহ-কালের আব একটি ঘটনাও পুঁথি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

জালিযা সাতাশ কাঠি বিবাহের কালে।
ঘুরে যবে বরে ঘেবে রমণী সকলে॥
জ্বালা কাঠি লাগিয়া কি হৈল শুন কথা।
পুড়ে গেল শ্রীপ্রভুর মাঙ্গলিক সুতা॥
হরিদ্রা-মাখান সুতা ছিল বাঁধা হাতে।

... ...

চিরশক্তি আপনার করিয়া গ্রহণ।
ছলে পুড়াইয়া দিলা অবিদ্যা-বন্ধন ॥

যথাকালে বরবধূকে সঙ্গে লইয়া রামেশ্বর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মাতা চন্দ্রমণিও বিদ্যারূপিণী বধূর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অন্তরে স্বস্তি অনুভব করিলেন। বরবধূকে দর্শন করিবার জন্য প্রতিবেশী ও স্বজন-সমাগমে কামারপুকুরের দরিদ্র সংসারখানি আজ আনন্দপরিপূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইল। কেবল একটি চিন্তা সকল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও থাকিয়া থাকিয়া চন্দ্রমণির মাতৃহৃদয়কে ব্যথাভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। বিবাহের দিনে সামাজিক সম্ভ্রম রক্ষার জন্য লাহাবাবুদের বাড়ী হইতে যে কয়েকখানা অলঙ্কার চাহিয়া লইয়া নববধূকে সাজাইতে হইয়াছিল, এখন সেগুলি ফিরাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে। কন্যাপ্রতিমা বালিকার অঙ্গ হইতে কোন্ প্রাণে অলঙ্কার উন্মোচন করিবেন ভাবিয়া বৃদ্ধার চক্ষে জল আসিল। মাতার মনোবেদনা হৃদয়ঙ্গম করিতে মাতৃভক্ত পুত্রের বিলম্ব হইল না; চতুর গদাধর নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হইতে এমন কৌশলে অলঙ্কারগুলি মোচন করিয়া লইলেন যে, তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। বালিকা জাগ্রত হইয়া অলঙ্কারের অন্বেষণ করিতে থাকিলে চন্দ্রমণি তাঁহাকে কোলে বসাইয়া সাশ্রুনয়নে সান্ত্বনাপূর্বক কহিলেন, 'মা, গদাই তোমাকে এর চেয়েও ভাল ভাল অলঙ্কার পরে কত দেবে।'[২] কন্যার খুল্লতাত বালিকাকে দেখিতে আসিয়া ঐ কথা জানিতে পারিলেন এবং বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে লইয়া সেইদিনই জয়রামবাটীতে প্রস্থান করিলেন।

শৈশবে বিবাহ হওয়ায় তৎকালীন দুইটিমাত্র বিশেষ ঘটনা শ্রীশ্রীমা স্মরণ করিতে পারিতেন। জয়রামবাটীতে ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম

---

[২] ঠাকুর তাঁহার জননীর কথা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান-কালে ঠাকুর তাহাকে দুই ছড়া মূল্যবান তাবিজ, সোনার বালা ইত্যাদি অলঙ্কার গড়াইয়া দিয়াছিলেন। সাধক-জীবনের প্রারম্ভে শ্রীমতী সীতাকে দর্শন করিবার সময় ঠাকুর তাঁহার হাতে ডায়মনকাটা বালা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুরের নির্দেশে মার বালা মা-সীতার বালার অনুরূপ করিয়া নির্মিত হইয়াছিল।

কতকগুলি পদ্মফুল লইয়া আসিয়া একপ্রকার জোর করিয়াই তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়াছিল ; এবং কামারপুকুরে ঠাকুরের পিতৃবন্ধু ধর্মদাস লাহা তাঁহাকে খেজুরতলায় আপন মনে খেজুর কুড়াইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হ'য়েচে ?'

মাতার আগ্রহাতিশয্যে ঠাকুর সেইবার দুই বৎসরাধিক কাল কামারপুকুরে বাস করেন এবং বধূর সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম কালে দ্বিতীয়বার শ্বশুরালয়ে যান। এই সময় বালিকা বধূ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বামীর পদ-প্রক্ষালন ও অঙ্গে বাতাস করিয়াছিলেন।[৩] কয়েকদিন তথায় থাকিয়া ঠাকুর পত্নীর সহিত 'জোড়ে' কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসেন এবং পুনরায় সাধন-সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়া সংসারের সকল বিষয় এককালে ভুলিয়া যান। আব এদিকে শ্রীমতী সারদা জয়রামবাটীতে দরিদ্র পিতামাতার সংসারে ও উন্মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে মানুষ হইতে থাকেন।

— —

চতুর্থ অধ্যায়

পিতৃগৃহে শিক্ষা

পল্লীগ্রামে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ঘরের বালিকারা অল্পবয়সেই রন্ধনাদি সমুদয় গৃহকর্মে নিপুণা হইয়া উঠেন, দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমতী সারদার জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অতি প্রত্যুষে ঈশ্বরের নামোচ্চারণপূর্বক শয্যাত্যাগ করিতে, প্রাত্যহিক গৃহকর্মে মাতাকে যথাশক্তি সাহায্য করিতে, এবং মাতা রন্ধন করিতে অপারগ হইলে স্বহস্তে উহা নিষ্পন্ন করিতে তিনি আশৈশব অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও অপরিণত রুচি

---

[৩] পরবর্তী কালের অনুরূপ একটি ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন : জয়রামবাটীতে যখন ছিলুম তখন উনি এলেন ; আমাকে বল্লেন, 'সাজিমাটি দিয়ে পা-টা ধুয়ে দাও তো।' তা দেওয়াতে অন্য মেয়েরা বলাবলি ক'ত্তে লাগল, 'ওমা, সারদার কিগো, স্বামীর সঙ্গে কিছুই হ'ল' না, তবু ছাখ....!' [নি]

হাত দুইখানিতে ভাতের হাঁড়ি উত্তোলন করিবার শক্তি না হওয়ায় পিতাকে উহা নামাইয়া দিতে হইত। তাহা ছাড়া, ক্ষেতে মুনিষদিগকে মুড়িগুড় জলখাবার দিয়া আসা, আকণ্ঠ জলে নামিয়া গরুর জন্য দলঘাস কাটা,[১] নিজেদের তুলার ক্ষেত হইতে জননীর সঙ্গে তুলা সংগ্রহ করিয়া আনা, এই সমস্ত কাজও তিনি বয়ঃসুলভ আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিতেন। এক বৎসর পঙ্গপাল সমস্ত ধান নষ্ট করিয়াছিল; সকলের সঙ্গে বালিকা সেই ক্ষেত্রপতিত শস্য কুড়াইয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে শ্রীশ্রীমা বলিতেন, 'ক্ষেত থেকে তুলো এনে আমরা কত পৈতে কেটেচি, আজকালকার মেয়েরা কি আর অত কষ্ট ক'রবে!' [ন] সূতা কাটার কাজে তিনি যে বেশ নিপুণা ছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতেও বুঝিতে পারা যায়। স্বদেশী যুগে কতিপয় যুবক মিলিয়া যখন কোয়ালপাড়ায় তাঁতশালা প্রতিষ্ঠা করে, তখন মা তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিয়াছিলেন, 'আমারও ইচ্ছে হয় একটা চরকা পেলে সূতো কাটি। তখন তো কাপড় সব ঘরেই তৈরি হ'ত'।'

শ্রীমতী সারদা সামান্যভাবে সন্তরণ-শিক্ষা করিয়াছিলেন। 'মা, আপনি সাঁতার জানেন?'—এই প্রশ্নের উত্তরে জয়রামবাটীতে বলিয়াছিলেন, 'একটু একটু জানি। এখানে আর কামারপুকুরে ছেলেবেলায় ঘড়া নিয়ে একটু আধটু সাঁতার দিয়েচি।' [আ]

শ্রীমতী সারদার জন্মগ্রহণের পরে রামচন্দ্রের কাদম্বিনী নামে কন্যা এবং প্রসন্ন, উমেশ, কালীকুমার, বরদাপ্রসাদ ও অভয় নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।[২] অধিকাংশ সময় জ্যেষ্ঠা ভগিনীকেই তাঁহার ছোট ছোট ভাইগুলির

---

১ স্বামী ধীরানন্দকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'দলঘাস কাটবার সময় দেখতুম, আমারই সমান বয়েসী আর একটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দল কাটচে। একটি দল কেটে উপরে রেখে এসে যেই আর একটি কাটতে যাব, দেখতুম সেটি আগে থেকে কাটা হ'য়ে রয়েচে। মেয়েটি কে, কিছুই বুঝতে পারি নি।' ধীরানন্দ-মহারাজ পরে স্বামী শ্যামানন্দকে ঘটনাটি বলেন।

২ উমেশ ১৮।১৯ বৎসর বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। কাদম্বিনীর

দেখাশুনা করিতে হইত। এই ভাইগুলি তাঁহাদের বড়দিদির কিরূপ স্নেহযত্নে মানুষ হইয়াছিলেন, তাহা পরিণত বয়সেও তাঁহাদের প্রতি শ্রীশ্রীমার আচরণ দেখিয়া বুঝা যাইত।

তখন স্ত্রী-শিক্ষার তেমন প্রচলন না থাকায় শ্রীমতী সারদা বিদ্যাশিক্ষার ততটা সুযোগ পান নাই। কিন্তু আজীবন তাঁহার বিদ্যায় অনুরাগ দেখা গিয়াছে। পরিণত বয়সে শ্রীশ্রীমাকে গ্রন্থ পাঠ করিতে দেখিয়া স্বামী অরূপানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, তোমাকে কখন কখন রামায়ণ পড়তে দেখি; পড়তে কবে শিখলে?' তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, "ছেলেবেলায় প্রসন্ন, রামনাথ ওরা সব পাঠশালায় যেত'; ওদের সঙ্গে কখন কখন একটু আধটু যেতুম। তাইতে একটু শিখেছিলুম। পরে কামারপুকুরে লক্ষ্মী[৩] আর আমি বর্ণপরিচয় একটু একটু প'ড়তুম। ভাগ্‌নে[৪] বই কেড়ে নিলে: ব'ল্লে, 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নাই। শেষে কি নাটক-নভেল প'ড়বে?' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না—ঝিউড়ী-মানুষ কি-না, জোর ক'বে রাখলে। আমি আবার লুকিয়ে আর একখানি এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় প'ড়ে আসত'। সে এসে আবার আমাকে পড়াত'। ভাল ক'রে শেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে; ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্যে শ্যাম-পুকুরে। একলা একলা আছি, ভব-মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে আসত' নাইতে; সে মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকত'। সে রোজ নাইবার সময় পড়া নিত' ও দিত'। আমি তাকে শাকপাত বাগান থেকে যা আমার এখানে দিত' তাই খুব ক'রে দিতুম।" [ধ]

শ্রীশ্রীমার নিজের উক্তি হইতেই উপলব্ধি হয় যে, বিদ্যাশিক্ষার কোনরূপ সুযোগ পাইয়া তিনি কোনকালে তাহা উপেক্ষা করেন নাই। ফলে তিনি মুদ্রিত গ্রন্থ সুন্দর পড়িয়া যাইতে এবং অনায়াসে অনেক দুরূহ শব্দের অর্থবোধও করিতে পারিতেন। ১৩১৯ সালে যখন মা ৺কাশীতে ছিলেন,

---

'কোকন্দ' গ্রামে সুধারাম চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল; অল্পবয়সে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান।

[৩] ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বরের কন্যা। [৪] হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়।

সেই সময় একদিন বিভূতিবাবু তাঁহাকে গীতাব দশম অধ্যায় পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। 'মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং'—এই কথা পড়িবামাত্র মা নিজেই বুঝাইয়া দিলেন, 'মার্গশীর্ষ মানে অগ্রহায়ণ।'*

বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে তখন যাত্রাগান, কথকতা ইত্যাদির খুব প্রচলন ছিল। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে গ্রামশুদ্ধ লোক একত্র হইয়া পৌরাণিক আখ্যানমূলক যাত্রা-কথকতা শুনিয়া ধর্ম ও নীতি-বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিত। একাগ্রমনে এই সকল যাত্রাকথকতা শুনিবার ফলে শ্রীমতী সারদার অনেক শ্লোক (ছড়া) কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। পরিণত বয়সেও নৈতিক শিক্ষা দানেব প্রয়োজন হইলে তিনি কখন কখন ঐ সকল শ্লোক অবিকল আবৃত্তি করিতেন।

দরিদ্র হইলেও ধর্মপ্রাণ রামচন্দ্রের সংসাবে সন্তোষ ও দয়ার অভাব ছিল না; এবং ঈশ্বরে নির্ভর থাকায়, কার্যকালে ভবিষ্যতের চিন্তা আসিয়া দয়ার পথ রোধ করিয়া বসিত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ কবা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীমার নিজের ভাষায়ই উহা প্রদান করিতেছি:
একবার [১২৭১] সেখানে কি দুর্ভিক্ষই হ'ল', কত লোকই যে না খেতে পেয়ে আমাদের বাড়ী আসত'! আমাদের আগের বছরের ধান মরাই-বাঁধা ছিল। বাবা সেইসব ধানে চাল ক'রিয়ে কলায়ের ডাল দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখতেন: ব'লতেন, 'এই বাড়ীর সবাই খাবে, আর যে আসবে তাকেও দেবে। আমার সারদার জন্যে খালি ভাল চালের দুটি ভাত ক'রবে; সে আমার তাই খাবে।' একএক দিন এমন হ'ত', এত লোক এসে প'ড়ত' যে, খিচুড়িতে কুলত না। তখনি আবার চড়ান হ'ত'।

---

* 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী' পুস্তকে লিখিত হইয়াছে, ঠাকুরের ব্যবস্থায়, বাগানের কর্মচারী পীতাম্বর ভাণ্ডারীর এগাব বছরের ছেলে শরতের সাহায্যে, লক্ষ্মীদেবী ও শ্রীশ্রীমা দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন এবং সামান্য লিখিতেও পারিতেন। নিজের বিদ্যাশিক্ষা-প্রসঙ্গে মা শরতের নামোল্লেখ না করায় মনে হয়, তাহার সাহায্য লক্ষ্মীদেবী যেমন পাইয়াছিলেন অবসরাভাবে মা তাহা পান নাই। মা লিখিতে শিখিয়াছিলেন কি-না বলা কঠিন; পরবর্তী জীবনে তাঁহাকে কখনও লিখিতে দেখা যায় নাই।

আর সেই গরম খিচুড়ি যেই ঢেলে দিত, শীঘ্রি জুড়বে ব'লে আমি দুহাতে বাতাস ক'ত্তুম ! আহা ! ক্ষিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্যে ব'সে আছে !"[৬]

শ্রীমতী সারদার জন্য স্বতন্ত্র অন্নের ব্যবস্থা তাঁহার প্রতি পিতার বিশিষ্ট স্নেহের নিদর্শন, সন্দেহ নাই। বীজনরতা বালিকা-মূর্তির অন্তরালে এক পরদুঃখকাতরা মাতৃমূর্তি আমাদিগকে চকিতে দেখা দিয়া মুগ্ধ করে। পরবর্তী জীবনে স্বয়ং পাখা-হাতে কাছে বসিয়া শ্রীশ্রীমা কত গ্রীষ্মতপ্ত সন্তানকেই না পরিতৃপ্তিপূর্বক ভোজন করাইয়াছেন ! সেই অনাবিল মাতৃস্নেহ তাহাদের দেহতাপের সঙ্গে মনের তাপও চিরতরে মুছিয়া দিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

পতি-সন্দর্শন ঃ দক্ষিণেশ্বরে আগমন

বিবাহের পর শ্রীশ্রীমা সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে একবার মাত্র স্বামীর দর্শন পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তখন তিনি নিতান্ত বালিকা। তারপরে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময় তিনি পরপর দুইবার শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন এবং তথায় প্রথমবারে একমাস ও দ্বিতীয়বারে দেড়মাস বাস করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে। এই সময়কার একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩২২ সালের ভাদ্রমাসে মা যখন জগদম্বা-আশ্রমে[১] ছিলেন, সেই সময় একদিন সন্ধ্যারতির পর দুইজন সাধু তাঁহাকে প্রণাম করিতে বাড়ীর ভিতর যান। মা তখন উঠানে বসিয়াছিলেন এবং তাঁহারা প্রণাম করিয়া বসিবার পর কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন ঃ আমার তের বছর বয়সের সময় কামারপুকুরে গিয়েছিলুম। হালদার-পুকুরে নাইতে যাব, ভয় হ'ত'। খিড়কীর ছোট দরজাটি দিয়ে বেরিয়ে ভাবচি, নূতন বৌ, কি ক'রে একলা নাইতে যাই। ভাবতে ভাবতে দেখি কি, আটটি মেয়েমানুষ এল'; আমিও রাস্তায় নামলুম। নামবার পরেই, তারা চারজন আমার আগে,

---

[৬] শ্রীশ্রীমায়ের কথা হইতে সঙ্কলিত।

[১] কোয়ালপাড়া-মঠের সন্নিকটে শ্রীশ্রীমার বাসের জন্য নির্দিষ্ট বাটী।

চারজন আমার পেছন হ'য়ে, আমাকে মাঝে নিয়ে হালদার-পুকুরের ঘাটে চল্ল'। আমি স্নান ক'ল্লুম, তারাও ক'ল্লে। পরে আবার সেরকম ক'রে বাড়ী ফিরে এল'। ঐ সময়টায় যতদিন ওখানে ছিলুম, রোজ এইরকম হ'ত'। অনেক দিন মনে ক'রেছি, মেয়েগুলি কারা, আমার স্নানের সময় রোজই আসে ; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি।'

কামারপুকুর হইতে শ্রীশ্রীমার জয়রামবাটীতে ফিরিয়া আসিবার প্রায় চারিমাস পরে, ১২৭৪ সালে, ঠাকুর ভৈরবী-ব্রাহ্মণী ও ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া দেশে আগমন করেন। তখন নববধূকে আনাইয়া আনন্দের মাত্রা পূর্ণ করিবার অভিলাষে আত্মীয়-রমণীগণ পুনরায় তাঁহাকে কামারপুকুরে লইয়া আসেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই তাঁহার জীবনে প্রথম পতি-সন্দর্শন।

ইতঃপূর্বে স্বয়ং আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকিলেও, যখন পত্নী আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ঠাকুর সর্ববিষয়ে তাঁহারই মুখাপেক্ষিণী বালিকার প্রতি নিজের কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলেন না। প্রথমতঃ ভালবাসায় তাঁহাকে সর্বতোভাবে আপনার করিয়া লইলেন ; এবং তারপর নিজের ত্যাগোদ্দীপ্ত আদর্শ জীবন সম্মুখে রাখিয়া, গৃহস্থালীর প্রত্যেক ছোটবড় ব্যাপার—প্রদীপের শলিতাটি কিভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ীর প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ীতে যাইয়াই বা কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, গাড়ীতে বা নৌকায় যাইবার সময় কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, কিরূপে দেবতা-গুরু-অতিথির সেবায় টাকার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে, ইত্যাদি—হইতে আরম্ভ করিয়া, মানবজীবনের গভীর উদ্দেশ্য ঈশ্বর-দর্শন ও ঈশ্বরে সর্বসমর্পণ পর্যন্ত সকল বিষয়ে তাঁহাকে শিক্ষা ও উপদেশ দিতে লাগিলেন।[২] পতির কামগন্ধহীন দিব্য সঙ্গ ও সপ্রেম শিক্ষায় সর্বতোভাবে

---

[২] শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন : শ্বশুরবাড়ী বাসকালে রামলালের পিতাঠাকুর আমাকে শুতে যেতে ব'লতেন আর উনি কেবল হাসতেন। সেই সময় একসঙ্গে শুতুম আর সারারাত গল্পেই কেটে যেত'। [নি]

পরিতৃপ্তা বালিকা আপনাকে তখন কিরূপ আনন্দ-সম্পদের অধিকারিণী বোধ করিতেন, তাহা পরবর্তী কালে স্ত্রী-ভক্তদের নিকট এইরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন: "হৃদয়-মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐকাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীরস্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।" [লী]

ক্রীড়াশীল কৈশোরের পরিণামে, স্ফুটনোন্মুখ যৌবনে, অতুল আনন্দের অধিকারিণী হইয়া শ্রীশ্রীমা আপনাতে আপনি ডুবিয়া গেলেন। এইভাবে প্রায় সাত মাস অতিবাহিত হইল। ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মাও জয়রামবাটীতে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার দেহখানা পিত্রালয়ে থাকিলেও প্রাণ দক্ষিণেশ্বরে প্রাণদেবতার অনুগমন করিল।

তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, বাল্যকালে তিনি আত্মসদৃশী আর একটি বালিকার দেখা পাইতেন এবং সেই বালিকা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, কাজকর্ম ও হাস্যপরিহাসাদি করিয়া বহির্জগতের সম্পর্ক হইতে তাঁহার মনকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন রাখিত। সংসারের সর্বপ্রকার কোলাহলের মধ্যেও তাঁহার মনকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য এখন আর ঐ প্রতিবিম্বরূপিণী বালিকার প্রয়োজন রহিল না; পতিরূপে ইষ্টদেবতা আসিয়া সর্বকালের জন্য সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন।

* * * *

ভিতরে,—যাঁহার দিব্যসঙ্গ হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত করিয়াছে সেই মূর্তিমান আনন্দস্বরূপ স্বামিরূপী নরদেবের অনুধ্যানে শ্রীশ্রীমা এখন অহরহ নিমগ্না—প্রেমিকা প্রেমাস্পদে আত্মহারা। আর বাহিরে,—নিজের সর্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত হওয়ায় তিনি সকলের দুঃখকষ্টে অশেষ সহানুভূতিসম্পন্না—করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমা! মানবের বহুভাগ্যে, সংসারে এমন চিত্র কদাচিৎ একবার প্রকটিত হয়। কিন্তু জন্মজন্ম জড়ে নিবদ্ধদৃষ্টি অন্ধ মানব তৎকালে তাহা দেখিতে পায় কি? যদি পাইত, তাহা হইলে এমন দেবীমূর্তিকেও 'পাগলের স্ত্রী' আখ্যা দিয়া দয়ার পাত্রী বিবেচনা

করিত না ; আর তাঁহার দেবদুর্লভ গুণমণি স্বামীকেও পাগল জ্ঞান করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা করিতে বসিত না।

অন্তর যতই পরিপূর্ণ থাকুক, এবং পতি সম্বন্ধে নিজের ধারণা যতই উচ্চ হউক না কেন, পতিনিন্দা সতী-হৃদয়ে বিষম বাজে ; সে আঘাত মারাত্মক হইয়া দেহান্ত পর্যন্ত ঘটাইতে পারে। সেই দৃশ্য জগৎ অন্ততঃ একবারও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। শ্রীশ্রীমা পতিনিন্দা শুনিবার ভয়ে, প্রতিবেশীর বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন ও দিবারাত্র গৃহকর্মে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। ক্বচিৎ বাড়ীর বাহিরে যাইবার ইচ্ছা হইলে, গ্রামের ভক্তিমতী রমণী ভানুপিসীর[৩] ঘরের বারান্দায় যাইয়া, আঁচল বিছাইয়া শুইয়া থাকিতেন।

"যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার"—একথা শ্রীশ্রীমা প্রায়ই বলিতেন। নিঃস্বার্থ প্রেম প্রেমাস্পদকে জন্মজন্ম আপনার করিয়া রাখে। আবার প্রেমরাজ্যে এমন একটা নিয়ম লক্ষিত হয় যে, প্রেমিক দীর্ঘকাল প্রেমাস্পদের অদর্শন সহ্য করিতে পারে না। এই নিয়ম কেবল যে স্বার্থদুষ্ট, মুখ্যতঃ দেহ-সম্বন্ধে পর্যবসিত মানবীয় ভালবাসা সম্বন্ধেই খাটে, তাহা নহে। ভক্ত-ভগবানের রাজ্যেও সেই একই বিধান। ভগবানও ভক্তের অদর্শনে বিরহোচ্ছল !—'বুকের ভিতরটায় যেন মোচড় দিচ্চে !'

প্রথম দর্শনে যিনি তাঁহাকে এত ভালবাসিয়াছেন, এত আপনার করিয়া লইয়াছেন, সেই দেবতা সময়ে নিশ্চয়ই নিকটে ডাকিয়া লইবেন—এই আশা বুকে লইয়া শ্রীশ্রীমা একটি একটি করিয়া দিন গণিতে লাগিলেন। কিন্তু একে একে সুদীর্ঘ চারিটি বৎসর প্রতীক্ষার পরেও যখন দয়িতের কোন আহ্বান আসিল না, তখন তাঁহার সীমাহীন ধৈর্যেরও যেন বাঁধ ভাঙ্গিল। স্বামি-সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করিবার প্রবল বাসনায় তিনি একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ; তথাপি লজ্জাবশতঃ মুখে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। ঈশ্বরেচ্ছায় এখন একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়া সেই বাধা দূরে অপসারিত করিল।

---

[৩] ভানুপিসীর পরিচয় পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

১২৭৮ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমায়—প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথিতে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য কতিপয় দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়া কলিকাতা যাইবেন জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীমা তাঁহাদের কাছে গঙ্গাস্নানের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তাঁহাদের প্রমুখাৎ কন্যার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া রামচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাইবেন, স্থির করিলেন। তদনুযায়ী সকল বন্দোবস্ত করা হইলে, তাঁহারা পদব্রজে রওনা হইলেন।

শ্রীশ্রীমা ইতঃপূর্বে আর কখনও অত দূরের পথ পদব্রজে গমন করেন নাই। তাঁহার সুকোমল পদযুগল বারবার অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু সঙ্কোচবশতঃ মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কষ্ট হইতেছে বলিয়া, দূরের বিপৎসঙ্কুল রাস্তা ধীরে চলিয়া সকলেই কি অসুবিধা ভোগ করিবে? দুইতিন দিন পথ চলিবার পর তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। বাধ্য হইয়া পিতা কন্যাকে লইয়া চটিমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বাহিরে জ্বরের প্রবল যন্ত্রণা, ভিতরে ততোধিক মনোবেদনা। এমন অবস্থায় রাত্রে এক দিব্যদর্শন উপস্থিত হইয়া উভয়বিধ কষ্টের লাঘব করিয়া দিল। সেই দর্শনের কথা শ্রীশ্রীমা স্ত্রী-ভক্তদের কাছে নিম্নলিখিতভাবে গল্প করিয়াছিলেন:

"জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁস, লজ্জা-সরম-রহিত হইয়া পড়িয়া আছি, তখন দেখিলাম, পার্শ্বে একজন রমণী আসিয়া বসিল—মেয়েটির রং কাল, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই।—বসিয়া আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কোথা থেকে আসছ গা?' রমণী বলিল, 'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।' শুনিয়া অবাক হইয়া বলিলাম, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বর যাব, তাঁকে দেখব, তাঁর সেবা করব, কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ঐ সব আর হল না।' রমণী বলিল, 'সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি। ভাল হয়ে—সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই ত

তাঁকে সেখানে আট্‌কে রেখেছি।' আমি বলিলাম, 'বটে? তুমি আমাদের কে হও গা? মেয়েটি বলিল, 'আমি তোমার বোন হই।' আমি বলিলাম, 'বটে? তাই তুমি এসেছ!' ঐরূপ কথাবার্তার পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।" [লী]

রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বর ছাড়িয়া গেল। শরীর দুর্বল হইলেও মন দর্শনজনিত উৎসাহে পরিপূর্ণ। সকালে পিতা-পুত্রী পরামর্শ করিয়া ধীরে ধীরে পথ চলাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। অল্পদূর যাইতে না যাইতে একখানি শিবিকাও পাওয়া গেল। সেই দিন জ্বর আসিলেও পূর্বদিনের মত প্রবল হইল না; এবং পিতা জানিতে পারিলে উদ্বিগ্ন হইবেন ভাবিয়া শ্রীশ্রীমা কাহাকেও জ্বরের কথা জানিতে দিলেন না। ক্রমে দিনের সঙ্গে পথেরও অবসান হইল। কন্যাকে সঙ্গে লইয়া রামচন্দ্র রাত্রি নয়টায় দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলেন।

"ঠাকুর তাঁহাকে সহসা ঐরূপ রোগাক্রান্তা হইয়া আসিতে দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, এবং দুঃখ করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, 'তুমি এত দিনে এলে? আর কি আমার সেজবাবু (মথুরবাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে?' ঔষধ পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিনচারি দিনেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আরোগ্য লাভ করিলেন। ঐ তিনচারি দিন ঠাকুর তাঁহাকে দিবারাত্র নিজগৃহে রাখিয়া ঔষধপথ্যাদি সকল বিষয়েব স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিলেন। পরে নহবত-ঘরে নিজ জননীর নিকটে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।···প্রাণের উল্লাসে তিনি নহবতে থাকিয়া দেবতার ও দেব-জননীর সেবায় নিযুক্তা হইলেন; এবং তাঁহার পিতা কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইয়া কয়েকদিন ঐ স্থানে অবস্থান-পূর্বক হৃষ্টচিত্তে নিজ গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।" [লী]

শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমন কালের আরও দুইটি ঘটনা এখানে তাঁহার নিজের ভাষায় প্রদান করিতেছি ঃ

"প্রথমবার যখন নৌকো থেকে দক্ষিণেশ্বরে নামচি, শুনতে পেলুম, ঠাকুর হৃদয়কে ব'লচেন, 'ও হৃদু, বারবেলা নাই তো? প্রথমবার আসচে।'

আমি মনে মনে জানি, আমি গঙ্গার উপরেই নৌকোতে বারবেলা কাটিয়ে এসেচি।" [বি]*

"যখন আমি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই, ঠাকুর একাইক [একান্তে] আমাকে প্রশ্ন ক'ল্লেন, 'কি গো, তুমি কি আমাকে সংসার-পথে টেনে নিতে এসেচ?' আমি ব'ল্লুম 'না; আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব, তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য ক'ত্তে এসেচি।'' [ন]

ষষ্ঠ অধ্যায়

পতি-সম্মিলন

চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময় শ্রীশ্রীমা যখন কামারপুকুরে আসেন, ঠাকুর তখন ব্রহ্মবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত—ঠাকুরের নিজের ভাষায় বলিতে গেলে, তখন তাঁহার বিজ্ঞানীর অবস্থা বা সহজ অবস্থা। 'সহজভাবে' অবস্থিত ঠাকুর সহজভাবেই সহধর্মিণীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত সকল বিষয়ে তাঁহাকে শিক্ষা দান করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষাদান-কার্য কামারপুকুরে তিনি সম্পূর্ণ করিয়া আসিতে পারেন নাই; মাও তখন জীবনের সর্বপ্রকার দায়িত্ব বুঝিবার মত বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই।

ইহার চারি বৎসরাধিক কাল পরে শ্রীশ্রীমা যখন প্রাণের টানে দক্ষিণেশ্বরে পতির নিকট আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঠাকুর তাঁহাকে মরমী স্বামীর সমগ্র দরদ দিয়াই গ্রহণ করিলেন ও কামারপুকুরে

---

* ১২৭৮ সালে ফাল্গুনী পূর্ণিমা ১৩ই চৈত্র সোমবারে পড়িয়াছে। সুতরাং চৈত্রের দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্রীশ্রীমা প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন এইরূপ অনুমান করা যায়। ঠাকুর বৃহস্পতিবারের বারবেলা বিশেষভাবে মানিতেন। এখানে বারবেলা বলিতে সম্ভবতঃ কালরাত্রিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহা ঠিক হইলে ঐদিন ১১ই চৈত্র শনিবার ছিল। মা বৈদ্যবাটী হইতে নৌকাযোগে আসিয়া থাকিবেন।

আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। ইহার ফলে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী মা যেমন দেশকালপাত্রভেদে আচরণে সুনিপুণ, তেমনি আবার সাধনা ও পবিত্রতা সহায়ে এক মহতী লোককল্যাণ-সাধিকা অধ্যাত্মশক্তির কেন্দ্র-স্বরূপ হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমা এই সময় একাদিক্রমে আটমাস ঠাকুরের সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ আমার বয়স তখন আঠার উনিশ বছর হবে, ওঁর সঙ্গে শুতুম। একদিন ব'ল্লেন, 'তুমি কে?' ব'ল্লুম, 'আমি তোমার সেবা ক'ত্তে আছি।' 'কি?' 'আমি তোমার সেবা ক'ত্তে আছি।' 'তুমি আমা বই আর কাকেও জান না?' 'না।' 'আর কাকেও জান না?' 'না।' 'আর কাকেও না?' 'না।' [নি]

এই কালে প্রায় সমস্ত রাত্রি ঠাকুরের মন উচ্চ ভাবভূমিতে বিচরণ করিত। যদি বা কখনও নীচে নামিত, তাহাতে সাধারণ-মানব-সুলভ দেহবুদ্ধির উদয় হইত না। একএক দিন উহা সমাধিতে এমন লীন হইয়া যাইত যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাহ্যসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিত না। ভাব, সমাধি ইত্যাদি ব্যাপারে তৎকালে অনভিজ্ঞা বালিকা তাহাতে ভীত ও কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িতেন। একদিন কিছুতেই সমাধি-ভঙ্গ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ভাগিনেয় হৃদয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই ঘটনার পরে ঠাকুর তাঁহাকে কিরূপ ভাব হইলে কোন্ নাম বা বীজ শুনাইতে হইবে, তাহা শিখাইয়া দেন। তথাপি যখন তখন সমাধি হইবার আশঙ্কায় মা সারারাত্রি ঘুমাইতে পারেন না জানিতে পারিয়া ঠাকুর পরিশেষে নহবতে নিজ জননীর কাছে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই সময় বাহ্যভূমিতে বিচরণ-কালেও ঠাকুর প্রকৃতি-ভাবে ভাবিত হইয়া আপনাকে জগদম্বার দাসী জ্ঞান করিতেন, আর তাঁহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া শ্রীশ্রীমা আনন্দিত হইয়া অলঙ্কার, কাঁচুলি ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাকে সুন্দর রমণী-বেশে সাজাইয়া দিতেন। মা তখন তদ্ভাবে ভাবিতা—জগদম্বার দাসী—দাসী-ভাবে ভাবিত ঠাকুরের সখী।

ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার পরস্পর এই দিব্য সম্বন্ধ ও আচরণ সাধারণ মানবের বুদ্ধিগম্য নহে। তাঁহাদের অলৌকিক আচরণের কথা শুনিয়া এক

এক সময়ে দেবতা জ্ঞান করিলেও, রক্তমাংসে গড়া মানুষরূপেই সে তাঁহাদিগকে চিরকাল ধরিবার বুঝিবার চেষ্টা করিবে এবং নিজস্ব মাপকাঠিতে তাঁহাদের চরিত্র বিচার করিবে। ঠাকুরের চরিত্রবল ও সংযম একাধিক লোকের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে—জগৎ জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু সাধ্বী পত্নীর দেবচরিত্র ও সংযমের কথা পতি স্বয়ং প্রকাশ না করিলে লোকে জানিতে পারিবে কিরূপে? সেইজন্যই বোধ হয় ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন: "ও যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কি-না, কে বলিতে পারে?" [লী]

ঈশ্বরলাভ-রূপ লক্ষ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি ঠাকুর সংসারী লোকের অবিবেক-প্রসূতে মতামত উপেক্ষা করিয়া চলিলেও, আজীবন অনেক ছোটখাট ব্যাপারে সরল বালকের মত সকলের কথায়ই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন দেখা যায়। ঠাকুরের মত শ্রীশ্রীমাও সরলতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। কোন স্ত্রীলোক তাঁহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, সন্তান না হইলে সংসার-ধর্ম রক্ষিত হয় না, সুতরাং সংসার-বিমুখ পতিকে ঐ বিষয়ে সজাগ করিয়া দেওয়া সহধর্মিণীর অবশ্যকর্তব্য। স্ত্রীলোকটির পরামর্শে মা ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'তাই তো, ছেলেপুলে একটা হবে নি, সংসার-ধর্ম বজায় থাকবে কিসে?' তাঁহার কথা শুনিয়া ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'একটা ছেলে কি খুঁজচ গো, তোমার এত ছেলে হবে যে, তুমি 'মা'-বোলে তিষ্ঠাতে পারবে নি।'[১] পরবর্তী জীবনে ভক্ত সন্তানের কাছে ঘটনাটি বিবৃত করিয়াই ঠাকুরের কথার সমর্থনে মা বলিয়াছিলেন, 'তাই আজ দেখচি বাবা, কত দেশদেশান্তর থেকে কত ছেলেই যে আমার আসচে।' [ন]

ঠাকুরের উত্তর ও তাহার উপর শ্রীশ্রীমার মন্তব্য হইতে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, অন্যের পরামর্শ এখানে নিমিত্তরূপে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং মাতৃত্বের সুপ্ত কামনা অলক্ষ্যে থাকিয়া ঠাকুরের কাছে ঐরূপ বলিতে তাঁহাকে প্ররোচিত করিয়াছিল। যিনি মাতৃত্বমহিমায় ভবিষ্য

---

[১] ঘটনাটি পরবর্তী কোনও সময়ে কামারপুকুরে ঘটে। [নি]

মানবের হৃদয়ে পূজার আসন অধিকার করিবেন, যৌবনে তাঁহাতে মাতৃ-ভাবের উন্মেষ অতিশয় স্বাভাবিক। আর স্বামীর কাছে তাঁহার এই সন্তান-কামনার মধ্যে দেহসুখের ছলনা যে একেবারেই ছিল না, দেশদেশান্তরের বহু সন্তানের গরীয়সী জননীর শ্রীমুখের উক্তিই তাহা প্রমাণিত করে।

যাহা হউক, এই একটি দিনের একটি কথা ছাড়িয়া দিলে, অন্য কোন-দিন শ্রীশ্রীমা নিজের জন্য স্বামীর সেবাধিকার ছাড়া আর কিছু যে কামনা করিয়াছেন এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। আর ঐ সেবার বাসনাও তিনি কখনও মুখ ফুটিয়া ঠাকুরের কাছে প্রকাশ করেন নাই; অন্তরের অন্তস্তলে উহা গোপন রাখিয়া সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্বক যখন যেটুকু সেবাধিকার দিয়াছেন, তিনি সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট রহিয়াছেন, আর সেই সেবার সুযোগে দিনের মধ্যে একটিবার স্বামীকে দর্শন করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন! কতদিন সেই দর্শনের সুযোগটুকু হইতেও অপরে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছে, তবুও তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হন নাই বা তজ্জন্য অন্যের উপর দোষারোপ করেন নাই। ঠাকুরকে খাওয়াইতে আসিয়া তিনি নিত্য তাঁহার দর্শন পাইতেন। শেষাশেষি কোনও সময়ে গোলাপ-মা[২] কিছুদিন যাবৎ নিত্য ঠাকুরের খাবাবের থালা নহবত হইতে তাঁহার ঘরে লইয়া আসিতে থাকায়, মা সেই দর্শন হইতে বঞ্চিত হন। তাঁহার তৎকালীন মনোভাব কত সুন্দর, কত মধুর! "কখন কখন দুমাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না! মনকে বোজাতুম,—মন, তুই এমন কি ভাগ্যি ক'রেচিস যে, রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি?" [গ]—ইহা তাঁহারই শ্রীমুখের কথা।[৩] ঠাকুরের উপর তাঁহার যে অন্য ভক্ত অপেক্ষা অধিক দাবী আছে, তাহা তিনি যেন ভাবিতেই পারিতেন না। শেষ বয়সেও কোন কোন ভক্তকে মা এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন, "ভয় কি? 'আমাদের' ঠাকুর আছেন!"

এই বিশুদ্ধ নিষ্কাম প্রেমের বলেই, তিনি সকলের উপর জয়ী হইয়া,

---

[২] ঠাকুরের শিষ্যা ও শ্রীশ্রীমার সেবিকা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী—ডাকনাম 'গোলাপ'।
[৩] গোলাপ-মাকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'ওর সহ্যগুণ কত! ওকে নমস্কার।' [নি]

ঠাকুরকে সর্বাপেক্ষা অধিক আপনার করিয়াছিলেন। সংসারে অভূতপূর্ব ত্যাগের আদর্শ স্থাপনেব জন্য, লোক-শিক্ষার্থে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী ঠাকুর চিরকালেব জন্য তাঁহার সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়াছিলেন। সেই দেহসম্পর্কশূন্য আত্মিক মিলনের এক অপূর্ব অভিনব চিত্র আমবা পববর্তী অধ্যায়ে দেখিতে পাইব।

সপ্তম অধ্যায়

পূজা-গ্রহণ

দক্ষিণেশ্বরেব পুণ্যপীঠে ঠাকুবেব সাহচর্যে থাকিয়া তাঁহার ও তদীয় জননীর সেবায় শ্রীশ্রীমা এখন দিবারাত্র আপনাকে নিয়োজিত রাখিয়াছেন। এই কালের একটি ঘটনা আমবা এইরূপ শুনিয়াছি ঃ একদিন যখন ঠাকুর তাঁহার ঘবেব উত্তরদিকের বাবান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় কৌতুক-পরবশ হইয়া নহবতের নিকট হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'মামী, তুমি মামাকে বাবা ব'লে ডাক না?' কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া ও ইতস্ততঃ না করিয়া সরলা মা উত্তব দিলেন, 'উনি, বাবা কি ব'লচ হৃদু, পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, স্বজন—সবই উনি।'[১]

এই কালের আব একটি ঘটনা শ্রীশ্রীমা এইরূপে গল্প করিয়াছিলেন ঃ একদিন দুফুরবেলায় ঠাকুর ছোট খাটটিতে ব'সে, আমি ঘর ঝাঁট দিচ্চি; কেউ কোথাও নাই। জিজ্ঞাসা ক'ল্লুম, 'আমি তোমার কে?' তিনি অমনি উত্তর দিলেন, 'তুমি আমাব মা-আনন্দময়ী!' [বি][২]

---

[১] ঘটনাটি 'শ্রীম'-কথিত।

[২] লীলাপ্রসঙ্গে আছে : "শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী একদিন এই সমযে ঠাকুরের পদ-সম্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?' ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরেব জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন, এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন! সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই!'

ব্রহ্মজ্ঞ ঠাকুরের দৃষ্টিতে জীবমাত্রই ব্রহ্ম ; সুতরাং উপরিধৃত উক্তি তিনি বেদান্তের দৃষ্টিতে করিয়াছিলেন, অথবা শ্রীশ্রীমার ঐশ্বরিক স্বরূপ লক্ষ্য করিয়া সহজভাবেই করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। তবে মার সম্বন্ধে ঠাকুরের বিভিন্ন সময়ের উক্তি পর্যালোচনা করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মস্বরূপ গোপন করিয়া সেবাপরায়ণা সহধর্মিণীর রূপে নিজেকে প্রকটিত করিলেও, মার ঐশ্বরিক স্বরূপ ও শক্তি অলৌকিক-দৃষ্টি-সম্পন্ন ঠাকুরের চক্ষে কোনকালেই আবৃত ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন সময়ে গোলাপ-মাকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'ও সারদা—সরস্বতী ; জ্ঞান দিতে এসেচে।' ভাগিনেয় হৃদয়কে মার সঙ্গে ব্যবহারে ও কথাবার্তায় দুর্বিনীত হইতে দেখিয়া ঠাকুর বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন :

একদিন মিষ্টভাষে বিনয় করিয়া।
হৃদয়ে কহেন প্রভু মায়ে দেখাইয়া॥
উনি যদি হন রুষ্ট রক্ষা নাহি আর।
সাবধানে কর কর্ম মিনতি আমার॥ [পুঁ]

১২৮০ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ফলহারিণী কালী-পূজার দিন ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ ৺ষোড়শী জ্ঞানে পূজা করেন।[*] যে ভাবে মা সমাধিস্থ হইয়া ঠাকুরের কৃত সেই মহাপূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তিনি যে কত বড় মহাশক্তির আধার, কথঞ্চিৎ অনুমান করা যাইতে পারে। ঘটনা এইরূপ :

ঠাকুর অন্তরের এক অপূর্ব প্রেরণায় চালিত হইয়া নিজের ঘরে জগন্মাতার বিশেষ পূজা করিতে মনস্থ করিলেন। ভাগিনেয় হৃদয় ও দীনু-পূজারীর সাহায্যে দেবীর রহস্য-পূজার সর্বাঙ্গসুন্দর আয়োজন করিতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। শ্রীশ্রীমাকে পূজাকালে উপস্থিত থাকিতে ঠাকুর পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুর পূজায় বসিলেন।

* শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও ৺ষোড়শীপূজার কালনিরূপণে আমরা লীলা-প্রসঙ্গের অনুসরণ করিলাম। আমরা জানি যে, গ্রন্থকার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে লিখিত যাবতীয় বিষয়ের খুঁটিনাটি তাঁহারই নিকট হইতে শ্রীযুক্তা যোগীন-মার মধ্যবর্তিতায় জানিয়া লইতেন এবং লেখার পরেও তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন।

পূজার পূর্বকৃত্যসকল দর্শন করিতে করিতে মা অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন; এবং ঠাকুরের ইঙ্গিতে, পূর্বমুখে উপবিষ্ট পূজকের দক্ষিণভাগে, আলিম্পন-ভূষিত পীঠে, উত্তরাস্যা হইয়া উপবেশন করিলেন। "সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন,—'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধিশ্বরি মাতঃ ত্রিপুবাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইঁহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর!'

"অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্যাসপূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ ৺দেবী জ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিলেন, এবং ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তুসকলেব কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহাব মুখে প্রদান করিলেন। বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন! ঠাকুবও অধবাহ্য-দশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন। সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্বভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন!" [লী]

পূজ্য পূজকেতে দুয়ে, ভাববাজ্য তেযাগিযে,
ভাবাতীতে একত্র মিলন।
দেহ দুটি পড়ে হেথা, মিলিযা গিযাছে সেথা,
বিয়ের বারতা বুঝ মন॥ [পু]

এইভাবে বহুক্ষণ অতীত হইল। নিশাব তৃতীয় প্রহরে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর ৺দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। বিল্বপত্রে নিজের নাম লিখিয়া, সেই বিল্বপত্র সহযোগে পূর্বপূর্ব সাধনকালে ব্যবহৃত বস্ত্র, আভরণ ও রুদ্রাক্ষের মালাদি সমুদয় দ্রব্য, সেই সকল সাধনার ফল এবং নিজেকে দেবী-পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন।

এ পূজা পূজার ইতি, আব দেবদেবী-মূর্তি
কভু না পূজিলা পরমেশ।
যেন পূজা শ্রীশ্রীমার, পরম চরম সার,
পরিণাম সকলের শেষ॥ [পু]

পূজা সম্পূর্ণ হইলে শ্রীশ্রীমার সমাধি ভঙ্গ হইল এবং তিনি মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া নহবত-ঘরে চলিয়া গেলেন।

ষোড়শী-পূজা-কালে শ্রীশ্রীমার আচরণ সম্বন্ধে সারদানন্দ-মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন ঃ ষোড়শী-পূজার সময় মা এতই আবিষ্ট হয়েছিলেন যে, কি যে হচ্চে, তাঁর একেবারেই হুঁস ছিল না। ঠাকুব তাঁকে কাপড় ছাড়িয়ে নূতন কাপড় পরিয়ে দিলেন, প্রণাম করে তাঁর পায়ে মালা রাখলেন, মা কিছুই জানতে পারেন নাই। মাব এত লজ্জা ছিল যে, লক্ষ্মী-দিদি মাকে বলতেন, 'তোমার কাপড খুলে ঠাকুর কাপড় পরিয়ে দিলেন—এতেও তোমার হুঁস হল না?' এইদিন মা প্রসাদী মাংস পর্যন্ত খেয়েছিলেন, অথচ কখন তিনি মাংস খেতেন না!"*

অষ্টম অধ্যায়

৺সিংহবাহিনী-জাগরণ

১২৮০ সালের আশ্বিন কিংবা কার্তিক মাসে শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটীতে যান। তাঁহার দেশে গমনের অল্পকাল পরে, ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখে ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই বৎসরেই জয়রামবাটীতে, মার তৃতীয় ভ্রাতা কালী-কুমারের উপনয়নের চতুর্থ দিনে, শুভ ৺রামনবমী তিথিতে তাঁহার রামভক্ত পিতা শ্রীরামচন্দ্র নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ইষ্টপদে মিলিত হন। স্নেহময় পিতার পরলোক-গমনে পিতৃবৎসলা কন্যা যে শোকে কাতর হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। সেই বিয়োগ-ব্যথা কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইবার বাসনায় তিনি স্বল্পকাল পরেই, ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন করেন এবং পূর্বের ন্যায় ঠাকুরের জননীর সঙ্গে নহবত-ঘরে বাস করিতে থাকেন।

---

* গ্রন্থকার-সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীসারদানন্দ-প্রসঙ্গ'।

স্বল্পপরিসর ঘরে দুইজনের থাকিতে কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া, ঠাকুরের ভক্ত ও তৎকালীন রসদ্দার শ্রীশম্ভুচরণ মল্লিক মহাশয় মন্দিরের নিকটে কিছু জমি আড়াই শত টাকায় মৌরসী করিয়া লন, এবং নেপালের রাজকর্মচারী কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় প্রদত্ত শালকাঠের সাহায্যে শ্রীশ্রীমার বাসের জন্য তথায় একখানি চালাঘর নির্মাণ করাইয়া দেন।[১] সেই ঘরে সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিবার এবং তাঁহাকে কাজে সাহায্য করিবার জন্য একটি পরিচারিকাও নিযুক্ত হইয়াছিল। এখানে মা ঠাকুরের জন্য প্রত্যহ নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া মন্দিরে লইয়া যাইতেন এবং কাছে বসিয়া পরিতোষপূর্বক তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। মার তত্ত্বাবধান ও মনস্তুষ্টির জন্য ঠাকুরও দিবাভাগে মাঝে মাঝে এই গৃহে শুভাগমন করিতেন এবং খানিকক্ষণ থাকিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতেন। একদিন অপরাহ্নে ঠাকুরের আগমনের পর হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত বৃষ্টি হইতে থাকায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া এখানে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছিল এবং সেই রাত্রে মা তাঁহাকে ঝোলভাত রান্না করিয়া খাওইয়াছিলেন। সেবানিরতা মাকে হাসিতে হাসিতে ঠাকুর রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'কালীর বামুনরা রাত্রে বাড়ী যায় না? এ যেন আমি তাই এসেচি!'

এইরূপে বৎসরকাল ঐ ঘরে বাস করিবার পরে শ্রীশ্রীমা কঠিন আমাশয়-রোগে আক্রান্ত হইলেন। শম্ভুবাবুর বিশেষ যত্ন ও চিকিৎসার ব্যবস্থায় রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে, মা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সম্ভবতঃ ১২৮২ সালের আশ্বিন মাসে পিত্রালয় জয়রামবাটীতে গমন করিলেন। কিন্তু জয়রামবাটীতে রোগের পুনরাক্রমণে তাঁহাকে শয্যাশায়িনী হইতে হইল এবং তাঁহার শরীররক্ষা পর্যন্ত সংশয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

---

[১] শম্ভুবাবুর ন্যায় তাঁহার পত্নীও ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। মার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান-কালে শম্ভু-পত্নী তাঁহাকে প্রত্যেক জয়-মঙ্গলবারে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিতেন। চালাঘর সম্বন্ধে শ্রীমতী নিকুঞ্জদেবীকে মা বলিয়াছিলেন: শম্ভু মল্লিক থাকার জন্যে ঘর ক'রে দিলে; তা বৌমা, সেখানে থাকতে মন চাইত' না। সেকথা শুনে' তিনি হৃদয়কে ব'ল্লেন, 'হৃদে, তবে তোর স্ত্রীকে আন্।' হৃদু ব'ল্লে, 'আমার স্ত্রীর জন্যে কি শম্ভু বাড়ী ক'রে দিলে?'

সেই অসুখের সময় শ্রীশ্রীমা গৃহ-সন্নিকটে কলুপুকুরের[২] ধারে শৌচে যাইতেন এবং বারবার যাইতে কষ্ট হইত বলিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া থাকিতেন। একদিন সেই পুকুরের জলে নিজের অস্থিচর্মসার দেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাঁহার দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা পর্যন্ত মনে উদিত হইয়াছিল।

অতঃপর রোগ-শান্তির কামনায় শ্রীশ্রীমা গ্রাম্যদেবী ৺সিংহবাহিনীর মণ্ডপে যাইয়া হত্যা দেন। এই হত্যাদান সম্বন্ধে পরে মা বলিয়াছিলেন: আমাকে পাঁচ মিনিটও প'ড়ে থাকতে হয় নাই; তুমিকেন প'ড়ে আছ গো?' —এই ব'লে সিংহবাহিনী আমাকে তুলে দিয়েছিলেন। [ন] শুনা যায়, সিংহবাহিনী ঔষধরূপে তাঁহার ওলতলার কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে মাকে আদেশ করিয়াছিলেন। [ই][৩] যাহা হউক, সিংহবাহিনীর নির্দিষ্ট ঔষধ সেবন করার ফলে ক্রমশঃ মার শরীর পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। ইতঃপূর্বে জয়রামবাটীর সিংহবাহিনীকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরাও বড় একটা জানিত না বা তাঁহাকে পূজাদি দিতে আসিত না। মা হত্যা দিয়া দেবীকে জাগ্রত করার পর তাঁহার মাহাত্ম্য চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছে, লোকে তাঁহার কাছে মানত করিয়া সিদ্ধকাম হইতেছে এবং নিকটবর্তী ও দূরস্থিত গ্রামসমূহ হইতে পূজাদানার্থী লোকের সমাগমে দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ নিত্য কোলাহল-মুখর হইয়া উঠিতেছে।[৪]

এই বৎসরের শেষভাগে শ্রীশ্রীমার পেটের প্লীহা অত্যন্ত বর্ধিত হওয়ায় উহা দাগাইবার জন্য শ্যামাসুন্দরী কন্যাকে লইয়া কয়াপাটের হাটতলায়

---

২ শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন কলুপুকুরে স্নান করিযাছিলেন।

৩ এই 'সিংহবাহিনীর মাটি' মা সবদা সঙ্গে রাখিতেন এবং নিত্য তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতেন।

৪ ৺সিংহবাহিনীর মহাত্ম্যপ্রচার সম্বন্ধে অনুরূপ ঘটনাও পাওয়া যায। শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন: আমার অসুখের সময়—তখন সব শরীর ফুলে গেছে, নাক কাণ দিয়ে রস ঝরচে—উমেশ ব'ল্লে, 'দিদি, এখানে সিংহবাহিনী আছেন, হত্যা দেবে?' সেই আমাকে নিয়ে গেল ধ'রে ধ'রে। পূর্ণিমার রাত আমার কাছে অমাবস্যে। চোখে দেখতে পাই না, জল প'ড়ে প'ড়ে চোখ গেছে। গিয়ে মায়ের মাড়োতে প'ড়ে রইলুম। আবার আমাশয়, তিনচার বার হাতড়ে হাতড়ে রাত্রেই বাহ্যে গেলুম। ভিক্ষে-মা ছিল—ঐখানেই

আসেন। তথাকার শিবমন্দিরে তখন অন্যলোকের প্লীহা দাগানো হইতেছিল। কয়েকজনের কাজ হইয়া যাওয়ার পর, যে ব্যক্তি প্লীহা দাগায় তাহাকে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, 'বাবা, বেলা হ'য়েচে। তুমি চান ক'রে এই নূতন কাপড়খানি পর। একটু জল খাও, আর ঐ [অন্যের ব্যবহৃত] পাতা, আগুন ফেলে দিয়ে, সব নূতন ক'রে নিয়ে, আমার মেয়েটির পীলে দেগে দাও।' সহনশক্তিময়ী মা প্রবোধবাবুকে বলিয়াছিলেন যে, প্লীহা দাগাইবার সময় তাঁহার বিশেষ কষ্ট হয় নাই, একটু লাগিয়াছিল মাত্র! যাহা হউক, প্লীহাটি ইহাতেই সারিয়া গিয়াছিল। শুনা যায়, প্লীহা দাগাইবার জন্য ঠাকুরও কোন সময়ে ঐ কয়াপাটের হাটতলায় আসিয়াছিলেন।

১৮৮২ সালের ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় ঠাকুরের রত্নগর্ভা জননী চন্দ্রমণি

তার ঘর—সে মাঝে মাঝে গলা খেঁকরি দিত', আমি না ভয় পাই। প'ড়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরেই আমার মাকে এসে ব'লচেন,—কামারদের একটি মেয়ের বেশ, রাধুর মত অতবড় মেয়েটি—'যাও যাও, উঠিয়ে আনগে। অমন অসুখ, তাকে ফেলে রাখতে আছে? এখুনি আনগে। এই ওসুধ দিও, এতেই ভাল হ'য়ে যাবে।' এদিকে আমাকে ব'ল্লেন, 'লাউফুল নুন দিয়ে র'গড়ে তার রস চোখে টোপ দিও, ভাল হ'য়ে যাবে।' তারপর মা যে ওষুধ পেলেন তাই নিলুম, আর লাউফুলের রস চোখে টোপ দিলুম। দিতে, যেমন জাল টেনে আনে, তেমনি চোখের সব ময়লা টেনে বার ক'রে দিলে। সেই দিনই চোখ ভাল হ'য়ে গেল, আর শরীরের সব ফুলোটুলো ক'মে গেল। শরীর বেশ ঝরঝরে হ'ল'—সেরে গেলুম। যে জিজ্ঞাসা ক'ত্ত' তাকে ব'লতুম, 'মা ওষুধ দিয়েচেন।' সেই হ'তেই মা সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্য প্রচার হ'ল'—আমিও ওষুধ পেলুম, জগৎও ধন্য হ'ল'। [গ] সম্ভবতঃ ইহা দ্বিতীয়বার হত্যাদান-সম্পর্কিত ঘটনা।

একদিন শ্রীশ্রীমার বাড়ীর বাগালকে পুণ্যপুকুরের বাঁশবনে শাঁখামুটি-সাপে কামড়ায়—বামহাতের তর্জনীর ডগায়। মা বলিলেন, 'সিংহবাহিনীর মাড়োতে ওকে নিয়ে যাও—স্নানজল খাওয়াও, আর আঙ্গুলে মাটি লাগাও।' সেইরূপই করা হইল এবং ছেলেটিও সারিয়া গেল। [বি] একদিন মাঠের আলপথ দিয়া আসিবার সময় মার ভ্রাতুষ্পুত্র ভূদেবকে বিষধর সাপে কামড়ায় ও সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। সর্পদষ্ট স্থানে সিংহবাহিনীর মাটির প্রলেপ দিয়া, সারারাত্রি মা তাহাকে ঘরে শোয়াইয়া রাখেন। পরদিন সকালে তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে। [ই]

দেবী দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার দেবতনয়ের সাক্ষাতে গঙ্গাপ্রাপ্ত হন। এই সংবাদ পাইয়াই শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং একটি ঝি ও গোঁসাইদাস নামক একটি লোককে সঙ্গে নিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসেন। (৫ই চৈত্র, ১২৮২)।

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীশ্রীমা পূর্ববৎ শম্ভুবাবু-নির্মিত চালাঘরেই বাস করিতে থাকেন। হৃদয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও সেই সময় তাঁহার সঙ্গে ঐ ঘরে থাকিতেন। কিন্তু এইবারে তিনি অধিক দিন এখানে বাস করিতে পারেন নাই; ঠাকুরের সেবা-প্রয়োজনে চালাঘর ছাড়িয়া চিরকালের মত নহবত-ঘরে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

এই সময় ঠাকুরের কঠিন আমাশয়-রোগ হয়। একজন প্রাচীন স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিয়া সেবা করিতে থাকেন এবং কাশীবাসিনী বলিয়া নিজের পরিচয় দেন।[৫] তিনিই মাকে একপ্রকার জোর করিয়াই চালাঘর হইতে নহবতে লইয়া আসেন।

ইতঃপূর্বে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সম্মুখে সলজ্জ বধূটির মত অবস্থান করিতেন এবং মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিতেন না। ঐ স্ত্রীলোকটিই তাঁহার এই সঙ্কোচের ভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। একদিন রাত্রিকালে তিনি মাকে ঠাকুরের গৃহে লইয়া গিয়া মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দেন, এবং ঠাকুর তাঁহাদিগকে ভগবৎকথা শুনাইতে আরম্ভ করেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত রাত্রি ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পানে তাঁহারা উভয়ে এমনই বিভোর ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কখন যে সূর্যোদয় হইয়া গিয়াছে, জানিতেও পারেন নাই!

১২৮৩ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীমা সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপন করেন, এবং কার্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে ভাগিনেয়-বধূ সহ বর্ধমানের পথে দেশে ফিরিয়া যান।[৬]

---

[৫] ঠাকুরের তিরোভাবের পর শ্রীশ্রীমা ৺কাশীতে গিয়া এই স্ত্রীলোকটির বহু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা পান নাই।

[৬] শ্রীশ্রীমার গোঁসাইদাসের সঙ্গে আসা, সাবিত্রীব্রত করা ও দেশে ফিরিয়া যাওয়া —এই তিনটি ঘটনার সন-তারিখ 'শ্রীম'-লিখিত। সাবিত্রীব্রতের উল্লেখ স্বামী সারদানন্দের দিনলিপিতেও পাওয়া যায়।

নবম অধ্যায়

৺জগদ্ধাত্রীপূজা

রামচন্দ্রের পরলোক-গমনের পর তাঁহার পরিবারে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। ছেলেবা সকলেই তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক; সংসারের কাজকর্ম দেখিবার যোগ্যতা তাহাদের ছিল না। চাষ-আবাদেব স্বয়ং তত্ত্বাবধান করা ব্যতীত, যাজন-কার্য করিয়া রামচন্দ্র কোনরূপে সংসাব চালাইয়া নিতেন। তাঁহাব অভাবে যাজন-লব্ধ আয়ের পথ কতকটা রুদ্ধ হইল; এবং চাষ-আবাদও নিজেরা দেখিতে না পারায়, জমি হইতে যে ধান পাওয়া যাইত, তাহাতে সম্বৎসরের ব্যয়-সঙ্কুলান হইত না। তাঁহাব অপর ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় ভট্টাচার্যের কার্য করিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করিলেও, নিজেব খরচপত্র বাদে সংসারে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিতেন না।

এইরূপ সঙ্কট অবস্থায় রামচন্দ্র-গৃহিণী শ্যামাসুন্দরী কায়িক পবিশ্রমে অন্নের সংস্থান করিয়া যেভাবে সংসাব প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। গ্রামের বাঁড়ুজ্যেরা সেই সময়ে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বাঁড়ুজ্যে পুকুর[১] এখনও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহাদের এক আড়া ধান ভানিয়া শ্যামাসুন্দরী চারি কুড়ি[২] করিয়া ধান পাইতেন। শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে থাকিলে স্বীয় জননীকে ধান ভানার কাজে সাহায্য করিতেন।

শ্যামাসুন্দরীর যেমন মনের বল তেমনি দেহের সামর্থ্য ছিল। তাঁহাব পুত্রবধূদিগকে বলিতেন, 'ঘরে সবই আছে, তবু তোরা রান্নার জন্যে কষ্ট পাচ্চিস! আমরা ঘরে ভাত ব'সিয়ে দিয়ে, শিওড়ে গিয়ে তরকারী নিয়ে এসেচি। ষোল-পাখা উনুন চলেচে, তাতে রান্না ক'রে এসেচি—এক হাঁড়ি ভাত আর এক ধুচুনি চালের জন্যে!' [ই]

---

১ এই বাঁড়ুজ্যে পুকুরে (বড়পুকুর বা তালপুকুরে) শ্রীশ্রীমা নিত্য স্নান করিতেন ও তথা হইতে পানীয় জল লইয়া আসিতেন।

২ এক আড়া=১৬ কুড়ি; এক কুড়ি=৪ মান। চাউল ও কলাই ১ মন=১৬ মান; ধান ১ মন=২৪ মান।

যে সময়ে শ্যামাসুন্দরী এইরূপ কায়ক্লেশে সংসার চালাইতেছিলেন, সেই সময়ে পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রসন্নকুমার জিব্‌টায়, বরদাপ্রসাদ শিহড়ে হরেরাম ভট্টাচার্যের বাড়ীতে এবং কনিষ্ঠ অভয় মাতুল-বাড়ীতে[৩] থাকিয়া কিছুদিন পড়াশুনা করেন। তারপরে প্রসন্নকুমার কথঞ্চিৎ উপযুক্ত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার এক জ্ঞাতি-কাকার সঙ্গে যাজনাদি কার্যে অর্থার্জন-মানসে কলিকাতা আসেন। দুঃখকষ্টে কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পরে শ্যামাসুন্দরী আদিষ্ট হইয়া বাড়ীতে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী-দেবীর অর্চনা করেন এবং তাহার পর হইতে সংসারের শ্রী ক্রমশঃ ফিরিয়া আসে।[৪]

৺জগদ্ধাত্রীপূজার কথায় শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: "একবার গ্রামের কালী-পূজোর সময় নব-মুখুজ্যে আড়াআড়ি ক'রে আমাদের পূজোর চাল নিলে না—ফেরত দিলে। মা চালটাল তৈরি ক'রে রেখেছিলেন—পূজোর যোগাড়। আমাদের ঘর থেকে আর নিলে না! মা সমস্ত রাত্রি কেবল কাঁদচেন—'কালীর জন্যে চাল ক'রেচি, আমার চাল নিলে না? এ চাল আমার কে খাবে? এ কালীর চাল তো কেউ খেতে পারবে না।' তারপর রাত্রে দেখেন কি, লালমুখী দেবী দোরগোড়ায় পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সেচেন! তখন ঐ একটি ঘর—বরদার ঘরটি। তিনি [ঠাকুর] এলেও ঐ ঘরে থাকতেন। জগদ্ধাত্রী আমার মাকে গা চাপড়ে চাপড়ে উঠালেন। উঠিয়ে ব'ল্লেন, 'তুমি কাঁদচ কেন? কালীর চাল আমি খাব, তোমার ভাবনা কি?' মা ব'ল্লেন, 'কে তুমি?' জগদ্ধাত্রী ব'ল্লেন, 'এই যে গো, এর পরেই যার পূজো।' পরদিন মা আমাকে ব'লচেন, 'ওরে সারদা, লাল রঙ, পায়ের উপর পা দিয়ে—ও কি ঠাকুর?—জগদ্ধাত্রী? আমি জগদ্ধাত্রীপূজো

---

৩ শ্যামাসুন্দরীর রামব্রহ্ম, রামতারক, কেদার, শ্রীপতি ও বৈকুণ্ঠ নামে পঞ্চভ্রাতা এবং দিনময়ী নামে এক ভগিনী ছিলেন। ভ্রাতৃগণের বংশ লোপ পাইয়াছে।

৪ জনশ্রুতি-অনুসারে প্রথম বৎসর জগদ্ধাত্রীপূজার দিন বুধবার ছিল এবং লক্ষ্মীবার মাসের পয়লা ইত্যাদি কারণ দেখাইয়া শ্রীশ্রীমা পরদিন প্রতিমা বিসর্জন হইতে দেন না। এই সূত্র ধরিয়া আমরা ১২৮৪ সাল জগদ্ধাত্রীপূজার প্রথম বৎসর সিদ্ধান্ত করিয়াছি। এই সালে ৩০শে কার্তিক বুধবার সংক্রান্তির দিন পূজা পড়িয়াছে। বহু বৎসরের মধ্যে এরূপ যোগাযোগ আর নাই।

ক'রব।' জগদ্ধাত্রীপূজো ক'রব, জগদ্ধাত্রীপূজো ক'রব—একটা বাই হ'য়ে গেল। বিশ্বাসদের থেকে দু আড়া ধান আনালেন। এমন বৃষ্টি তখন, একদিনও ফাঁক নাই। মা ব'ল্লেন, 'কি ক'রে তোমার পূজো হবে, ধানই শুকতে পাল্লুম নি।' শেষটায় মা-জগদ্ধাত্রী এমন রোদ দিলেন যে, চারদিকে বৃষ্টি হ'চ্চে, মায়ের চাটাইয়ে রোদ! কাঠের আগুনে সেঁকে মূর্তি শুকিয়ে রঙ দেওয়া হ'ল'।[৫] প্রসন্ন তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে খবর দিতে গেল। তিনি ব'ল্লেন, 'মা আসবেন, মা আসবেন—বেশ, বেশ। তোদের বড় খারাপ অবস্থা ছিল যে রে?' প্রসন্ন ব'ল্লে, 'আপনি যাবেন, আপনাকে নিতে এলুম।' তিনি ব'ল্লেন, 'এই আমার যাওয়া হ'ল'। যা, বেশ পূজো করগে। বেশ বেশ, তোদের ভাল হবে।' জগদ্ধাত্রীপূজো হ'ল', দেশাঁও [দেশশুদ্ধ বা গ্রামশুদ্ধ লোক খাওয়ানো] হ'ল'; ঐ চালেই সব খরচপত্র কুলিয়ে গেল। প্রতিমা বিসর্জনের সময় মা জগদ্ধাত্রীমূর্তির কাণে ব'লে দিলেন, 'মা জগাই, আবার আর বছর এসো! আমি তোমার জন্যে সমস্ত বছর ধ'রে সব যোগাড় ক'রে রাখব।'

"পরবছর মা আমাকে ব'ল্লেন, 'ছাখ, তুমি কিছু দিও; আমার জগাইয়ের পূজো হবে।' আমি ব'ল্লুম, 'অত ল্যাঠা আমি পারব নি। হ'ল', একবার পূজো হ'ল'; আবার ল্যাঠা কেন? দরকার নাই, ও পারব না।' রাত্রে স্বপ্নে দেখি কি, তিনজন এসে হাজির—জগদ্ধাত্রী, জয়া-বিজয়া।[৬] ব'লচেন, 'আমরা তবে যাব?' আমি ব'ল্লুম, 'কে তোমরা?' ব'ল্লেন, 'আমি জগদ্ধাত্রী।' ব'ল্লুম, 'না মা, তোমরা কোথা যাবে? না, না, তোমরা কোথা যাবে, তোমরা থাক, তোমাদের যেতে বলি নাই।' সেই থেকে বরাবর জগদ্ধাত্রীপূজোর সময় এখানে আসি—বাসন টাসন মাজতে

---

[৫] এক অজ্ঞাতপরিচয় স্ত্রীলোক শিয়াস গ্রামের কুঞ্জ-মিস্ত্রীর কাছে গিয়া বলে, 'জয়রামবাটীর প্রসন্ন-মুখুজ্যের ঘরে জগদ্ধাত্রী গড়তে তোমাকে যেতে হবে।' যথাকালে মিস্ত্রী আসিয়া উপস্থিত! সকলে অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে গেছল' তোমাকে ব'লতে?' মিস্ত্রী বলিল, 'আপনারা যে একটি মেয়ে-মানুষ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন!' [ই]

[৬] শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে ৺জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার দুই পাশে জয়া ও বিজয়ার মূর্তি যথাবিধানে পূজা করা হয়।

হয় কি-না। আর তখন তো আমাদের সংসারে লোকজন বেশী ছিল না, বাসন মাজতে আসতুম। তারপর যোগীন [স্বামী যোগানন্দ] সব কাঠের বাসন ক'রে দিলে : ব'ল্লে, 'মা তোমাকে আর বাসন মাজতে যেতে হবে না।' জগদ্ধাত্রীপূজোর জমিও ক'রে দিলে।" [ধ][১]

একবার ৺জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার বিসর্জনের সময় শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "কানের গয়না একটি খুলে রাখবে—মা সেইটি মনে ক'রে আসবেন। [বি]

দশম অধ্যায়

ডাকাত-বাবা

শ্যামাপূজা, ফলহারিণীপূজা ও স্নানযাত্রার দিনত্রয় দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বিশেষপর্বাহ বলিয়া পরিগণিত। স্নানযাত্রার পর প্রায়ই পঞ্চমীর

[১] শ্রীকালীকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন : প্রথম চারি বৎসর আমার মার নামে, দ্বিতীয় চারি বৎসর আমার দিদির নামে, তৃতীয় চারি বৎসর আমার খুড়া নীলমাধবের নামে জগদ্ধাত্রীপূজার সঙ্কল্প হয়। যোগানন্দ-স্বামী কাঠের বারকোষ, লট্‌কন, সিংহাসনের চৌকী ইত্যাদি অনেকগুলি জিনিষ করিয়া দিয়াছিলেন ; আর তিনশত টাকা দিয়া তিন বিঘা জমি ক্রয় করিয়া দেন।

ইন্দুমতী দেবী বলেন : "বার বৎসর পূজা হওয়ার পর মা [ইন্দুমতী শ্রীশ্রীমাকে 'মা' শব্দে নির্দেশ করেন] বলিলেন, 'আমরা আর পূজো ক'রব নি। সবাইর নামে হ'ল', আমরা আর মাকে আনতে পারব নি।' সেই রাত্রে জগদ্ধাত্রী, পরে যেখানে মাঁর বাড়ী হইয়াছে সেই জায়গায় দেখা দিয়া বলিলেন, 'তবে আমি যাই, তবে আমি যাই, সতুরা [সতু=মধু মুখুজ্যের পিসী] আনবে ব'লচে, তবে ওদের ঘরে যাই ?' তখন মা নিজের গলায় কাপড় দিয়া, জগদ্ধাত্রীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'না মা, তেসত্য ক'রে বুঝি চ'লে যাচ্চ এখান থেকে ? আমি আর ছাড়ব নি তোমাকে—আমি বছর বছর তোমাকে আনব।'

"মা নিজে জগদ্ধাত্রীর নামে নয় বিঘা জমি দেবোত্তর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাইরা সেই জমির চাষী। তাহা হইতে তাঁহাদিগকে প্রতি বৎসর সাড়ে চারি আড়া ধান—প্রত্যেকে দেড় আড়া করিয়া—জগদ্ধাত্রীপূজায় দিতে হয়। এইটি শরৎ-মহারাজের ব্যবস্থা।"

দিন ঠাকুর দেশে যাইতেন ; কামারপুকুর, জয়রামবাটী ও শিহড়ে যাওয়া আসা করিতেন ; এবং দুর্গাপূজার পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিতেন—লক্ষ্মীদেবীর উক্তি হইতে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। ১২৮৪ সাল হইতে তিনবৎসরকাল তিনি ঐরূপে গমনাগমন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার দেশে অবস্থিতিকালে শ্রীশ্রীমাও যে তাঁহার সঙ্গে দেশেই থাকিতেন ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

১২৮৬ সাল হইতে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার কাছে আসিতে আরম্ভ করেন। ঐ বৎসরের শেষভাগে দেশে যাইয়া পরবর্তী বৎসরের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় সাতমাস কাল তিনি দেশে অবস্থান করেন এবং এই সময়ের মধ্যেই ৺রঘুবীরের সেবার জন্য জমিক্রয়াদি কার্য সম্পন্ন হয়, কথামৃতে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। ইহার পর স্থূলশরীরে ঠাকুর যে আর দেশে গমন করেন নাই, ইহা নিশ্চিত।

কলিকাতা হইতে ঘাটাল পর্যন্ত ষ্টীমার চলাচল আরম্ভ হইলে শ্রীশ্রীমাকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর ষ্টীমারে একবার দেশে গিয়াছিলেন এবং পথে বালি নামক স্থানে ত্রিরাত্রি বাস করিয়াছিলেন। তথাকার কোন ভক্তিমান মোদক নবনির্মিত গৃহে সপরিবার প্রবেশের পূর্বে কোন সাধুসজ্জনকে তিনদিন রাখিয়া সেবা করিতে বাসনা করিয়াছিল। অবিরল ধারায় বৃষ্টি হইতে থাকায় ঠাকুর ঐ সময়টা তাহার গৃহে অবস্থান করিতে বাধ্য হন এবং সমাগত লোকজনকে দর্শন ও ধর্মোপদেশ দানে কৃতার্থ করেন।[১] দেশে

---

[১] ঠাকুর সম্ভবতঃ কলিকাতা-ঘাটাল ষ্টীমারে গিয়া 'বন্দর' নামক স্থানে অবতরণ করেন এবং তথা হইতে নৌকাযোগে দারকেশ্বর-নদের ভিতর দিয়া 'বালি' গ্রামে যান। কামারপুকুর হইতে ঐ স্থানের দূরত্ব প্রায় চারিক্রোশ। স্বামী ধ্রুবানন্দকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন যে, নদের তীরে মোদকের ঘর ছিল এবং নিকটেই অনেকগুলি গোস্বামীর বাড়ী ছিল। ধ্রুবানন্দজী অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, বালিতে লুপ্তবংশ সেই মোদকের ঘর নদ-গর্ভে বিলীন হইয়াছে এবং গোঁসাইদের বাড়ী আজও বিদ্যমান। পুঁথিতে বালির স্থলে 'দেওয়ানগঞ্জ' লিখিত আছে। দেওয়ানগঞ্জ বালি হইতে অনেকটা দূরে অবস্থিত। দেওয়ানগঞ্জের অর্ধক্রোশ দূরে প্রবাহিত কাটা খাল 'ঝুমঝুমি' তখন নৌকা-চলাচলের যোগ্য ছিল না। তথায় গোস্বামীদের বাসও নাই।

যাওয়ার পথে ঠাকুরের সহগামিনী হওয়ার স্মৃতি মার জীবনকে মধুময় করিয়াছিল ; নিকুঞ্জদেবীকে বলিয়াছিলেন ঃ নৌকায় ক'রে বালি হ'য়ে দেশে যাওয়া—একসঙ্গে খাওয়া, গান গাওয়া, পরস্পব প্রসাদ খাওয়া। ব'ল্লেন, 'আমি জানি তুমি কে, কিন্তু এখন ব'লব না।' আবার নিজেকে দেখিয়ে ব'ল্লেন, 'আর এর ভিতর সব আছে।'

কামারপুকুব অথবা জয়রামবাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে হইলে, শ্রীশ্রীমাকে প্রায়ই পদব্রজে আসিতে হইত। একবার ঐরূপে আসিবার সময় তিনি মাঠের মধ্যে ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলেন। ঘটনাটি এইরূপ ঃ

ভূষণ-মণ্ডলের মা প্রভৃতি কয়েকজন বর্ষীয়সী রমণী গঙ্গাস্নানে যাইবেন শুনিয়া শ্রীশ্রীমাও যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী[১] এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরামও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। কামারপুকুর হইতে আরামবাগ পর্যন্ত চারিক্রোশ পথ আসিতে মা বিশেষ ক্লান্তি বোধ কবিলেন না। আরামবাগে পৌঁছিয়া সেই রাত্রি তথায় বিশ্রাম করিবার কথা ; কিন্তু তখনও যথেষ্ট বেলা আছে দেখিয়া সঙ্গীরা তথায় রাত্রিবাসে অনিচ্ছুক হইল এবং প্রায় পাঁচক্রোশ ব্যাপী ভয়সঙ্কুল মাঠ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তারকেশ্বরে পৌঁছিবার সঙ্কল্প করিল। কোন কাজে অন্যের অসুবিধাব কারণ বা ভারস্বরূপ হওয়া চিরকালই মার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। সেইজন্য একসঙ্গে এত অধিক পথ চলিতে নিজের বিশেষ কষ্ট হইবে বুঝিয়াও তিনি মুখে কিছু প্রকাশ করিলেন না ; কিন্তু প্রায় দুইক্রোশ পথ একযোগে চলিয়া ক্লান্তিবশতঃ পিছাইয়া পড়িতে লাগিলেন। দুইবার সঙ্গীরা তাঁহার

[১] শ্রীমতী লক্ষ্মীর কাছে মুড়ির পুঁটুলির মধ্যে শ্রীশ্রীমার গয়না লুকানো ছিল। বালবিধবা লক্ষ্মী চৌদ্দবছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে মার কাছে বাস করিতে আসেন। ১২৮৪ সালের মাঘ মাসে তাঁহার চৌদ্দ বছর পূর্ণ হয়। যেবার ডাকাত বাবার মিলন ঘটে সেবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পাঁচ ছয় দিনের বেশী থাকেন নাই, সুতরাং তখনও স্থায়িভাবে মার কাছে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা হয় নাই বুঝিতে হইবে। ইহা ঠিক হইলে ডাকাতবাবার ঘটনাটি ১২৮৩ সালেব ব্যাপার বলিযা সহজেই অনুমিত হয়। উহা শীতকালীন ঘটনা, যেহেতু উহার সঙ্গে ক্ষেতে কড়াইশুঁটির সম্বন্ধ আছে।

জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করিল ; এবং এত ধীরে চলিলে যে এক প্রহর রাত্রির মধ্যেও মাঠ অতিক্রম করা সম্ভবপর হইবে না ও সকলকেই ডাকাতের হাতে পড়িতে হইবে, ইহাও জানাইল। তাহাদিগকে একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে পৌঁছিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া মা যথাসম্ভব দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বেলা পড়িয়া আসিল এবং প্রান্তর মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে মা দেখিতে পাইলেন—লম্বা লাঠি হাতে, একটি কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকার পুরুষ তাঁহারই অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। লোকটির হাতে রূপার বালা এবং মাথায় ঝাঁকড়া চুল। সঙ্গীরা তখন দৃষ্টিপথের বাহিরে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে ; কেবল দুইটি অতিপ্রৌঢ় স্ত্রীলোক তাঁহারই মত দ্রুত চলিতে না পারিয়া একসঙ্গে পিছাইয়া পড়িয়াছেন।

অন্তরে ভীত হইলেও, পলায়ন-চেষ্টা না করিয়া শ্রীশ্রীমা নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকটি নিকটে আসিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে কর্কশ স্বরে সম্বোধন করিল, কিন্তু পরে তাঁহার শ্রীমুখে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার মনে কি এক অদ্ভুত ভাবান্তর উপস্থিত হইল ; এবং এতকালের অজানা কোন দিব্য আলোকের আভাস যেন অকস্মাৎ হৃদয়-কন্দরে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার অন্তরের তামসিক ভাব নিমেষে বিদূরিত করিল। লোকটি ভাবাবিষ্টের মত দাঁড়াইয়া রহিল। মা কন্যার ন্যায় স্নিগ্ধকণ্ঠে তাঁহাকে পিতৃ-সম্বোধন করিলেন ও নিকটস্থ হইয়া পায়ের মল খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, 'বাবা, সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গিয়েচে, আমি পথ হারিয়েচি : তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালী-বাড়ীতে থাকেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্চি।' এমন সময় লোকটির পশ্চাৎ দিক হইতে দ্রুতপদে একটি স্ত্রীলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই মা বুঝিতে পারিলেন যে, সে পূর্বাগত লোকটির পত্নী। ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া মা তৎক্ষণাৎ উহার হস্তধারণ করিয়া কোমলমধুর-কণ্ঠে কহিলেন, 'মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা। কি বিপদেই পড়েছিলুম মা, যদি বাবা ও তুমি না এসে প'ড়তে !' রমণীর মাতৃহৃদয় বাৎসল্য-রসে বিগলিত হইল।

নিজেদের হীন জাতি—উহারা বাগ্‌দি-জাতীয়—ও অবস্থার কথা ভুলিয়া

ঐ পাইক ও তাহার পত্নী সত্যসত্যই শ্রীশ্রীমাকে স্বীয় কন্যার ন্যায় দেখিতে লাগিল। অতঃপর তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া নিকটবর্তী তেলোভেলো গ্রামের এক ক্ষুদ্র দোকানে লইয়া গিয়া তাহারা তথায় রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিল এবং মুড়ি-মুড়কি জলখাবার কিনিয়া আনিয়া রাত্রির মত তাঁহাকে যৎ-কিঞ্চিৎ ভোজন করাইল। তারপর বাগ্‌দিনী-মাতা কাপড় বিছাইয়া তাঁহাকে ছোট বালিকার মত ঘুম পাড়াইল এবং বাগ্‌দি-পিতা লাঠি-হাতে দ্বার আগলাইয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল।

প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া তাহারা শ্রীশ্রীমাকে লইয়া তারকেশ্বরা-ভিমুখে যাত্রা করিল এবং যাইতে যাইতে ক্ষেত হইতে কড়াইশুঁটি তুলিয়া সস্নেহে মার হাতে দিতে লাগিল। মাও ছোট বালিকাটির মত মুখ-না-ধোয়া অবস্থায়ই তাহা খাইতে খাইতে চলিলেন। বাগ্‌দি পাইক কৃষ্ণ-যাত্রার দলে অভিনয় করিত ও গাহিতে শিখিয়াছিল; পত্নীর আদেশে কন্যার পথশ্রম লাঘব করিবার জন্য সে এখন গানের পর গান গাহিয়া চলিল। প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যখন তাহারা তারকেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিল, তখন প্রায় চারিদণ্ড বেলা হইয়াছে। পৌঁছিয়াই বাগ্‌দি-স্ত্রী তাহার স্বামীকে তাড়াতাড়ি বাবা ৺তারকনাথের পূজা দিয়া আসিতে এবং বাজার করিয়া আনিয়া মাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইতে বলিল। এমন সময় মাও তাঁহার অনুসন্ধান-নিরত সহযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। সকলে মিলিয়া রন্ধনভোজনাদি শেষ করিয়া যখন বৈদ্যবাটী অভিমুখে রওনা হইবেন, তখন দেখা গেল, মার বাগ্‌দি মাতাপিতা ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছে, আর মার চক্ষেও জলধারা! কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারা অনেকদূর পর্যন্ত অনুগমন করিল। বাগ্‌দিনী-মাতা ক্ষেত হইতে কড়াইশুঁটি তুলিয়া কন্যার আঁচলে বাঁধিয়া দিতে দিতে কহিল, 'মা সারদা, রাত্রে এগুলো দিয়ে মুড়ি খাস!' বাগ্‌দি-পিতা কহিল, 'মা, যদি পায়ের বোঝা স্ত্রী সঙ্গে না থাকত', তোমাকে বাবার কাছে নিয়ে যেতুম।' তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে দেখিতে আসিবার জন্য তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া মাও অতিকষ্টে বিদায় লইলেন। বিদায়কালীন মর্মস্পর্শী দৃশ্য মা সমস্ত জীবন ভুলিতে পারেন নাই; শেষ বয়সেও ডাকাত-বাবার গল্প করিতে করিতে সজলনয়নে

বলিয়াছেন, 'ডান দিকের রাস্তায় বাবা চ'লে গেল আর আমি বাঁয়ের রাস্তা দিয়ে সোজা চল্লুম। যতদূর দেখা যায়, ফিরে ফিরে তাকায় আর কাঁদে!' [বি]

ডাকাতি করিতে অভ্যস্ত, অমার্জিতবুদ্ধি এই গ্রাম্য বাগ্দি ও তাহার পত্নীর কঠিন চিত্ত কেবল যে শ্রীশ্রীমার কথায় ও ব্যবহারে এতদূর দ্রবীভূত হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি হয় না। মার মধ্যে তাহারা এমন কি বস্তুর সন্ধান পাইয়াছিল, যাহা সেই পাষাণ গলাইয়া তাহাদের জীবন স্নেহবন্যায় প্লাবিত করিয়া দিল? ইহার উত্তর আমরা বাগ্দি-দম্পতীর উক্তির মধ্যেই দেখিতে পাইব। ডাকাত-বাবার প্রসঙ্গে কোন কোন ভক্তকে* মা বলিয়াছিলেন: আমি তাদের [বাগ্দি-দম্পতীকে] ব'ল্লুম, 'তোমরা আমাকে এত স্নেহ কর কেন গো?' তারা উত্তর দিলে, 'তুমি তো সাধারণ মানুষ নও, আমরা তোমাকে কালীরূপে দেখলুম!' আমি ব'ল্লুম, 'সে কি গো, সে কি গো, তোমরা এটা কি দেখলে?' তারা ব'ল্লে, 'না মা, আমরা সত্যিই দেখলুম; আমরা পাপী ব'লে তুমি রূপ গোপন ক'চ্ছ!' আমি ব'ল্লুম, 'কি জানি, আমি তো কিছু জানি নি!'

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের কাছে সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিলেন। পরবর্তী কালে বাগ্দি পাইক ও তাহার পত্নী যখনই মিষ্টান্নাদি সঙ্গে লইয়া তাহাদের মাঠে-পাওয়া প্রাণপুত্তলীকে দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিত, ঠাকুর ঠিক জামাতার ব্যবহারে ও সমাদরে তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন! কে বলিবে, এই হীনবেশধারী ইহারা কে, আর ঠাকুর ও মার সঙ্গেই বা তাহাদের জন্মান্তরীণ সম্বন্ধ কি!

* * * *

শ্রীশ্রীমা ঠিক কতবার দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিয়াছিলেন বলা কঠিন; কারণ, উহার সমুদয় বিবরণ পাওয়া যায় না। দুইবার দক্ষিণেশ্বরে আগমন সম্বন্ধে তিনি নিজে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ:

"আমি, মা, লক্ষ্মী, আরও কে কে দক্ষিণেশ্বরে আসি। তারকেশ্বর হ'য়ে গত অসুখের মানসিক নখচুল দিয়ে এলুম। প্রসন্ন সঙ্গে থাকায়

---

* শ্রীলালবিহারী সেন ও শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সেন।

প্রথমে ক'লকাতায় তার বাসায় উঠি। ফাল্গুন চৈত্র মাস হবে (১২৮৭)। পরদিন সকালে দক্ষিণেশ্বরে যাই। যেতেই হৃদয় আপনা হ'তে বলতে থাকে, 'কেন এসেচ? কি জন্যে এসেচ? এখানে কি?' এই সব ব'লে তাদের অশ্রদ্ধা করে। আমার মা সে কথায় কোন জবাব দেয় নি। হৃদয় শিওড়ের পুরুষ, আমার মাও শিওড়ের মেয়ে। কাজেই হৃদয় মাকে কোন মান্য ক'ল্লে না। মা ব'ল্লেন, 'চল ফিরে দেশে যাই। এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব?' ঠাকুর হৃদয়ের ভয়ে আগাগোড়া হাঁ, না, কিছুই বলেন নি। আমরা সকলে সেই দিনই চ'লে গেলুম। রামলাল পারের নৌকো এনে দিলে। আমি মনে মনে মা-কালীকে ব'ল্লুম, 'মা, যদি কোন দিন আনাও তো আসব।'

"তারপর হৃদয় ওখান থেকে চ'লে গেল (১২৮৮, স্নানযাত্রা)। রামলাল কালীঘরের পূজারী হ'ল'—হ'য়েই ভাবলে, 'আর কি; এবার মা-কালীর পূজারী হ'য়েচি!' সে ঠাকুরের অত খোঁজখবর নিত' না। উনি ভাবটাব হ'য়ে হয়তো প'ড়ে থাকতেন; এদিকে মা-কালীর প্রসাদ শুকিয়ে থাকত'। ঠাকুরের খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হ'তে লাগল। তখন অন্য কেউ নাই। ঠাকুর পুনঃপুনঃ আমাকে আসবার জন্যে খবর দিতে লাগলেন। ওদেশের যে আসত' তাকে দিয়েই ব'লে পাঠাতেন আসবার জন্যে। কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পানকে দিয়ে ব'লে পাঠালেন, 'এখানে আমার কষ্ট হ'চ্চে। রামলাল মা-কালীর পূজারী হ'য়ে বামুনের দলে মিশেচে। এখন আমাকে আর অত খোঁজখবর করে না। তুমি অবিশ্যি আসবে। ডুলি ক'রে হোক, পালকি ক'রে হোক, দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, আমি দেব।' ঠাকুরের এই সংবাদ পেয়ে আমি শেষে এলুম (১২৮৮, মাঘ বা ফাল্গুন)।" [গ]

ইহার পর দেশে যাইয়া শ্রীশ্রীমা সাতআট মাস পরেই, ১২৯০ সালের মাঘ মাসে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তাঁহার দেশ হইতে রওনা হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভাবের ঘোরে রেলের উপর পড়িয়া গিয়া ঠাকুরের বাম হাতের হাড় স্থানচ্যুত হয় ও খুব কষ্ট হইতে থাকে। যখন মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মা বৃহস্পতিবারের বারবেলায় যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তিনি অনুযোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এই তুমি

বিষ্যুতবারের বারবেলায় রওনা হ'য়ে এসেচ ব'লে আমার হাত ভেঙ্গেচে। যাও যাও, যাত্রা ব'দলে এস গে।' পরদিনই মা যাত্রা বদলাইবার জন্য দেশাভিমুখে রওনা হন।

ইহার পর কোন সময়ে, সম্ভবতঃ ভাসুরপুত্র রামলালের বিবাহোপলক্ষ্যে দেশে যাইয়া শ্রীশ্রীমা ১২৯১ সালের ফাল্গুন মাসে দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন করেন।[৪] উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঠাকুর স্থূলদেহে বর্তমান থাকিতে মা আর দেশে যান নাই।

একাদশ অধ্যায়

সাধন-ভজন

শ্রীশ্রীমার সাধন-ভজনের কথায় প্রথমেই অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—যে দেবী সমাধিস্থা বা স্বরূপে স্থিতা হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা গ্রহণ করিলেন, সাধ্যরূপিণী তাঁহার আবার সাধনার প্রয়োজন কি? সেই প্রশ্নের উত্তর একভাবে দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতেছে।

কালবশে পথভ্রষ্ট মানবকে উচ্চ ধর্মভাব এবং সেই ভাব প্রকাশের উপযোগী জীবনাদর্শ দান করিবার জন্য লীলাপ্রিয় ভগবান নরদেহে অবতীর্ণ হন—অন্য কথায়, স্বকীয় দেবভাবকে মানবীয় ভাবাবরণে আবৃত করিয়া দেবমানব রূপ ধারণ করেন। বাল্যকাল হইতেই মধ্যে মধ্যে মানবীয় ভাবাবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার দেবস্বরূপের প্রকাশ হয় বলিয়া, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দেবত্বে সন্দেহের অবকাশ থাকে না; এবং মানবদেহের সঙ্গে সঙ্গে মানবের অপূর্ণতা স্বীকার করায় মানববৎ সর্বপ্রকার আচরণ—আহারনিদ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরদর্শন পর্যন্ত তাঁহাতে লক্ষিত হয় বলিয়া তাঁহার মানবত্বও অস্বীকার করা চলে না। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ বোধ হইলেও, এই অতিসত্য উভয়বিধ

---

[৪] লীলাপ্রসঙ্গে আছে, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে শ্রীশ্রীমা পিত্রালয়ে। কথামৃতে আছে, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফাল্গুন তিনি নহবতে।

ভাব তাঁহার মধ্যে কিরূপ মধুর সামঞ্জস্যে মিলিত থাকে, তাহার আলোচনা স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তৎপ্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে করিয়াছেন।

আগে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার বা স্বরূপোপলব্ধির পরেও অবতার-পুরুষের—এমন কি, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ভক্তদেরও—সাধন-ভজন হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিতেন,—লাউকুমড়ার আগে ফল, তারপরে ফুল।

ইষ্টপ্রাপ্তি পূর্ব হইতে হইয়া আছে বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের মত দেবমানব বা শ্রীশ্রীমার মত মানবীরূপিণী দেবী যে সমস্ত সাধনা করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজের কোন স্বার্থ থাকে না। শুধু সাধনা কেন, তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেক কার্যই পরার্থে অনুষ্ঠিত হয়[১] ; এবং পরার্থে বহুব কল্যাণে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই, তাঁহাদের সাধনার মধ্যে এমন প্রবল তোড়—দীর্ঘকালব্যাপী এমন সুতীব্র ব্যাকুলতা আসে যে, ব্যষ্টিমুক্তিকামী জীবের সেরূপ তোড় বা ব্যাকুলতা আসিতে দেখা যায় না। ব্যষ্টিমুক্তির জন্য যতটুকু উদ্যম বা শক্তিপ্রকাশের প্রয়োজন, সমষ্টিমুক্তির জন্য যে তদপেক্ষা অনেক বেশী আবশ্যক সে কথা কে অস্বীকার করিবে? শ্রীরামকৃষ্ণের মত দেবমানব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে বিপুল শক্তিপূর্ণ অধ্যাত্ম-তরঙ্গ উত্থাপিত করেন, সেই তরঙ্গকে আশ্রয়মাত্র করিয়াই বহু মুমুক্ষু জীব স্বরূপে আনীত হয়। ঐরূপ দেবমানবই একমাত্র জগদ্‌গুরু ; বিপুল সাধনা দ্বারা তৎকর্তৃক পৃথিবীতে সঞ্চিত আধ্যাত্মিক শক্তিই গুরুশক্তি ; এবং গুরুশক্তির আশ্রয় ব্যতীত কোন জীবই ভবসমুদ্র অতিক্রম করিতে—ইষ্টদর্শন বা স্বরূপোপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। ঐ জগদ্‌গুরুর শক্তিতে কথঞ্চিৎ শক্তিমান হইয়াই পবিত্রহৃদয় সাধারণ গুরুগণ কতক পরিমাণে লোককল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। স্বামী সারদানন্দ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, 'অবতারগুরু

---

[১] কোন যোগ উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা মেয়েদিগকে লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন : স্নান করিয়া উঠিয়া উড়ে ঘাটপাণ্ডাকে একটি ডাব দিয়া বলিলেন, 'এই ফলটি লাও বাবা, ফলের ফলটিও লাও !' [ন]

যেন সূর্য ও সাধারণগুরু যেন চন্দ্র।'[২] চন্দ্রের কিরণ নিজস্ব নহে, উহা সূর্য হইতে প্রাপ্ত।

জগদ্‌গুরু স্বল্পকালের মধ্যেই বহুজীবকে ইষ্টদর্শন বা স্বরূপোপলব্ধি করাইয়া মুক্তি-পদবীতে আরূঢ় করান ; এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানব যাহাতে ধীরে ধীরে সেই বস্তুলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে, সেইরূপ কালোপযোগী জীবনাদর্শ তাহার সম্মুখে স্থাপন করেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দিয়া ঐ দুই কার্য কিরূপে কতদূর সংসাধিত করিয়াছিলেন, ক্ষীণদৃষ্টি মানব কখনও তাহা সমগ্রভাবে দেখিতে পাইবে না। ঐশ্বরিক কার্যের ইয়ত্তা নির্ধারণ করিতে যাওয়া জীবের পক্ষে অনধিকার চর্চা। তথাপি, শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে উহার চিন্তা ও আলোচনা করিলে আমাদেব অশেষ কল্যাণই সাধিত হইবে—শ্রীভগবানের নরলীলানুধ্যান এবং যুগাদর্শ যথাশক্তি ধারণা ও জীবনে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা আমাদিগকে পরম শ্রেয়েরই সমীপবর্তী করিবে।

ঠাকুর আপনভাবে কখন কখন গাহিতেন ঃ

এসে প'ড়েচি যে দায়, সে দায় ব'লব কায়,
যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায় ?
হ'য়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি,
ব'লতে নারি, কইতে নারি, নারী হওয়া একি দায় ! [পুঁ]

আবার মাকেও বলিতেন, 'শুধু কি আমারই দায় ? তোমারও দায় !' নিজে স্থূলদেহে লীলা সম্বরণ করিলে পাছে তদ্‌গতপ্রাণা মাও তদ্রূপ করিতে অভিলাষিণী হন, সেজন্য ঠাকুর পূর্ব হইতেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, 'ক'লকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতন কিলবিল ক'চ্চে, তুমি তাদের দেখবে। [গ] আমি কি ক'রেচি, তোমাকে এর চাইতে অনেক বেশী ক'ত্তে হবে।' [ন] তথাপি যখন ঠাকুর চলিয়া যাওয়ার পর মারও চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইতে লাগিল, তখন ঠাকুর দেখা দিয়া বলিলেন, 'না, তুমি থাক ; অনেক কাজ বাকি আছে।' মা বলিতেন, 'শেষে দেখলুম, তাই তো, অনেক কাজ বাকি !'

* * * *

---

২ গ্রন্থকার-সঙ্কলিত 'পত্রমালা'।

নিজের ভজনসাধন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা অনুরক্ত ভক্তদের কাছে ক্বচিৎ দুই-একটি কথা কহিয়াছেন ; এবং ঘটনাচক্রে তাঁহার ভাব বা সমাধির অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া অন্য ভক্তেরাও দুইএকটি কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্তই তাঁহার সাধন-জীবনের ইঙ্গিতমাত্র বলা যাইতে পারে। ঐসকল ইঙ্গিত হইতে সেই সাধনার বিস্তার ও গভীরতার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু সমগ্র ইতিহাস পাওয়া যায় না।

চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কামারপুকুরে যখন ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীশ্রীমার মিলন হইল, তখন হইতেই তাঁহার সাধনার আরম্ভ বলা যাইতে পারে। ঐ সময়ে ঠাকুরের শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে মা বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর যখন মেয়েদের উপদেশ দিতেন, শুনতে শুনতে আমি মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে প'ড়তুম। অন্য মেয়েরা ঠেলে তুলে দেবার চেষ্টা ক'র্ত্ত' ও ব'লত', 'এমন কথাগুলো শুনলে নি, ঘুমিয়ে প'ড়লে!' ঠাকুব ব'লতেন, 'নাগো, ওকে তুল নি। ও কি সাধে ঘুমিয়েচে? এসব শুনলে ও এখানে থাকবে নি, চোঁচা দৌড় মারবে।' একথা মেয়েরা পরে আমাকে ব'লেছিল।" [ন] ঠাকুব কি অর্থে যে 'ও এখানে থাকবে নি' ইত্যাদি উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন। মার মনেব স্বাভাবিক উর্দ্ধগতি ও তৎকালীন অন্তর্মুখী ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি ঐ মন্তব্য করিয়া থাকিবেন। হয়তো ঠাকুরের মুখে তৎকালে ঐসকল ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণ করিলে মার মন সমাধিতে এমনই লীন হইয়া যাইত যে উহাকে নিম্নভূমিতে ফিবাইয়া আনা দুষ্কর হইত।

অষ্টাদশ বৎসব বয়সেব সময় শ্রীশ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন, তখন হইতে ঠাকুরের উপদেশানুসারে চলিয়া তাঁহার সাধন-জীবন যে উত্তরোত্তর বিশেষ গভীরতা প্রাপ্ত হইল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎকালীন হৃদয়াবেগ দুইএকটি কথায় মা এইরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ

"সে সব কি দিনই গিয়েচে! জ্যোৎসনা রাত্রে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড়হাতে ব'লেচি, 'তোমার এ জ্যোৎসনার মতন আমার অন্তর নির্মল ক'রে দাও।'

"রাত্রে যখন চাঁদ উঠত', গঙ্গার ভিতর স্থিরজলে তার প্রতিবিম্ব দেখে

ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা ক'ত্তুম, 'চাঁদেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।' "[৩]

শ্রীশ্রীমা স্বামী পূর্ণানন্দ নামে কোন সন্ন্যাসীর কাছে শক্তি-মন্ত্র গ্রহণ করেন।[৪] পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরও তাঁহার জিহ্বায় একটি মন্ত্র লিখিয়া দেন। আমরা শুনিয়াছি, ঠাকুরের যেমন ইষ্ট ছিলেন কালী, তেমনি মার ইষ্ট ছিলেন জগদ্ধাত্রী।[৫] ঠাকুর যে সকল দেবদেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই সকল দেবদেবীর মন্ত্রও মাকে শিখাইয়া দেন এবং মা ঐসকল মন্ত্রেও সাধনা করেন।[৬] আধ্যাত্মিক রাজ্যের খুঁটিনাটি ব্যাপার ঠাকুর নানাভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন; মাকে তিনি কুলকুণ্ডলিনী, ষট্‌চক্র ইত্যাদি কাগজে আঁকিয়া দিয়াছিলেন।

মন্ত্রের জপপুরশ্চরণ শ্রীশ্রীমা কতদূর করিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দক্ষিণেশ্বরে তখন তখন লক্ষজপ সম্পূর্ণ না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। শেষ বয়সেও জপধ্যানে তাঁহার অদ্ভুত নিয়মনিষ্ঠা দেখা গিয়াছে। স্বামী মহেশ্বরানন্দ জয়রামবাটীতে অবস্থান-কালে অনেকদিন লক্ষ্য করিয়াছেন, অসুখের সময়েও ঠিক চারিটার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া অন্ধকার থাকিতেই তিনি মাঠে যাইয়া শৌচাদি সারিয়া আসিয়াছেন; এবং গায়ে লেপখানা জড়াইয়া বিছানাতেই পা মেলিয়া জপ করিতে বসিয়াছেন। মন্ত্রজপ করিবার জন্য মার একগাছি

---

৩ শ্রীশ্রীমায়ের কথা হইতে সঙ্কলিত।

৪ পুত্রের 'পূর্ণচন্দ্র' নাম রাখিতে ইচ্ছুক বিভূতিবাবুকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'আমি এই নাম ধ'রে ডাকতে পারব নি, আমার গুরুর নামে নাম।'

৫ ডাক্তার অক্ষয়কুমার মিত্র শ্রীশ্রীমার কাছে জগদ্ধাত্রী-মন্ত্র নেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছেন শুনিয়া স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছিলেন, 'আমার মনে হয়, মা জগদ্ধাত্রী-মন্ত্র দেবেন না—জগদ্ধাত্রী তাঁর ইষ্ট।' [বি]

৬ শ্রীশ্রীমা পরে এই মন্ত্রগুলিই অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন শিষ্যকে দান করিতেন। স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ একদিন জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি এত লোককে মন্ত্র দেন কেন? এতে কি তাদের সকলেরই কল্যাণ হবে?' মা উত্তর দেন, 'এগুলি ঠাকুরের দেওয়া মন্ত্র—সিদ্ধমন্ত্র; জপ ক'ল্লে নিশ্চয়ই কল্যাণ হবে।'

তুলসীর এবং একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা ছিল। সাধারণতঃ তিনি একবার ব্রাহ্মমুহূর্তে, একবার পূজার সময়, একবার অপরাহ্নে এবং একবার সন্ধ্যায় জপধ্যান করিতেন। নিত্যকর্মের মত ইহা তাঁহার এমনই অভ্যস্ত ছিল যে, সহজে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত না। একদিন দুর্বল শরীরে সন্ধ্যার সময় জপ করিতে বসিয়াছেন দেখিয়া কোন সেবক বলেন, 'মা তোমার করবার কি আছে ? তোমার তো সব হয়েই গেছে। আবার শুধ্ শুধ্ শরীরকে কষ্ট দিচ্চ কেন ?' তাহাতে মা উত্তর দেন, 'বাবা, আমার ছেলেরা কে কোথায় কি ক'চ্চে-না-ক'চ্চে, তাদের জন্যে দুটো ক'রে রাখচি।' [ন] অন্যদিন আর একজন তাঁহাকে বলিয়াছিল ঃ আপনি রাত্রে ঘুমান না। আমি যখনই রাত্রে ঘর থেকে বার হই, তখনই আপনি জিজ্ঞাসা করেন,—কে গো ? এতে বেশ বুঝি যে আপনার ঘুম হয় না। মা বলিলেন, 'ঘুমব' কখন ? ছেলেগুলি এসে প'ড়েচে, নিজেরা তো কিছু ক'ত্তে পারে না, তাদের কাজ ক'ত্তেই সময় যায়।'

শেষ বয়সের এই সাধননিষ্ঠা দেখিয়া, যৌবনে শ্রীশ্রীমার প্রাথমিক সাধনার আবেগ ও তীব্রতা কথঞ্চিৎ অনুমান করা যাইতে পারে। তখন কত বিনিদ্র রজনী যে তিনি ধ্যান-সমাধিতে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার বিবরণ কেহই জানে না। নহবত-ঘরের পশ্চিমধারের বারান্দায় দক্ষিণমুখী হইয়া বসিয়া মা ধ্যান করিতেন। এক সুগভীর রাত্রে, ঠাকুরের অন্বেষণে পঞ্চবটীতে যাইবার কালে, স্বামী যোগানন্দ মাকে সমাধি-মগ্না দর্শন করিয়াছিলেন ঃ

> বাহির দুয়ারে মাতা জগৎ-জননী।
> সমাধিতে বসিয়া আছেন একাকিনী॥
> প্রকাশ্য বদন, আবরণ নাহি তায়।
> ... ...
> লজ্জাপরিপূর্ণ দেহে মোটে নাহি মন।
> বিশ্বহিত ধিয়ানে যেমন নিমগন॥ [পুঁ]

কথিত আছে, প্রথম যখন শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন, তখন তিনি ভাব, সমাধি ইত্যাদি বড় একটা বুঝিতেন না ; এবং সেইজন্য ঠাকুরের

ভাব কিংবা সমাধি উপস্থিত হইতে দেখিলে ভয় পাইতেন। যাহা হউক, তাঁহারও যে ঐসকল অবস্থা পরপর উপস্থিত হইয়া পরিশেষে নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত হইয়াছিল, ইহার নিদর্শনসূচক ঘটনা বিরল হইলেও কিছু কিছু জানিতে পায়া যায়। শ্রীযুক্তা যোগীন-মা[৭] বলেন,—

"...নহবতে আসিয়া...দরজা একটু খুলিয়া দেখি, মা খুব হাসিতেছেন। এই হাসিতেছেন, আবার একটু পরেই কাঁদিতেছেন। দুই চক্ষু দিয়া ধারার বিরাম নাই। কতক্ষণ এইভাবে থাকিয়া ক্রমে স্থির হইয়া গেলেন—একেবারে সমাধিস্থা।

"একদিন রাত্রিতে কে বাঁশী বাজাইতেছিল; বাঁশীর স্বরে মার ভাব হইল—থাকিয়া থাকিয়া হাসিতে লাগিলেন।...

"বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে একদিন সন্ধ্যার পর মা, আমি ও গোলাপ-দিদি ছাতে পাশাপাশি বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম। আমার ধ্যান শেষ হইলে দেখি, মা তখনও একভাবে বসিয়া আছেন—স্পন্দহীনা সমাধিস্থা। অনেকক্ষণ পরে হুঁস আসিলে মা বলিতে লাগিলেন, 'ও যোগেন, আমার হাত কই—পা কই?' আমরা মার হাত ও পা টিপিয়া দেখাইতে লাগিলাম।...তবুও যে দেহটা রহিয়াছে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত মা উহা বুঝিতে পারেন নাই।"[৮]

সাক্ষাৎ ভগবান বাঁশী বাজাইতেছেন মনে করিয়া শ্রীশ্রীমা বংশীধ্বনি শুনিলেই সমাধিস্থা হইতেন; দক্ষিণেশ্বরে কেহ তখন রাত্রে বাঁশী বাজাইত। ইহা ভাবসমাধি বা সবিকল্প সমাধি। বেলুড়ের বাড়ীর ছাতে মার যে সমাধি হয় উহা নির্বিকল্প সমাধি, সমাধিভঙ্গে তাঁহার উক্তি হইতে বুঝা যায়। নির্বিকল্প সমাধি ভঙ্গের পর স্বামী বিবেকানন্দ অনুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন।

পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীমার ভাব, সমাধি ইত্যাদি অবস্থা অহরহ উপস্থিত হইলেও তিনি যে বাহিরে তাহা প্রকাশিত হইতে দিতেন না, ইহা স্বামী

---

[৭] ঠাকুরের শিষ্যা ও শ্রীশ্রীমার সেবিকা শ্রীমতী যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস।

[৮] শ্রীশ্রীমায়ের কথা।

প্রেমানন্দের উক্তি হইতে জানা যায়। ঈশ্বরকোটী মহাপুরুষ প্রেমানন্দ-মহারাজ মার অবস্থা যেমন বুঝিতেন, সাধারণে তাহা বুঝিবে কিরূপে? তিনি বলিয়াছেন, "তিনি [শ্রীশ্রীমা] শক্তিরূপিণী কি-না, তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাইরে বেরিয়ে পড়ত। মা-ঠাকরুণের ভাব, সমাধি হচ্চে, কিন্তু কাকেও জানতে দেন?" [৯] তথাপি, কোন কোন ভাগ্যবান ভক্তের প্রতি কৃপায় মার সমাধিমগ্না মূর্তিও কচিৎ বাহিরে প্রকাশ পাইত। স্বামী তপানন্দ বলেন, 'একদিন জয়রামবাটীতে মা পা মেলিয়া চোখ চাহিয়া বসিয়া আছেন—বাহিরের কোন হুঁসই নাই। আমি অনিমেষ নয়নে সেই ধ্যানমগ্না মাতৃমূর্তি দেখিতেছিলাম। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া মা প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে আসন ছাড়িয়া উঠিলেন।' শ্রীসিন্ধুনাথ পাণ্ডা লিখিতেছেন: জয়রামবাটীতে ৺বিজয়া দশমার দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মা আমাকে বলিলেন, 'ঠাকুরের শীতল দেবে এস—কাপড় ছেড়ে এস।' কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া দেখিলাম, মা ঠাকুরের শীতল দিবার ভোগ লইয়া মামার বাড়ীর দাওয়ায় পা দুইখানি ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার খুব কাছেই প্রাচীরের মধ্যে ঠাকুর-ঘর। মা বসিয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ঠাকুর-ঘর খুলে এসব শীতল দাও ও ঠাকুর শয়ন করাও।' আমি ঠাকুরদের শীতল ও শয়ন দিয়া আসিয়া দেখি মা সেই একই ভাবে বসিয়া আছেন। সেই পা-ঝুলানো অবস্থায় তাঁহাকে প্রণাম করিতে কেমন ইচ্ছা হইল ও খুব পায়ের কাছে আসিয়া প্রণাম করিলাম। মা তখনও স্থির, নিশ্চল প্রতিমা। তখন কি আর করি, দাওয়ার উপর তাঁহার কাছেই খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম।

ভাবরাজ্যের সকল স্তর উপলব্ধিপূর্বক অতিক্রম করাতে এবং ভাবাতীত রাজ্যেরও প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকাতেই শ্রীশ্রীমা ঠাকুরেরই মতগভীররূপে বিভিন্ন ধর্মের সকল ভাব অনায়াসে ধরিতে, বুঝিতে ও তত্তদ্‌ভাবে আপনাকে ভাবিত করিতে সক্ষম ছিলেন। একবার বৈদেশিক খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার ঐরূপ শক্তি দেখিয়া নিবেদিতা প্রমুখ পাশ্চাত্য ভক্তগণ বিস্মিত হন। [১০]

---

[৯] ওঁকারেশ্বরানন্দ-প্রণীত 'প্রেমানন্দ'।

[১০] সিষ্টার নিবেদিতা লিখিয়াছেন: "The Mother and her party

সাধনা ও তাহার পরিণতি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখোক্ত কতিপয় উক্তি এইরূপ :

"বহু তপস্যা ক'ল্লে এই মন শুদ্ধ হয়। 'সাধন বিনা সিদ্ধবস্তু কভু না মিলায়।' ভগবান লাভ হ'লে কি আর হয়, দুটো কি শিং বেরয়? না, মন শুদ্ধ হয়—শুদ্ধ মনে জ্ঞানচৈতন্য হয়।

"নরেন ব'লেছিল, 'মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্চে, সবই দেখচি উড়ে যায়।' আমি ব'ল্লুম, 'দেখো দেখো, আমাকে উড়িয়ে দিও না।' নরেন ব'ল্লে, 'মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরু-পাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরু-পাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?' জ্ঞান হ'লে ঈশ্বর টীশ্বর সব উড়ে যায়। মা—মা—শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে। সব এক হ'য়ে দাঁড়ায়—এই তো সোজা কথাটা।

"জপতপের দ্বারা কর্মপাশ কেটে যায়; কিন্তু ভগবানকে প্রেম ভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না।···জপতপের দ্বারা ইন্দ্রিয় টিন্দ্রিয়গুলো কেটে যায়। বৃন্দাবনে রাখালরা কি কৃষ্ণকে জপধ্যান ক'রে পেয়েছিল? না; তারা আয় রে, খা রে, না রে—এই ক'রে কৃষ্ণকে পেয়েছিল!" [ধ]

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ বলেন: "বাগবাজারে মার বাড়ীতে একদিন ঠাকুরঘরের রাস্তার দিকের বারান্দায় শ্রীশ্রীমার সঙ্গে সাধন সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, 'তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা না ক'ল্লে

expressed a desire to rest in the chapel, and hear something of the meaning of the Christian festival. This was followed by Easter music, and singing, with our small French organ And in the swiftness of her comprehension, and the depth of her sympathy with these resurrection hymns, unimpeded by any foreignness or unfamiliarity in them, we saw revealed for the first time, one of the most impressive aspects of the great religious culture of Sarada Devi. The same power is seen to a certain extent, in all the women about her, who were touched by the hand of Sri Ramakrishna. But in her, it has all the strength and certainty of some high and arduous form of scholarship."—THE MASTER AS I SAW HIM.

তত্ত্বজ্ঞান হয় না। সাধন ক'ত্তে হয়; চন্দনের কাঠটি ঘসলে গন্ধ বেরয়, না ঘসলে বেরয় না।'

"১৩২৪ সালে মার জন্মতিথির আগে জয়রামবাটীতে গিয়াছিলাম। জন্মতিথির পর মার খুব জ্বর হয়। তখন জ্বর সরিয়াছে কিন্তু দুর্বলতা কিছু কিছু আছে। মার ঘরের বারান্দায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা, কি করে ভগবান লাভ হয়?' আমার মনে অবশ্য এমন ভাব ছিল যে, তিনি হয়তো অনেক জপধ্যান করাব কথা বলিবেন। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, 'তাঁর কৃপাতে তাঁকে পাওয়া যায়।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর কিছুতেই নয়?' মা বলিলেন, 'না'। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর কিছুতেই নয়?' মা বলিলেন, 'না'। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর কিছুতেই নয়?' মা বলিলেন, 'না'। মাকে আমার এই শেষ প্রশ্ন কবা।"

দ্বাদশ অধ্যায়

ঠাকুরের সেবা

পূর্বাধ্যায়ে শ্রীশ্রীমার সাধনভজনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ঠাকুরের সাধনার সঙ্গে মাব সাধনার বাহ্য অভিব্যক্তিতে যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, ইহা অল্পায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। ঠাকুরের সাধনা উদ্দামস্রোতা জাহ্নবীর মত দুইকূল প্লাবিত করিয়া চলিয়াছিল; তাহার বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গ সমীপবর্তী লোকেরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কিন্তু মার সাধনা অন্তঃস্রোতা ফল্গুর মত নিঃশব্দে প্রবহমানা—লোকচক্ষুর অন্তরালে অনুষ্ঠিতা। ঠাকুরের মত মাকে প্রত্যেক ধর্মের সত্যতা সাধনা দ্বারা প্রমাণিত করিতে হয় নাই; পূর্ব হইতে প্রমাণিত বস্তুকে সহজ বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া তিনি সেই সেই ভাবকে সমধিক মহিমান্বিত করিয়াছেন মাত্র। ঠাকুরের সাধনা সমস্ত জগৎ ভুলিয়া এক ভগবানকে বিষয়ীভূত করিয়াছিল; কিন্তু মার সাধনা অন্য সমস্ত ভুলিলেও ঠাকুরের সেবা ভুলিতে পারে নাই, বরং উহাকেই প্রাথমিক অনুষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

ইহাতে তাঁহার সাধনা দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হয় নাই ; কারণ, ঠাকুরই ছিলেন তাঁহার সর্বসাধনার ফলরূপী। তিনি যেন ফলকে পুরোবর্তী রাখিয়াই সমুদয় সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সাধনার অন্তে আবার তাঁহাকেই ফলরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে কত ভক্তকে মা বলিয়াছেন, 'ঠাকুরই সব—তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট ; তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি।' ঠাকুরের পূজাবিধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু শ্রীশৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে বলিয়াছিলেন, 'তিনি সর্বদেবময়, তিনি সর্ববীজময় ঃ ভক্তিভাবে পুষ্পাঞ্জলি দিলেই তাঁর পূজা হ'য়ে যাবে।' শ্রীমতী কৈলাসকামিনী রায়কে বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরের ভিতর সব দেবদেবী আছেন—এমন কি, শীতলা, মনসা পর্যন্ত।' এক সময়ে বাগবাজারের ৺সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ী হইতে মার জন্য স্নানজল আসিত। স্বামী বাসুদেবানন্দ ঠাকুরপূজা করিয়া সিদ্ধেশ্বরীর ও ঠাকুরের স্নানজল দুইটি ভিন্ন পাত্রে লইয়া মাকে দিতে গেলেন। মা বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন, বলিলেন, 'দুটো কিসের ?' বাসুদেবানন্দজী কহিলেন, 'সিদ্ধেশ্বরীর আর আমাদের ঠাকুরের।' মা বলিলেন 'ও একই।' বাসুদেবানন্দজী তখন দিবার উদ্যোগ করিতেই বলিলেন, 'মিশিয়ে দাও।' 'কাল থেকে দেব।' 'না আমার সামনেই তুমি মিশাও।' দুইটি স্নানজল মিশাইয়া এক করিয়া দিলে তবে মা গ্রহণ করিলেন। কথামৃতলেখক 'শ্রীম'র কাছে শুনিয়াছি, ঠাকুর স্থূলদেহে অপ্রকট হইলে, 'আমার মা-কালী কোথা গেলে গো ?' বলিয়া মা কাঁদিয়াছিলেন !

* * * *

শ্রীশ্রীমার সেবিকা মূর্তি মনে হইলে, মা-লক্ষ্মীর চিত্র অন্তরে জাগে—কখনও নারায়ণ-পদমূলে উপবিষ্টা, কখনও বা রন্ধনশালায় রন্ধন-কার্যে ব্যাপৃতা। ঠাকুরের বিশ্রামকালে তিনি পদসেবা করিতেছেন ; স্নানের পূর্বে তেল মাখাইয়া দিতেছেন ; আবার, ঠাকুরের দেহের অবস্থা বুঝিয়া যখন যেটি রুচিকর ও পুষ্টিকর হইবে বলিয়া বুঝিতেছেন, তখন সেইটিই প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। সেবা করিয়া ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করিতে তাঁহার মত কেহই সক্ষম ছিলেন না ; তাঁহার মত ঠাকুরের অবস্থাভিজ্ঞও অন্য কেহ ছিলেন না। একবার মা তিনদিন ঠাকুরকে রাঁধিয়া দেন নাই।

প্রচলিত সংস্কার এই যে, স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসে ঐ তিনদিন নিজহাতে ঠাকুরদেবতা বা গুরুজনকে কিছু প্রস্তুত করিয়া দেওয়া চলে না। সেই সময়টা অন্যের হাতে খাইয়া ঠাকুরের শরীর অসুস্থ হইল। তজ্জন্য তিনি মাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন; এবং শরীরের রক্ত, মাংস হাড় ইত্যাদি কোন জিনিষই অশুদ্ধ নয়—মনে বিকার না থাকিলে ঐ অবস্থায় সকল কার্যই করিতে পারা যায়, ইত্যাদি কথা বলিয়া তাঁহাব পূর্ব ধারণা দূর করিয়া দিলেন। তদবধি মা ঐ অবস্থায় ঠাকুরকে রন্ধন করিয়া দিতে আব ইতস্ততঃ করিতেন না। ঠাকুবও তাঁহাব বান্না খাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, 'ছ্যাখ তো, তোমার রান্না খেয়ে আমার শরীর কেমন ভাল আছে!' ঠাকুরেব ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের বিবাহোপলক্ষ্যে দেশে যাইয়া মাকে কিছু অধিক দিন তথায় থাকিতে হয়; তাঁহার অনুপস্থিতিতে ঠাকুরের খাওয়াদাওয়াব এতই কষ্ট হইয়াছিল যে, তিনি পত্র লিখিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে আনাইয়াছিলেন। ইতঃপূর্বে আর একবার অনুরূপ ব্যাপার ঘটে এবং ঠাকুব লোকমুখে উপর্যুপরি সেই কথা জানাইয়া তাঁহাকে দেশ হইতে আনয়ন করান।

ঐশ্বরিক ভাবে সদা নিমগ্ন, বালকের অবস্থাপন্ন ঠাকুবকে শ্রীশ্রীমা শিশুর মত ভুলাইয়া আহার করাইতেন ও সর্বদাই রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া চলিতেন। তিনি বলিয়াছেন: ঠাকুরেব ভাত বাড়বার সময় (দুইহাত দিয়া দেখাইয়া) ভাতকে টিপে টিপে কম দেখাবে ব'লে সরুটি ক'রে দিতুম। তিনি বেশী ভাত দেখলে ভয় পেতেন। গয়লার দুধ আধসের ক'রে দিবার কথা; দিবার সময় অন্য জায়গায় বিক্রি ক'বে যে দুধটা বাঁচত', সবটা দিয়ে যেত'। আমি সেটাকে ফুটিয়ে ঘন ক'রে রাখতুম।' [বি] নিকুঞ্জদেবীকে বলিয়াছিলেন: ওখানে তখন একজন ব্রহ্মচারী থাকত', মনে বড় ভয় হ'ত' যদি ওঁর কোন মন্দ করে; তাই দশ টাকা দিতে গেলুম যাতে খুসী থাকে। তা ঠিক টের পেয়েচেন, অমনি নবতে এসে ব'ল্লেন, 'আমার মা আছে, কে মন্দ ক'রবে?'

কখন কখন মালা গাঁথিয়া ঠাকুরকে পরাইতে শ্রীশ্রীমার সাধ হইত। মাল্যরচনায় তিনি অত্যন্ত কুশলা ছিলেন, মাঝে মাঝে সুন্দর গোড়ে মালা

করিয়া মন্দিরে পাঠাইয়া দিতেন। নহবতে একদা সমস্ত দিন ধরিয়া মনের মতন মালা গাঁথিয়া ঠাকুরকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহাকে মালা পরিতে হইবে। মালা পরিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন, 'ভূষণ বাকি কি আছে রে, জগচ্চন্দ্র হার প'রেচি!' [নি]

* * * *

নহবতের মত স্বল্পপরিসর ঘরে—যে ঘরের দরজা দিয়া ঢুকিতে প্রথম প্রথম কতবার শ্রীশ্রীমার মাথা ঠুকিয়া গিয়াছে, এবং যে ঘরে একাকী থাকিতেও কত লোক কষ্ট বোধ করিবে, সেই ঘরের মধ্যেই সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু ও রন্ধনের ব্যবস্থা, আর তাহারই মধ্যে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর থাকিয়া তিনি ঠাকুরের সেবায় ও সাধনায় সমাহিতা। দক্ষিণেশ্বরে দীর্ঘকাল ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিয়াও অনেক লোক তাঁহার অস্তিত্ব পর্যন্ত জানিতে পারে নাই! আবার ঐ ঘরে সকল সময়েই যে তিনি একা থাকিতেন, তাহা নহে; কখনও ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী,[১] কখনও বা—ভক্তসমাগম বাড়িয়া যাওয়ার পর—দুইতিনটি ভক্ত স্ত্রীলোক। তাঁহার নহবতে বাস সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছিলেন: ঐ ছোট নহবত-ঘরে কি করে যে তিনি মাসের পর মাস থাকতেন! রাত তিনটায় শৌচাদি সেরে, গঙ্গাস্নান করে[২] তিনি ঐ ঘরে ঢুকতেন, আর

[১] লক্ষ্মীদেবী শীতলার অংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রজগোপীর ভাবে ভাবিতা ছিলেন; মাকে মাঝে মাঝে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী গাহিয়া শুনাইতেন।

[২] শ্রীশ্রীমা নহবতখানার সম্মুখস্থ বকুলতলার ঘাটে স্নান করিতেন। একদিন সিঁড়ি বাহিয়া গঙ্গায় নামিবার সময় তিনি এক প্রকাণ্ড কুমীরের গায়ে প্রায় পা দিয়াছিলেন। বিভূতিবাবুকে মা বলিয়াছেন: তখন রাত্রি প্রায় তিনটে। অন্ধকার রাত্রি, বকুলতলার ঘাটে নামচি। একটা কালোপারা কি দেখলুম, মনে হ'ল' যেন জেলেদের হাঁড়ি। কাছে যেতেই হুস্ ক'রে জলে নেমে গেল। আঁসটে আঁসটে গন্ধ। নবতে ফিরে এলুম, অনেকক্ষণ ধ'রে বুক দুড়দুড় ক'ত্তে লাগল। শ্রীআশুতোষ মিত্রকে বলিয়াছিলেন,—স্নান করিতে যাইবার কালে এক অন্ধকার-রাত্রিতে অকস্মাৎ তাঁহার আতঙ্ক উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নহবত হইতে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত একটি আলোক দেখিতে পান; তদবধি স্নানের সময়ে ঐ আলোক নিত্য আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইত।

সন্ধ্যার পর বের হয়ে আবার শৌচাদি করতেন! দীর্ঘকাল এরকম চলবার পর যোগীন-মা গেলেন। এতে মার অসুখ হবে বুঝে অনুযোগ করায় নহবতের নিকটে শৌচাদির স্থান করে দেওয়া হয়েছিল। ঐ ছোট ঘরে ভক্তদের আর ঠাকুরের জন্যে রান্না হত। ঠাকুরের অন্য খাবার সইত না, তাই মাছ জিয়ানো থাকত। শিকের উপর শিকে, তার উপর শিকে! ঐ ঘরের মধ্যেই দুইতিন জন, আবশ্যক হলে ততোধিক লোকের শোয়ার ব্যবস্থা! ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একবার পঞ্চাশ-ষাট জনের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সকল খাবারই ঐ নহবতে তৈরি হয়েছিল; মেয়ে-ভক্তেরাও ঐখানেই খেয়েছিলেন। রাত্রে যোগীন-মা ঠাকুরের কাছে গেলে ঠাকুর বলচেন, 'এত রাত্রে তোরা যাবি কোথা, শোবার জায়গাই বা কোথা হবে? আমার ঘরের পাশে ঘেরা বারান্দায় শুয়ে থাক।' যোগীন-মা মার নিকট ঠাকুরের প্রস্তাব বলতে গিয়ে দেখেন, নহবত-ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—শোবার জায়গা হয়েচে।[৩] প্রয়োজন হইলে মা কিরূপ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত সমস্ত কাজ করিতে সক্ষম ছিলেন, সারদানন্দ-মহারাজের উক্তিতে তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়।

পল্লীগ্রামের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবনের তুলনায় নহবত-ঘরে বাস যে মুক্ত বিহঙ্গের পক্ষে পিঞ্জরবাসের তুল্য তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঠাকুর সত্যসত্যই নহবত-ঘরের নাম দিয়াছিলেন 'খাঁচা', এবং খাঁচায় বাসকারী শ্রীশ্রীমা ও শ্রীমতী লক্ষ্মীকে একসঙ্গে শুকসারী নামে নির্দেশ করিতেন।

শ্রীশ্রীমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঠাকুর একান্ত উদাসীন ছিলেন না; তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে পাড়ায় বেড়াইবার উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং যাহাতে অত্যন্ত লজ্জাশীলা মাকে লোকে না দেখিতে পায়, সেইভাবে কিছুদিন নিকটবর্তী পাঁড়ে-গিন্নীদের বাসায় বেড়াইতে যাওয়ার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরে আহারের পর সকলে বিশ্রাম করিতে যাইলে যখন পঞ্চবটী নির্জন হইত, তখন মা ঠাকুরের উপস্থিতিতে কালীবাড়ীর খিড়কি-ফটক দিয়া ঐ বাসায় যাইতেন; সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকিয়া ও কথা কহিয়া, আরতির সময়

---

৩ শ্রীশ্রীসারদানন্দ-প্রসঙ্গ।

যখন পঞ্চবটী পুনরায় নির্জন হইত, তখন ফিরিয়া আসিতেন। তথাপি ক্ষুদ্রঘরে আবদ্ধভাবে দীর্ঘকাল থাকার ফলে তাঁহার পায়ে বাতরোগের সূত্রপাত হয় এবং ঐ অসুখে তিনি বাকী সমস্ত জীবন কষ্ট পাইয়াছিলেন।

প্রথমদিকে যখন ভক্তসমাগম তেমন বৃদ্ধি পায় নাই এবং শ্রীশ্রীমাকে কখন কখন একাকী থাকিতে হইত, তখন মেছুনীরা গঙ্গায় স্নান করিতে আসিয়া, নহবতের বারান্দায় চুবড়ি রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে সংসারের সুখ দুঃখের কথা কহিত ও তাঁহার সঙ্গীর অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর করিত। কখন কখন সাধিকা ভৈরবীরা আসিয়া কালীবাড়ীতে অবস্থান করিতেন; তাঁহাদের আনীত ভিক্ষার দ্রব্য মা রন্ধন করিয়া দিতেন, তাঁহাদিগকে সেবা যত্ন করিতেন।

ক্রমে ঠাকুরের ভক্তসংখ্যা যখন বাড়িয়া উঠিল এবং তাঁহার সঙ্গ ও সাধনশিক্ষা ব্যপদেশে দুইচারি জন করিয়া ভক্তেরা দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীশ্রীমার কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। সমস্ত দিন তিনি একটুও বিশ্রামের সময় পাইতেন না। পানই কত সাজিতে হইত। তাহার মধ্যেও যদি এতটুকু সময় ফাঁক পড়িত, হয়তো ঠাকুর গুচ্ছিব পাট আনিয়া শিকা পাকাইয়া দিতে বলিতেন—ভক্তদের জন্য লুচি-মিষ্টির হাঁড়ি ঝুলাইয়া রাখিবেন! রাত্রে আবার কেবল ভক্তদের জন্যই তিন সের সাড়েতিন সের আটার রুটি হইত। যাহা হউক, ঠাকুর পরে ঐ কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সেবক জুটাইয়া দিয়াছিলেন। শুনা যায়, একদিন পঞ্চবটীতে লাটু-মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন: ঠাকুর ঐদিকে যাইতে যাইতে তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'কার ধ্যান ক'চ্ছিস রে লেটো? যার ধ্যান ক'চ্ছিস তার গাড়ুতে যে জল নাই রে লেটো!' ঐকথা শুনিয়াই লাটু-মহারাজ আসন ছাড়িয়া উঠিলে ঠাকুর কহিলেন, 'ঐ নবতে সাক্ষাৎ ভগবতী আছেন, তাঁর রুটি বেলে দেগে যা।'

ঐরূপে দিবারাত্র নিশ্বাস ফেলিবার অবসর না থাকিলেও শ্রীশ্রীমার একদিনের জন্যও নিরানন্দ-ভাব লক্ষিত হয় নাই। যিনি মূর্তিমতী পবিত্রতা, তিনি তো স্বয়ং আনন্দের উৎসরূপা। আবার ঠাকুরের দিব্যসঙ্গে ঐ উৎস-

মুখ সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিত।[৪] ভক্ত-সমাগমে তখন ঠাকুরের নৃত্য, গীত, ভাব, সমাধি লাগিয়াই থাকিত ; আর নহবতের বারান্দায় যে দরমার বেড়া দেওয়া ছিল, মা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উহার ছিদ্রপথে সেই প্রেমচিত্র দর্শনে উল্লসিত হইতেন। তখন ঐ ভক্তদেরই মত একজন হইয়া ঠাকুরের কাছে থাকিবার বাসনা তাঁহার মনে জাগিত। সদানন্দময় ঠাকুর, যিনি রঙ্গরসের তুফান তুলিয়া তাঁহার বালক-ভক্তদিগকে হাসাইতে হাসাইতে পেটে খিল ধরাইয়া দিতেন, তাঁহার যে মার সঙ্গেও অনুরূপ প্রেমলীলার অভিনয় চলিত, তাহা আর বলিতে হইবে না। ঐরূপ অভিনয়ের নমুনা-স্বরূপ দুইএক দিনের ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট-আত্মীয় ভ্রষ্টচরিত্র হওয়ায় সংসারে বিষম অশান্তি উপস্থিত হয়। কিছুতেই অনর্থ দূর করিতে না পারিয়া স্ত্রীলোকটি প্রতিকারের বাসনায় ঠাকুরের কাছে আসিলেন। সাধুভক্ত লোক, নিশ্চয়ই কোন মন্ত্র বা দৈব ঔষধ জানা আছে, এইরূপ সরল বিশ্বাসে তাহাকে আসিতে দেখিয়া ঠাকুরের দয়া হইল। কিন্তু স্বয়ং কিছু ব্যবস্থা না করিয়া তাহাকে নহবত-ঘর দেখাইয়া বলিলেন,

দেখিতে পাইবে তথা নারী একজনা।
মনোমত মন্ত্রৌষধি আছে তাঁর জানা॥
পূরিবে বাসনা গিয়া জানাও তাঁহারে।
আমি কিবা জানি, তিনি আমার উপরে॥

[৪] ঠাকুরের অনুধ্যানে শ্রীশ্রীমা এই সময়ে কিরূপ তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। স্বামী ত্রিগুণাতীত দক্ষিণেশ্বরে যাইলে ঠাকুর প্রায়ই তাঁহাকে শেয়ারের গাড়ী-ভাড়া দিতেন। একদিন ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, 'নবত থেকে চারটি পয়সা চেয়ে নাও গে।' এই সময় মা দুইএক জন ব্যতীত ভক্তদের কাহারও সাক্ষাতে বাহির হইতেন না। ত্রিগুণাতীত-মহারাজ নহবতের নিকটে যাইয়া দেখেন, পূর্ব হইতেই চারিটি পয়সা বাহিরে রক্ষিত আছে ; অথচ এই পয়সা দেওয়ার কথা ঠাকুর কাহারও দ্বারা বলিয়া পাঠান নাই! বহুদিন পরে এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু সেবককে মা বলিয়াছিলেন, 'হ্যাঁ বাবা, কথা সত্যি। আমি নবতে হাজার কাজ নিয়ে থাকলেও আমার মন সর্বদা ঠাকুরের কাছে প'ড়ে থাকত'। অত দূর থেকে খুব আস্তে আস্তে ব'ল্লেও আমি সব কথা শুনতে পেতুম। ঠাকুরের মুখে ঐ কথা শুনেই আমি চারটি

শ্রীশ্রীমা পূজা করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় স্ত্রীলোকটি যাইয়া প্রণামপূর্বক তাঁহাকে সকল কথা নিবেদন করিল। তখন—

রঙ্গ বুঝি শ্রীপ্রভুর বলিলা জননী।
তিনি ঔষধজ্ঞ, আমি কিছু নাহি জানি॥

স্ত্রীলোকটি আবার ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইয়া মার কথা জ্ঞাপন করিল। কিন্তু ঠাকুর ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি হাসিতে হাসিতে—

বিধিমতে বুঝাইয়া রমণীরে কন।
বাসনা পূরিবে তথা, হেথা অকারণ॥

ঠাকুরের প্ররোচনায় স্ত্রীলোকটি মার কাছে পুনরাগমন করিলে এইবারে তাঁহার দয়া হইল। তখন—

বিল্বপত্র দিয়া মাতা বলিলেন তারে।
বাসনা পূরিবে, এই লয়ে যাও ঘরে॥ [পুঁ]

ইতঃপূর্বে ঠাকুর প্রতিবৎসর যখন কামারপুকুরে যাইতেন, তখন এইরূপ রঙ্গরসের ব্যাপার নিত্যই ঘটিত। শ্রীশ্রীমাকেও সেখানে নহবতের মত ক্ষুদ্র ঘরে, লোকজনের মধ্যে সসঙ্কোচে থাকিতে হইত না। কামারপুকুরে ঠাকুর একদিন রন্ধনের ব্যবস্থা দিতেছেন: ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'লক্ষ্মী, চার পয়সার পাঁচফোড়ন কিনে নিয়ে আয় তো!' তারপরে মাকে বলিলেন, 'পাঁচমিশেলি ডাল কোরো, এমন সম্বুর' যেন শূয়োর গোঙায়! [বি]

আরও দুইএক দিনের ঘটনা শ্রীশ্রীমা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন: "কামারপুকুরে লক্ষ্মীর মা আর আমি রাঁধতুম। একদিন খেতে ব'সেচেন ঠাকুর আর হৃদয়। লক্ষ্মীর মা ভাল রান্তে পাত্ত'। সে যেটা বেঁধেচে, খেয়ে ব'ল্লেন, 'ও হৃদু, এটা যে রেঁধেচে, সে রামদাস বদ্যি।' আমি যেটা রেঁধেচি খেয়ে ব'ল্লেন 'আর এই ছিনাথ সেন।' শ্রীনাথ সেন—হাতুড়ে।

পয়সা রেখে দিয়েছিলুম। আর একদিন ঠাকুর নরেনকে খেতে ব'লেচেন। আমি নবত থেকে শুনেই, নরেন যা খেতে ভালবাসে—ছোলার ডাল চড়িয়ে দিয়ে ময়দা মাখচি। এমন সময় ঠাকুর এসে দেখেন, তিনি যা ব'লতে এসেচেন, আমি আগে থেকেই তাই ক'চ্চি।' [আ]

শুনে হৃদয় ব'লচে, 'তা বটে। তবে তোমার হাতুড়ে বদ্যি তুমি সব সময় পাবে—গা টিপতে, পা টিপতে পর্যন্ত—ডাকলেই হ'ল'। রামদাস বদ্যি, তার ষোল টাকা ভিজিট, তাকে তো আর সব সময় পাবে না! আর, লোকে আগে হাতুড়েকে ডাকে; সে তোমার সব সময় বান্ধব।' ঠাকুর ব'ল্লেন, 'তা বটে, তা বটে; এ সব সময় আছে।' [গ]

"রান্না-ঘরে কুকুর সেঁধুচ্চে। উনি ব'ল্লেন হৃদয়কে, 'আমরা কি এখানে থাকচি? যেমন তেমন ক'রে [রান্না-ঘরের ছিদ্র] সেরে দাও।' আমি শুনে ব'ল্লুম, 'আচ্ছা তো স্বার্থপর!' তিনি কোথা যাচ্ছিলেন—শিওড়, আর যাওয়া হ'ল' না। দাঁড়িয়ে ব'লতে লাগলেন, 'স্বার্থ ছাড়া আর কি কিছু আছে?' এই বলে স্বার্থ সম্বন্ধেই নানা কথা ব'লতে লাগলেন—সে কি উচ্ছ্বাস!" [বি]

দক্ষিণেশ্বরে একদিন সন্ধ্যার পর মা ঠাকুরের ঘরে খাবার রাখিতে গিয়াছেন; ঠাকুর তখন খাটের উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মী খাবার রাখিয়া গেল মনে করিয়া বলিলেন, 'দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাস।' মা বলিলেন, 'হ্যাঁ, বন্ধ ক'ল্লুম।' মার গলা বুঝিতে পারিয়া ঠাকুর সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, 'আহা তুমি। আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী। কিছু মনে কোরো নি।' 'দিয়ে যেও' না বলিয়া 'দিয়ে যাস' বলিয়া ফেলার জন্য ঠাকুরের এতই অনুশোচনা হইয়াছিল যে, সারারাত্রি তাঁহার আর ঘুম হইল না; সকালবেলা নহবতে মার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'দ্যাখ গো, সারারাত আমার ঘুম হয় নি—ভেবে ভেবে, কেন এমন রুক্ষ কথা ব'লে ফেল্লুম!'[৫]

আর একদিন শ্রীশ্রীমা অনেকগুলি ফলমিষ্টি লোককে বিলাইয়া

[৫] বিভূতিবাবুকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: একদিন দুক্কুরবেলা খাওয়ার পর আমি [ঠাকুরের ঘরে] যেমন যাই তেমনি গেছি: দেখি দরজাটি বন্ধ করা। আমি আস্তে আস্তে কপাটটি ঠেলে দিয়ে দেখি, তিনি ঘুমচ্চেন। আমি কপাটটি দিয়ে চলে আসব, তিনি চোখ না চেয়েই ব'ল্লেন, 'কপাটটা দিয়ে দে।' আমি ব'ল্লুম 'দিচ্চি'। তিনি আমার স্বর শুনেই ব'লচেন, 'তোমাকে 'তুই' ব'লে ফেলেচি, তোমাকে 'তুই' ব'লে ফেলেচি, আমি মনে ক'রেছিলুম লক্ষ্মী।' যেন কত অপরাধ ক'রেচেন!

দিয়াছেন। তাহাতে ঠাকুর ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, 'অত খরচ ক'ল্লে কি ক'রে চ'লবে?' ঐ কথায় মা একটু অভিমানের ভাব দেখাইয়া সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতেই ঠাকুর অতি ব্যস্ততার সহিত ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওরে, তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর্। ও রাগলে আমার সব নষ্ট হ'য়ে যাবে!' [সু] মিষ্টান্নাদি খাদ্যবস্তু লোককে বিলাইয়া দেওয়ার স্বভাব মার যে একটু প্রবল ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তজ্জন্য ঘরে কখনও জিনিষের অভাব হইত না। একদিনের ঘটনা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন,—দক্ষিণেশ্বরে খুব সরেস সন্দেশ এসেচে। আমি সবাইকে দিয়ে দিয়েচি। গোপালের মা আমার পাশে ব'সে, ব'লচেন, 'বৌমা, আমার গোপালেব [ঠাকুরের] জন্যে কিছু রাখলে না? আমি তো লজ্জায় মরি। ঠিক সেই সময় ঘোড়ার গাড়ী ক'রে নবগোপালবাবুর স্ত্রী এক চেঙ্গারি সেই সন্দেশ নিয়ে এল'! [বি]

দেহসম্বন্ধমাত্র না রাখিয়া, অতি পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়ের যে অভিনব আদর্শ এবার ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার জীবনে প্রদর্শিত হইয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পাছে একটি দিনেব একটি কথায় বা ব্যবহারে ঐ আদর্শ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ বা মলিন হয় তজ্জন্য ঠাকুরের কি আকুলতা, কত সাবধানতাই না উপরিধৃত ঘটনা দুইটিতে প্রকাশ পাইতেছে!

* * * *

শ্রীশ্রীমার হাতের সেবা ঠাকুরের নিকট অতি প্রিয় হইলেও তিনি কোনকালে তাহা একচেটিয়া নিজস্ব করিয়া রাখিবার প্রয়াস পান নাই; বরং ভক্তদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য করুণার্দ্রহৃদয়ে তাঁহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং প্রসন্নমনে তাহাদের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য ঠাকুরকে মিনতিও করিয়াছেন। নিম্নোক্ত ঘটনা-প্রসঙ্গে তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই ইহা জানিতে পারা যাইবে।

প্রবোধবাবু বলেন: 'কামারপুকুরে জমি-কেনার কাজে যাইয়া, কাজ সারিয়া প্রায় সাড়ে এগারটার সময় ঠাকুরবাড়ীতে আসিতেই শিবু-দাদার স্ত্রী কহিলেন, 'ঠাকুরপো, আজকে তোমাকে রঘুবীরের পূজা ও ভোগ-

নিবেদন ক'ত্তে হবে।' শিবু-দাদা সেদিন গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন। রান্নাঘরে দৃষ্টি পড়াতে দেখিলাম, একটি কালো অপরিচিতা মেয়ে রন্ধনের কাজে নিযুক্তা। বৌদিদির সঙ্গে কথায় কথায় যাহা জানিতে পারিলাম তাহাতে বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মেয়েটি চরিত্রহীনা। ইহাতে মন কেমন হইয়া গেল। এ ভোগ কি রঘুবীর গ্রহণ করিবেন ?—ইত্যাকার নানা সন্দেহ ও বিতর্কের মধ্যে বৈঠকখানা হইতে হঠাৎ উঠিয়া গিয়া বৌদিদিকে বলিলাম, 'আমার এখনই জয়রামবাটী যাওয়াব বিশেষ প্রয়োজন হল, আর থাকতে পারচি না।' তাঁহার কোন ওজর আপত্তি না শুনিয়া একেবারে জয়রাম-বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখন অন্য সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে, মা খাইতে বসিবেন। রামময় জানাইল যে একজনের ভাত অতিরিক্ত রাখাই আছে, মা একজনের চাল বেশী নিতে বলিয়াছিলেন!

"রাত্রে যখন সকলে একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছি, একজন প্রশ্ন করায় বাধ্য হইয়া কামারপুকুর-সংক্রান্ত ঘটনাটি বিবৃত করিলাম ; এবং রঘুবীরের প্রসাদ ত্যাগ করিয়া আসা আমার অন্যায় হইয়াছে কি-না মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। মা অতি প্রসন্নমুখে বলিলেন, "বে—শ ক'রেচ ভালই ক'রেচ ; তুমি বিচা—র ক'রে কাজ ক'রেচ, বিচা—র ক'রেই তো চলতে হয়।[৬] ঠাকুরকে ভোগ দিলেই কি হ'ল' ? যে-সে ভোগ কি তিনি নেন ? এক সময়ে রামলালের মা ছেলেপুলেদের জন্যে ততটা শুচি পবিত্র হ'য়ে রঘুবীরের ভোগ রান্না ক'রে দিতে পাত্ত' না। তাতে রঘুবীর দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে স্বপ্ন দেন, 'আজ দুদিন ধ'রে আমার খাওয়াই হ'চ্চে না!'[৭] একবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের খাওয়া নিয়ে কি বিপদেই প'ড়েছিলুম শুন। রাত্রে ঠাকুরের খাওয়ার সময় সব ভক্তদের সরিয়ে দেওয়া হ'ত' ; আমি তাঁর খাবার নিয়ে যেতুম ও খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ব'সে থাকতুম।

---

[৬] শ্রীশ্রীমা ড্যাশ-চিহ্নিত স্থানগুলি টান দিয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

[৭] ৺রঘুবীরের সেবার আনুকূল্য করিবার জন্য ঠাকুর পরে রামলালের মাসীমা অঘোরমনির কামারপুকুরে থাকাব ব্যবস্থা করেন। রামলালের মা শাকম্ভরী দেবী ঠাকুরের তিরোভাবের স্বল্পকাল পরেই—সম্ভবতঃ ১২৯৫ সালে ৺পুরী গমনের পথে বৈতরণীতীরে দেহত্যাগ করেন।

একদিন ঠাকুরের ঘরে খাবার জায়গা হ'য়েচে, আর আমি নবত থেকে থালা হাতে নিয়ে ঠাকুরের ঘরের সিঁড়ি থেকে বারান্দায় পা দিয়েচি, এমন সময় একটি মেয়ে-ভক্ত শশব্যস্ত হ'য়ে, 'দিন মা, আমাকে দিন'—এই ব'লে, আমার হাত থেকে থালা নিয়ে ঠাকুরকে ধ'রে দিয়ে স'রে গেল! আমি কাছে ব'সলুম। ঠাকুর আসনে ব'সেই ব'ল্লেন, 'তুমি একি ক'ল্লে? আমার খাবার নিজে না দিয়ে ওর হাতে দিলে কেন? আমি খাই কি ক'রে! তুমি কি ও মেয়েটিকে জান না? ও অমুকের ভাজ—দেওরকে নিয়ে থাকে।' আমি ব'ল্লুম, 'তা আমি জানি, আজকে খাও।' ঠাকুর ব'ল্লেন, 'আমি খেতে যে পাচ্চি না!' তাঁকে একটু মিনতি ক'রে বলাতে ব'ল্লেন, 'আমার খাবার আর কোন দিন কারো হাতে দেবে না, বল?' তাতে আমি জোড়হাত ক'রে ব'ল্লুম, 'তা যে আমি পারব নি ঠাকুর! চাইলেই যে আমাকে দিতে হবে! তবে তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসবার চেষ্টা ক'রব।' আমার কথায় খুসী হ'য়ে তখন ঠাকুর খেতে ব'সলেন।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সহজ বুদ্ধিমত্তা

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পানিহাটিতে বৈষ্ণবগণের বিশেষ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১২৯২ সালে ঠাকুর তাঁহার ইংরাজী-শিক্ষিত ভক্তগণকে ঐ দিনের "আনন্দের মেলা—হরিনামের হাট-বাজার" দেখাইয়া আনিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ মিলিয়া অনেকগুলি ভক্ত যাইবেন স্থির হওয়ায় চারিখানি পানসি ভাড়া করা হইল।

বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া সকলেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শ্রীশ্রীমা ঐ ঙ্গে যাইবেন কি-না স্থির করিবার জন্য জনৈক স্ত্রী-ভক্তের দ্বারা ঠাকুরের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুর কহিলেন, 'তোমরা তো যাচ্চ, যদি ওর ইচ্ছা হয় তো চলুক।' 'ওর

ইচ্ছা হয় তো চলুক'—এই কথা শুনিয়াই মা বুঝিলেন যে, ঠাকুর মন খুলিয়া অনুমতি দিতেছেন না। যদি মন খুলিয়া অনুমতি দিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতেন, 'হ্যাঁ, যাবে বই কি।' তিনি যাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া স্ত্রী-ভক্তদিগকে কহিলেন, 'অনেক লোক সঙ্গে যাচ্চে, সেখানেও ভিড় ঃ অত ভিড়ে উৎসব দেখা আমার হবে না—আমি যাব না।' মার অনুমতি লইয়া স্ত্রী-ভক্তগণ ঠাকুরের নৌকায় যাইয়া উঠিলেন।

উৎসবান্তে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন; এবং রাত্রে আহার করিতে বসিয়া ঐ উৎসবের কথা-প্রসঙ্গে কোন স্ত্রী-ভক্তকে বলিলেন, "অত ভিড়—তাহার উপর ভাব সমাধির জন্য আমাকে সকলে লক্ষ্য করিতেছিল—ও (শ্রীশ্রীমা) সঙ্গে না যাইয়া ভালই করিয়াছে; ওকে সঙ্গে দেখিলে লোকে বলিত, 'হংস, হংসী এসেছে!' ও খুব বুদ্ধিমতী।" [লী]

শ্রীশ্রীমার ঐরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ঠাকুর পূর্বেও কোন কোন ঘটনায় পাইয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি অনেক বিষয়ে মার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য করিতে অগ্রসর হইতেন। একবার মাড়োয়ারী-ভক্ত লছমীনারায়ণ ঠাকুরের সেবায় দশহাজার টাকা দেওয়ার সঙ্কল্প করে এবং ঐ পরিমাণ টাকার নোট সঙ্গে লইয়াও আসে। ঠাকুর তাহাতে আপনাকে বড়ই বিপন্ন বোধ করেন এবং দৃঢ়তার সহিত মাড়োয়ারী-প্রদত্ত অর্থ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন লছমীনারায়ণ মার নামে টাকাটা লিখিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করে। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—"সেই সময়ে ওর মন বুঝিবার জন্য ডাকাইয়া বলিলাম, 'ওগো, এই টাকা দিতে চাহিতেছে, আমি লইতে পারিব না বলায় তোমার নামে দিতে চাহিতেছে, তুমি উহা লও না কেন—কি বল?' শুনিয়াই ও বলিল, 'তা কেমন করিয়া হইবে?…আমি লইলে ঐ টাকা তোমারই লওয়া হইবে। কারণ, আমি উহা রাখিলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে উহা ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব না।…টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না।' ওর ঐ কথা শুনিয়া আমি হাঁপ ফেলিয়া বাঁচি!" [লী]

পরবর্তী জীবনে এবম্বিধ বহু ঘটনায় শ্রীশ্রীমার অসাধারণ বিবেচনা-শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার ইংরাজী-শিক্ষিত ভক্ত-সন্তানেরা

মুগ্ধ হইয়াছেন। কয়েকটি ঘটনা এই সঙ্গে উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না।

প্রবোধবাবু কয়েকদিন যাবৎ জয়রামবাটীতে মার কাছে বাস করিতেছিলেন, সন্ধ্যার পূর্বে হঠাৎ এক পত্র পাইয়া মহালয়া-রাত্রির অন্ধকারে আড়াইক্রোশ দূরবর্তী স্থানে রওনা হইবার উদ্যোগ করিলেন। কারণ, পরদিন সকালে কার্যবিশেষে যোগ দিতে না পারিলে শত্রুদের দ্বারা ভীষণ অনিষ্ট সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্ধ্যার পর তাঁহার সঙ্গে মার এইরূপ কথাবার্তা হয়ঃ—'প্রবোধ, এরাত্রে তোমার যাওয়া হবে না; তুমি ভোররাত্রে উঠে যেও।' 'সে কি মা, আমাকে যে যেতেই হবে।' 'যে লোকটি চিঠি নিয়ে এসেছিল, সে তোমার জানাশুনো কি?' 'না মা, সম্পূর্ণ অপরিচিত।' 'যখন শত্রুতা চলচে, তখন এই অন্ধকার রাত্রে শত্রুরা তোমার মন্দ করবার জন্যে পথে লোক রেখে দিতে পারে। তারা কিছু না ক'ল্লেও, বর্ষাকালে খালবিলের রাস্তায় সাপখোপ আছে—তা থেকে বিপদ হ'তে পারে। পূজোর মাথায় বিদেশ থেকে লোক চাকরি ক'রে ঘরে ফিরচে এই মনে ক'রে খালধারে কোন দুষ্টলোকও তোমার মন্দ ক'ত্তে পারে। তাই ব'লচি, তোমার এরাত্রে যাওয়া হবে না। অম্বিকে [জয়রামবাটীর চৌকিদার] ভোররাত্রে তোমাকে সঙ্গে ক'রে শ্যামবাজার পৌঁছে দিয়ে আসবে। আর সোজা রাস্তায় যাবে না; জিব্‌টে হ'য়ে ঘুরে বড় রাস্তা দিয়ে যাবে।'

সারদানন্দ-মহারাজ কোন সাধুর সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে আম পাঠাইয়াছেন; মা তখন কোয়ালপাড়া আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। সেদিন বিকাল-বেলা বদনগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রবোধবাবু মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। মা তাঁহাকে বলিলেন, 'ছাখ বাবা, কাল ক'লকাতা থেকে রওনা হ'য়ে আজ এখানে আম নিয়ে পেঁ।ছে গেল। 'কোম্পানী' রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ এই সব ক'রে কত সুবিদেই না ক'বেচে।' মার কথায় উৎসাহিত হইয়া প্রবোধবাবু বিজ্ঞানের নানা উন্নতি এবং ইংরাজ সরকারের দ্বারা আমাদের দেশের কত সুখসুবিধা বাড়িয়াছে তাহা একে একে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। মাও মাঝে মাঝে সায় দিয়া কথাগুলি শুনিয়া যাইতে

লাগিলেন। প্রবোধবাবুর সব কথা বলা যখন শেষ হইল, তখন মা মন্তব্য করিলেন, 'সব সুবিদে হ'য়েচে বটে বাবা, কিন্তু আমাদের দেশে অন্নবস্ত্রের অভাবটা বড় হ'য়েচে—কি বল? আগে অন্নবস্ত্রের অভাবটি এত ছিল না।'

মহাযুদ্ধ-বিরতির সংবাদ আসিয়াছে। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের জন্য প্রেসিডেন্ট উইলসন্-কৃত সন্ধি-সর্তের চৌদ্দ দফা শ্রীশ্রীমাকে শুনাইতে গেলেন। সন্ধি-সর্তের দুইএক দফা শুনিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন, 'ওরা যা বলে ওসব মুখস্থ।' যতীনবাবু 'মুখস্থ' শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া চিন্তা করিতেছেন, মা পুনরায় বলিলেন, 'যদি অন্তঃস্থ হ'ত', তা হ'লে কথা ছিল না।'

শেষোক্ত ঘটনায় শ্রীশ্রীমার শব্দপ্রয়োগ-নৈপুণ্যও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। একএক সময়ে মা এমন সুষ্ঠু শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করিতেন যে, উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও তাহা বিস্ময় উৎপাদন করিত। আবার, সুষ্ঠু শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগ ব্যতীত উহার উচ্চারণেও তাঁহার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইত। যাহারা অধিকদিন তাঁহার সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ লেখককে বলিয়াছেন,—কোন বিষয়ে জোর দিয়া কথা বলিবার সময় মা এমনভাবে শব্দবিন্যাস করিতেন এবং শব্দবিশেষে বা অক্ষরবিশেষে এমন জিগির বা টান দিয়া উচ্চারণ করিতেন যে, চিরকালের জন্য তাহা শ্রোতার মনে মুদ্রিত হইয়া যাইত। তাঁহার সাধারণ কথাবার্তায়—এবং চালচলনেও—এমনই একটা স্বভাবসিদ্ধ মার্জিতরুচি ফুটিয়া উঠিত যে, এদেশের সুশিক্ষিত ভক্তমণ্ডলীর তো কথাই নাই, সুসভ্য পাশ্চাত্য ভক্তেরাও তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।[১]

---

[১] সিষ্টার নিবেদিতা লিখিয়াছেন: 'In her, one sees realised that wisdom and sweetness to which the simplest of women may attain. And yet, to myself the stateliness of her courtesy and her great open mind are almost as wonderful as her sainthood. I have never known her hesitate, in giving utterance to large and generous judgment, however new or complex might be the question put before her...Does one carry to her some perplexity or mortification born of social developments beyond her ken? With unerring intuition she goes straight to the heart of the matter, and sets the questioner in the true attitude to the difficulty.'—THE MASTER AS I SAW HIM.

চতুর্দশ অধ্যায়

ঠাকুরের সেবা

(শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে)

সম্ভবতঃ ১২৯২ সালের বৈশাখের প্রারম্ভে ঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত হয়। পানিহাটির মহোৎসবে যোগদান করিয়া উহা বাড়িয়া গেল এবং ঔষধপথ্যের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সত্ত্বেও ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। ভাদ্র মাসের একদিন তাঁহার কণ্ঠতালুদেশ হইতে রুধির নির্গত হইলে ভক্তগণ চিন্তান্বিত হইলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া সম্ভবতঃ আশ্বিন মাসে[১] তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিলেন এবং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের ৫৫ নম্বর ভাড়াটে বাড়ীতে রাখিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে চিকিৎসায় কোনও ফল হইবে না বুঝিয়া প্রবীণ ভক্তগণ শ্রীশ্রীমাকে তথায় লইয়া আসিবার পরামর্শ করিলেন। কিন্তু বাড়ীতে অন্দরমহল না থাকায়, অত্যন্ত লজ্জাশীলা মা এখানে অপরিচিত পুরুষসকলের মধ্যে কিরূপে বাস করিবেন তাহা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। সঙ্কোচ ও লজ্জারূপ পটে চিরকাল আবৃত থাকিলেও দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিতে মা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঠাকুরের জন্য সুপথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাব হইয়াছে শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়াই দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্যামপুকুরে চলিয়া আসিলেন; এবং ঠাকুরকে রোগমুক্ত করিবার আশায় বুক বাঁধিয়া কায়মনোবাক্যে নিজেকে তাঁহার সেবায় নিয়োজিত করিলেন।

এখানে একমহল বাড়ীতে সকলের স্নানাদির জন্য একটি মাত্র স্থান নির্দিষ্ট থাকায় শ্রীশ্রীমা রাত্রি তিনটার পূর্বে শয্যাত্যাগ করিতেন এবং কখন

---

[১] এই বিষয়ে কথামৃতে ও লীলাপ্রসঙ্গে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

যে ঐসকল কার্য শেষ করিয়া, ত্রিতলে ছাদের সিঁড়ির পার্শ্বস্থ চাতালে উঠিয়া যাইতেন, তাহা কেহই জানিতে পারিত না। সমস্ত দিন সেই সঙ্কীর্ণ চাতালে থাকিয়া তিনি ঠাকুরের নিমিত্ত পথ্যাদি প্রস্তুত করিতেন; এবং প্রস্তুত হওয়ার পর লোকজন সরাইয়া দেওয়া হইলে, নিজেই তাঁহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। রাত্রি এগারটার পর সকলে নিদ্রিত হইলে তিনি দ্বিতলে নামিয়া তাঁহার নিমিত্ত নির্দিষ্ট ঘরে বড় জোর তিনঘণ্টা কাল শুইয়া থাকিতেন। ঐরূপে দিনের পর দিন ঠাকুরের সর্বপ্রধান সেবাকার্য সম্পন্ন করিলেও, যাহারা সেখানে নিত্য আসা-যাওয়া করিত, তাহাদের অনেকেও উহা কিছুমাত্র জানিতে পারিত না। স্বল্পপরিমিত অথচ লোক-সমাগমপূর্ণ স্থানে নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত গোপন করিয়া মানুষ যে দিনের পর দিন নীরবে এমন কর্মময় জীবন কাটাইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এমনটি আর কখনও দেখা গিয়াছে কি-না, জানি না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি-কার বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছেন ঃ

> বিন্দু-নিবাসিনী মাতা শুনা ছিল কানে।
> কৃপায় তাঁহার এবে দেখিনু নয়নে॥

চিকিৎসায় প্রথমতঃ কিছু উপকার বোধ হইলেও, পরে অবস্থার আর কোনই উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন; এবং ডাক্তারের পরামর্শানুসারে কলিকাতার বাহিরে, কাশীপুরে গোপালচন্দ্র ঘোষের বাগান-বাড়ী ভাড়া করিয়া ঠাকুরকে তথায় লইয়া আসিলেন। সেদিন ২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার। শ্রীশ্রীমা ও গোলাপ-মা যিনি শ্যামপুকুরে ঠাকুরের সেবকগণের নিমিত্ত রন্ধনাদি কার্য করিতেন, সেই সঙ্গে আসিলেন। ত্যাগী যুবক-ভক্তগণ, যাঁহাদের অনেকেই বাড়ী হইতে আসিয়া পালাক্রমে ঠাকুরের সেবা করিতেছিলেন, এখন একপ্রকার ঘরবাড়ী ছাড়িয়াই আসিলেন; এবং সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুর সেবায় ও সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করিলেন।

ফলফুল-সমন্বিত, সরসীদ্বয়-শোভিত উদ্যানবাটীর সৌন্দর্য ও নির্জনতায় ঠাকুর আনন্দিত হইলেন। বিস্তীর্ণ স্থানের মুক্ত বায়ুতে ও সুচিকিৎসায় তাঁহার গলরোগেরও কিছু উপশম হইল। কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করায়,

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী বিকালে তিনটার সময় ঠাকুর সেবক-সঙ্গে ধীরে ধীরে নীচে নামিলেন, এবং নীচেকার হলঘরটি দেখিয়া উদ্যানের পথে বেড়াইতে অগ্রসর হইলেন। সেইদিন ছুটি থাকায় বহু গৃহী ভক্ত উদ্যানে সমবেত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের সকলের প্রতি করুণায় হঠাৎ তাঁহাতে কল্পতরু-ভাবের প্রকাশ হইল, এবং 'চৈতন্য হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া, প্রায় সকলেরই বক্ষ স্পর্শ করিয়া তাঁহাদের সুপ্ত অধ্যাত্মশক্তিকে জাগাইয়া দিলেন। ইহাতে বহু লোকের জন্মজন্মান্তবের পাপতাপ গ্রহণ করায় আবার রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। অশেষ যত্নে চিকিৎসা করিলেও কোন উপকার না পাইয়া চিকিৎসকগণ হতাশ হইলেন। গলার ক্ষত ক্রমে ভিতর হইতে বাহিরের দিকেও ফুটিয়া বাহির হইল। তাঁহাকে রোগমুক্ত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া, শ্রীশ্রীমা একেবারে তারকেশ্বরে যাইয়া বাবা ৺তারকনাথের দরজায় হত্যা দিলেন।[২]

ঠাকুরের রোগমুক্তি সঙ্কল্প করিয়া শ্রীশ্রীমা পড়িয়া রহিলেন। একে একে দুইদিন অতিবাহিত হইল। নিরম্বু উপবাসে দেহ ক্ষীণ ও কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। আবিষ্টের মত পড়িয়া আছেন এমন অবস্থায় একটা শব্দ শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। অনেকগুলি একত্রসজ্জিত মৃৎপাত্রের উপর আঘাত করিয়া কেহ একটা পাত্র ভাঙ্গিয়া দিলে যেমন শব্দ উত্থিত হয়, শ্রুত শব্দটি উহার অনুরূপ। হঠাৎ তাঁহার মন ঊর্দ্ধগামী হইল—জাগতিক সম্পর্কের সীমারেখা অতিক্রম করিল—স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধ, স্বামীর অসুখ, স্বামীকে রোগমুক্ত করিতে স্ত্রীর ঐকান্তিক কামনা—সমস্তই যেন কোথায় বিলীন হইতে চলিল। তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন বলা যায় না, কিন্তু সঙ্কল্পাতীত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় তিনি বিরাট মনে ঈশ্বরেচ্ছা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন কি? সম্ভবতঃ ঐরূপই করিয়া থাকিবেন। এ সম্বন্ধে মা কাহারও কাছে সুস্পষ্ট উক্তি না করিয়া থাকিলেও, তাঁহার পরবর্তী আচরণ হইতে ইহাই অনুমিত হয়। পরক্ষণেই তাঁহার মন নিম্ন-

---

[২] নিকুঞ্জদেবী বলেন যে, লক্ষ্মী দেবী ও একজন ঝি মার সঙ্গে তারকেশ্বর গিয়াছিলেন। পুরুষ কে গিয়াছিল, তিনি বলিতে পারেন না।

ভূমিতে অবরোহণ করিল ও তিনি হত্যাদানে নিবৃত্ত হইলেন। তখন গভীর রাত্রি—অন্ধকার। মা দুর্বল শরীরে কোনরূপে মন্দিরের পশ্চাতে যাইয়া কুণ্ড হইতে স্নানজল লইয়া মুখে ও চোখে দিলেন এবং পরদিনই ঠাকুরের সেবার জন্য কাশীপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াই ঠাকুর মৃদুহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি গো, কিছু হ'ল'? এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেই হাতের অঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া উত্তর দিলেন, 'কিছুই না!'

কাশীপুরের বাগানে একদিন শ্রীশ্রীমা আড়াইসের দুধ সমেত একটি বড় বাটি হাতে লইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যান। তখন শ্রীনরেন্দ্রনাথ ও শ্রীবাবুরাম (স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ) ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরেন। মা'র পায়ের গোড়ালির হাড়ে আঘাত লাগায় পা ফুলিয়া গিয়াছিল এবং তিনদিন তিনি ঠাকুরের আহারের জন্য মণ্ড প্রস্তুত করিতে ও তাঁহাকে খাওয়াইতে আসিতে সমর্থ হন নাই।[৩]

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ রাত্রি একটার সময় ঠাকুর গভীর সমাধিমগ্ন হন এবং পরদিন ১লা ভাদ্র দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সেই সমাধি মহাসমাধিতে পরিণত হয়। এই দিনের ও তৎপর দিনের কথায় শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "যেদিন এমনি হবে, খিচুড়ি রান্না হ'য়েছিল, খিচুড়ি ধ'রে

---

৩ ঠাকুরের অসুখের সময়ের কয়েকটি কথা শ্রীশ্রীমা নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন: "তিনি নিজের ছিষ্টি যেন নিজেই খেয়েছিলেন। তখন অসুখ—মুখ দিয়ে লাল কাটচে; সে লাল আর বন্ধ হয় না। তখন গেঁড়িগুগলি সিদ্ধ ক'রে তার ঝোল তাঁকে খাওয়ান হ'ল',—তাঁর লাল পড়া বন্ধ হ'য়ে গেল।

"গলার অসুখের সময় আমাকে ব'লচেন, উহু, কি ক'চ্চ? পলতে দিচ্চ? আচ্ছা দাও।' পলতে দিয়ে পরিষ্কার ক'ল্লুম, তিনি আর কিছু ব'ল্লেন না। [বি]

"আর একদিন ব'ল্লেন, 'ইচ্ছা হ'চ্চে তোমার সঙ্গে, আর কেউ থাকবে না—কেবল লাটু, রণজিৎ রায়ের দীঘিতে গিয়ে মায়ের ভোগ দিই।" [নি]

গেল—নীচেবটা পুড়ে গেল! ছেলেবা আমাব উপব উপর সেই খিচুড়িই খেলে। আমার একখানা দেশী কুঞ্জদাব শাড়ী ছাতে শুকচ্ছিল, কে চুবি ক'রে নিলে! পবদিন আমি হাতেব বালা খুলতে যাচ্ছি, তিনি খপ্ ক'বে আমার হাত দুটো ধ'বে ব'ল্লেন, 'আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এঘর থেকে ওঘব!' [বি][৪]

[৪] শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবনে পুনবায় হাতেব বালা খুলিতে গিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে মাব তৎকালীন সঙ্গিনী নিকুঞ্জদেবী বলেন: বৃন্দাবনে মাকে ঠাকুব দেখা দিয়া বলিলেন, 'তুমি হাতেব বালা খুলো না। (গৌরী-মাকে অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইয়া) গৌবদাসীব কাছে বৈষ্ণব-তন্ত্র জেনে নিও। কৃষ্ণ পতি যাব, তাব বিধবা হওয়া নাই—সে চিব সধবা।' গৌবী-মাব সঙ্গে দেখা হইলে মা তাহাকে ঠাকুবেব কথা জানাইলেন এবং তিনি বৈষ্ণব-শাস্ত্র হইতে শ্লোকেব পব শ্লোক মুখস্থ বলিয়া যাইতে লাগিলেন। গৌরী মা এই সময়ে বৃন্দাবনের কোনও স্থানে তপস্যানিবত ছিলেন এবং ঠাকুবেব আদেশে মাকে বৈষ্ণব শাস্ত্র শুনাইতে আসেন।

বৃন্দাবন হইতে দেশে ফিবিবার পব তৃতীয়বাব অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, কামাবপুকুবে যখন ছিলুম—বৃন্দাবন থেকে আসাব পব—তখন সব লোকেব ভয়ে—এ ও বলচে ও তা ব'লচে,—হাতেব বালা খুলে ফেল্লুম; আব ভাবতুম গঙ্গাহীন স্থানে কি ক'রে থাকব। গঙ্গাস্নানে যাব মনে ক'ল্লুম আমাব ববাবব একটা গঙ্গা-বাই ছিল। একদিন দেখি কি, সামনেব রাস্তা দিয়ে ঠাকুর আসচেন—আগে আগে, পেছনে নবেন বাবুবাম, রাখাল—এইসব যত ভক্তেরা। কত লোক! দেখি কি, ঠাকুরের পা থেকে জলেব ফোয়াবা ঢেউ খেলে আগে আগে আসচে—এই জলেব স্রোত। আমি ভাবলুম, দেখচি ইনিই তো সব—এঁব পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা। আমি তাড়াতাড়ি রঘুবীরেব ঘরেব পাশেব জবাগাছ থেকে মুটো মুটো ফুল ছিঁড়ে গঙ্গায় দিতে লাগলুম!' [ধ] এইরূপে ঠাকুরের দর্শন পাইয়া মার অন্তর হইতে সমাজের ভয় বিদূরিত হইল। তদবধি তিনি বরাবব দুই হাতে দুইগাছি বালা রাখিতেন ও সরু-লাল-পেড়ে কাপড় পরিতেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বৃন্দাবনে সম্বৎসর

মহাসমাধির পরদিন অপ্রত্যাশিতভাবে ঠাকুরের দর্শন পাইয়া শ্রীশ্রীমা গভীর শোকেও যে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ঠাকুর স্থূলদেহে অপ্রকট হওয়ায় তিনি যে কি করিয়া আর শরীরের উপর মন রাখিতে সক্ষম হইবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। অথচ ঠাকুরের কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া যাইবেনই বা কিরূপে! ঠাকুর জীবোদ্ধার-কার্যের সূত্রপাত মাত্র করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে যে তদপেক্ষা অনেক বেশী কাজ করিতে হইবে, একথা তো ঠাকুরই নিজমুখে বলিয়া গিয়াছেন। আর তাঁহার জীবন দ্বারা যে আদর্শ সংস্থাপিত হইবার কথা, তাহার অনেকটাই তো বাকি!

ঠাকুরের অদর্শনে শ্রীশ্রীমা যেমন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণও তেমনি জীবনের কর্ণধার শ্রীগুরুদেবকে হারাইয়া বিষাদ-মগ্ন হইয়াছিলেন। সান্ত্বনা-লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের অনেকেই এখন পুণ্যস্থানসমূহে গমন করিতে এবং শ্রীগুরুর নির্দেশানুযায়ী তপস্যা করিয়া শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে যত্নপর হইলেন। কাশীপুর হইতে শ্রীশ্রীমা ৬ই ভাদ্র বাগবাজারে শ্রীবলরাম বসুর বাড়ীতে আসিলেন এবং তথা হইতে ১৫ই ভাদ্র স্বামী যোগানন্দ, অভেদানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, লক্ষ্মীদেবী, গোলাপ মা ও নিকুঞ্জদেবীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।[১] রাস্তায় প্রথমতঃ দেওঘরে নামিয়া দর্শনাদি করিয়াই পরবর্তী গাড়ীতে সকলে ৺কাশীধামে যাইলেন এবং কাশীতে তিনদিন থাকিয়া তথাকার দর্শনাদি সম্পূর্ণ করিলেন। ৺বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করিয়া মার ভাব হয় এবং ভাবের ঘোরে সজোরে 'তুম্ তুম্' শব্দে পদক্ষেপ করিয়া তিনি

---

[১] নিকুঞ্জদেবী বৃন্দাবনে একমাস থাকিয়া প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন ও স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ৫।৬ মাস পরে স্বামী অদ্ভুতানন্দও প্রত্যাবর্তন করেন।

বাসায় প্রত্যাবর্তন করেন। বাসায় আসিয়াই তিনি শুইয়া পড়িয়াছিলেন এবং খানিকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুর আমাকে হাত ধ'রে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন!' [নি]

কাশী হইতে সকলে মিলিয়া অযোধ্যা গমন করেন এবং সেখানে একদিন মাত্র থাকিয়া শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হন। বৃন্দাবনেব পথে মা অভাবনীয়রূপে পুনরায় ঠাকুরের দর্শন পাইলেন। ঠাকুরের হাতে যে সুবর্ণ-নির্মিত ইষ্টকবচ ছিল, তাহা অসুখের সময় তিনি মাকে দিয়াছিলেন। মা উহা সযত্নে নিজবাহুতে ধারণ ও যথাবিধি পূজা করিতেন। রেলগাড়ীতে তিনি ঐ কবচশুদ্ধ হাত জানালার পাশে উপরের দিকে রাখিয়া শয়ন করিবামাত্র ঠাকুর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, 'ওগো, হাতে সোনার ইষ্টকবচ এমন ক'রে রেখেচ কেন? ও যে চোরে অনায়াসে খুলে নিতে পারে!' মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া কবচখানি হাত হইতে খুলিয়া লইলেন; এবং রাস্তা চলিবার সময় যে টিনের বাক্সে তাঁহার নিত্যপূজিত ঠাকুরের ফটোখানি থাকিত তন্মধ্যে রাখিয়া দিলেন। সেই অবধি তিনি ঐ কবচ আর কখনও হস্তে ধারণ করেন নাই।[২]

সম্ভবতঃ এই তৃতীয়বার দর্শনে তখনকার মত সান্ত্বনা লাভ করিলেও বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীমার শোক-সমুদ্র একেবারে উথলিয়া উঠিল। ঠাকুরের তিরোভাবের অল্পদিন পূর্বে যোগীন-মা বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবামাত্র মা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অজস্র ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া যায়, কিন্তু সেই ক্রন্দনের ধারা থামিয়াও থামিতে চায় না!

কত যুগ অতীত হইয়া গেল, শ্রীমতী রাধারাণী জীবনের জীবন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অবিরল ধারায় অশ্রুমোচন করিয়া এই ব্রজভূমির প্রত্যেক ধূলিকণা অভিষিঞ্চিত করিয়াছিলেন। সেই অশ্রুর প্রতিবিন্দু অহেতুক

---

২ ঘটনাটি ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীমার কাছে শুনিয়াছিলেন। ১৩১২ সালের প্রথমভাগে, মা ঐ ইষ্টকবচ মঠের ঠাকুর-ঘরে রাখিয়া নিত্যপূজা করিবার জন্য স্বামী প্রেমানন্দের হাতে দিয়া উহার পূজাবিধি শিখাইয়া দেন।

প্রেমের পুণ্যজ্যোতিতে আজও সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। আর তাহার কতকাল পরে, শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শন-কাতরা শ্রীমতী সারদা-জননী নিজের বিরহাশ্রু-মোচনের উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া সুদূর কলিকাতা হইতে এখানেই ছুটিয়া আসিয়াছেন! কোনও সময়ে ঠাকুরের মুখে শুনিয়া নিম্নোক্ত যে গানটি শ্রীশ্রীমা শিখিয়াছিলেন, সেই গানটিই বা আজ তাঁহার মনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কে বলিবে।

যদি কিশোরি, তোমার কালাচাঁদের—
গোকুলচাঁদের উদয় ঘুচল হৃদে।
দুঃখ কে নাশিবে আর, কৃষ্ণ বই আঁধার,
কৃষ্ণপক্ষে এখন থাকবি রাধে॥
যাই আমাদের যথা আছেন মধুসূদন,
শুনব না তোর বারণ, মানব না তোর রোদন,
প্যারি গো আমরা থাকব না তোর সদন,
কৃষ্ণত্যাগীর বদন দেখতে নিষেধ আছে পুরাণে বেদে॥*

যাহা হউক, শ্রীমতী রাধারাণীর বহুবর্ষিত প্রেমাশ্রুধারা পূর্বেই বিরহের বৃন্দাবনকে মিলনের বৃন্দাবনে—নিত্যবাস-স্থলীতে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল। সেইজন্য শ্রীশ্রীমাকে এখানে আসিয়া অধিক দিন কাঁদিতে হইল না। ঘনঘন দর্শন দিয়া ঠাকুর তাঁহাকে আনন্দে ভরপূর করিয়া দিলেন। তাঁহার বাহিরের চালচলন, কথাবার্তা একটি ছোট বালিকার মত হইয়া গেল; এবং তিনি নিত্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুর-দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমার এই অভিনব বালিকা-মূর্তি পরেও কেহ কেহ নয়নগোচর করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীশচন্দ্র ঘটক বলেন: ১৩২৫ সালের চৈত্রমাসে দোল-পূর্ণিমার পরদিন আমি মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি, বেলা প্রায় দশটা হইবে। মা তখন কোয়ালপাড়া-মঠে ঠাকুর-ঘরের পাশের ঘরটিতে ছিলেন। দুইটি অল্পবয়স্ক বালক ও একটি যুবক ঠিক সেই সময়ে মাকে

* শ্রীশ্রীমার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী রাধারাণী হইতে প্রাপ্ত। মার সঙ্গে বহুবার গাহিয়া রাধুর গানটি কণ্ঠস্থ হইয়াছিল।

প্রণাম করিতে আসিয়াছে। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবামাত্র মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। বালক দুইটি প্রণাম করিয়া, মা মাথায় হাত দিবার পূর্বেই তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িয়াছে! আমি তাহা দেখিয়া ছেলে দুইটির মাথা হাত দিয়া আগাইয়া ধরিলাম এবং মা তাহাদেরও মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। মাকে দিবার জন্য তাহারা আবীর সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। 'আমরা আবীর দেব'—তাহাদের মুখে এই কথা শুনিতেই মার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। 'আবীর দেবে?'—এইটুকু মাত্র বলিয়া তিনি চটুলা বালিকার ন্যায় হইয়া পড়িলেন; এবং ছেলেরা তাঁহার পাদপদ্মে আবীর দিতে-না-দিতে তাহাদেরই আবীর লইয়া চপল ভঙ্গী সহকারে তাহাদেব গায়ে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রণাম কবিয়া উঠিয়াই আমি মাকে আমার নিজের কথা বলিয়া যাইতে-ছিলাম। আমার মাতৃভাব—আমার দিকে চাহিয়া যখন উত্তর দিতেছেন, তখন প্রশান্ত মাতৃমূর্তি; আবার সঙ্গে সঙ্গেই চঞ্চলা হইয়া ছেলেদের গায়ে আবীর ছুড়িতেছেন। মার অমন বালিকা-মূর্তি আমি আর কোনও দিন দেখি নাই—মনে মুদ্রিত হইয়া আছে, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।

শ্রীশ্রীমা কীর্তনগান শুনিতে ভালবাসিতেন। বৃন্দাবনে স্বামী অদ্ভুতানন্দ ও লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে নিয়া তিনি মাঝে মাঝে ভগবানজীর আশ্রমে নাম-কীর্তন শুনিতে যাইতেন। কখনও বা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া সকলের অলক্ষ্যে যমুনায় চলিয়াযাইতেন; পরে সঙ্গিনীরা তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইয়া তথা হইতে ফিরাইয়া আনিতেন। কোন বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে একজনকে মা বলিয়াছিলেন, 'আমিই রাধা।' [ন]

বাগবাজারের শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত একবার স্বগৃহে 'মাথুর'-কীর্তনের বন্দোবস্ত করেন এবং গান শুনিবার জন্য স্ত্রী-ভক্তগণ সহ শ্রীশ্রীমাকে আমন্ত্রণ কবিয়া লইয়া যান। পদাবলী-গায়ক শ্রীযতীন্দ্রলাল মিত্র[৪] পেশাদার কীর্তনীয়া ছিলেন না, অথচ অল্পসময়ের মধ্যেই গান খুব জমিয়া যায়। সেইবাত্রেই ট্রেণে অন্যত্র যাইতে হইবে বলিয়া যতীনবাবু শ্রীমতীর বিরহের

---

৪ গ্রন্থপ্রণয়ন-কালে ইনি পাটনা হাইকোর্টের উকীল

অবস্থায় গান শেষ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় গোলাপ-মা চিকের ভিতর হইতে বলিলেন, 'একখানা মিলনের গান গেয়ে শেষ কর।' কোনরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন করাইয়া দিয়া কীর্তন সমাপ্ত হইল এবং শ্রোতারা একে একে আসর ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। গানের সূচনাতেই মা কেমন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, গান শেষ হইলেও সেই একই ভাবে বসিয়া রহিলেন। কিছুতেই ভাবভঙ্গ হয় না দেখিয়া গোলাপ-মা তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন, কাহাকেও কিছু বুঝিতে না দিয়া কোনরূপে জলযোগের মত যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করাইলেন এবং গাড়ীতে উঠাইয়া বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। এখানে আসিয়াও মার ভাবের উপশম হইল না—তিনি ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাধারণতঃ তিনি কোথাও যাইবার সময় একবার ঠাকুরকে প্রণাম করিতেন এবং ফিরিয়া আসিয়াই পুনর্বায় তদ্রূপ করিতেন। আজ ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়া এবং অনেকক্ষণ যাবৎ চিত্রার্পিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া জনৈক সেবক মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ঐ ডাক ভিতরে প্রবেশ করিতেই মা যেন চমকিয়া উঠিলেন এবং ভাবাবেগ সংযত করিয়া ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। এইদিনের কথায় গোলাপ-মা বলিয়াছিলেন, 'সেই বৃন্দাবনে মার ভাব দেখেছিলুম, আর এই আজ দেখলুম।' [আ][৫]

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের গান শ্রীশ্রীমা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। রেকর্ড-গান যখন এদেশে নূতন হইয়াছে, কিরণবাবুর বাড়ী হইতে কয়েকখানি কীর্তনের রেকর্ড লইয়া আসা হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটি গান মা আগ্রহ সহকারে পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়াছিলেন। [আ] জয়রামবাটীর নিকটবর্তী মির্জাপুর গ্রামের রামচন্দ্র সূত্রধর কৃষ্ণযাত্রার দল করিয়াছিল। একবার জগদ্ধাত্রী-

---

[৫] শ্রীবৃন্দাবনের ভাবটি মার অত্যন্ত প্রিয় ও অন্তরঙ্গ ভাব ছিল। স্বামী তপানন্দ রাধা-ভাবের নিম্নোক্ত গানটি গাহিয়া শুনাইলে মা উহা সাগ্রহে লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন :

হৃদি-বৃন্দাবনে, আমারি কারণে, সর্বনাশা বাঁশী বেজেছে এবার।
(তাঁরে) জানি না তবু যে, ভুলি লোকলাজে পাগলিনী ধাই অভিসারে তাঁর।

পূজার সময় মা তাহার গান দিয়াছিলেন ও মেয়েদের সঙ্গে বসিয়া শুনিয়াছিলেন। [ই]

শ্রীশ্রীমা নিধুবনের সন্নিকটে অবস্থিত ৺রাধারমণের মন্দিরে যাইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেন। একদিন ভাব-চক্ষে দেখিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী শ্রীমতী নিস্তারিণী রাধারমণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বীজন করিতেছেন। রাধারমণের কাছে মা নিজের দোষদৃষ্টি—অন্যের দোষ চক্ষে ঠেকা সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। দেখা গিয়াছে, কাহারও মন্দ চরিত্রের কথা তাঁহার কাছে উত্থাপন করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন।

বৃন্দাবনে অবস্থান-কালে ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দেখা দিয়া স্বামী যোগানন্দকে ইষ্টমন্ত্র দান করিতে আদেশ করেন। তখন পর্যন্ত মা দুইতিন জন ব্যতীত ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানগণের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করিতেন না। ক্রমাগত তিনদিন ঠাকুরের আদেশ পাইয়া শেষে তিনি পূজা করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রদান করেন। স্বামী যোগানন্দ তাঁহার প্রিয়তম সেবক ও কৃতী মন্ত্রশিষ্য।

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমা বংশীবটে কালাবাবুর কুঞ্জে থাকিতেন। এখানে একদিন সকালে এমন গভীর সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, যোগীন-মা অনেকক্ষণ ধরিয়া নাম শুনাইলেও সমাধিভঙ্গ হয় নাই। পরে স্বামী যোগানন্দ আসিয়া নাম শুনাইলে সমাধির গাঢ়তার কিঞ্চিৎ উপশম হইল ও তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'খাব'। সমাধিভঙ্গ হওয়ার মুখে ঠাকুর এইরূপ বলিতেন। কিছু খাবার, জল ও পান তাঁহার সম্মুখে রাখা হইলে, ভাবাবেশে ঠাকুর যেমন করিতেন, মা সেইভাবে খাবার

প্রমত্ত উজান মন-যমুনায লুকাইয়া বাঁশী ডাকে 'সখি আয়';
প্রাণের কালিয়া বলে দে কোথায়, বড় যে সুখেরি কলঙ্ক রাধার ॥
প্রতি অঙ্গ মোর কানু-ক্ষুধাতুর, সে কানু কেন লো দুর—এতদূর!
প্রেমের রাজা সে যে ছিল না নিঠুর, কোটি কুঞ্জে সে যে হয়েছে আমার।
যত ছিল রাস, যত বৃন্দাবন, যত লো কদম্ব নিকুঞ্জ কানন,
(সেথা) জনমে জনমে মোর কানুধন, প্রেম-ভিখারিণী আমি রাধা তাঁর ॥

ও জল একটু একটু গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের মত পানের তলার দিকটা দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া সেই পান চিবাইতে লাগিলেন। এই সময়ে স্বামী যোগানন্দ মাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ঠাকুব যেরূপ উত্তর দিতেন ঠিক সেইরূপ উত্তর পাইয়াছিলেন। ভাবের সম্পূর্ণ উপশম হইলে মা বলিয়াছিলেন, তাঁহার উপর ঠাকুরের আবেশ হইয়াছিল। যোগানন্দ-মহারাজকে ঠাকুর বহুবাব বলিয়াছিলেন যে তাঁহাব দেহে ও মার দেহে কোনও ভেদ নাই।

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমা সম্বৎসব বাস করেন এবং একবার পায়ে হাঁটিয়া পঞ্চ-ক্রোশী পরিক্রমা কবেন। মধ্যে তিনি কোন সময়ে স্বামী যোগানন্দ, লক্ষ্মীদেবী ও যোগীন-মাকে সঙ্গে লইয়া হরিদ্বারে যান এবং তথা হইতে ফিরিবার পথে জয়পুর ও পুষ্করে গমন করেন। তীর্থ-জলে নিক্ষেপ করিবার জন্য মা ঠাকুরের নখ ও কেশ সঙ্গে আনিয়াছিলেন—সেই নখ ও কেশের কিয়দংশ তিনি হবিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে দিয়া আসেন এবং অবশিষ্ট কেশ বৃন্দাবন হইতে দেশে ফিরিবার সময় ৺প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে নিক্ষেপ করেন। প্রয়াগে লক্ষ্মী মস্তক-মুণ্ডন করিয়াছিলেন, মা করেন নাই।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমার পায়ে বাতের সূত্রপাত হইলেও এই সময়ে উহা ততটা প্রবল হয় নাই। নতুবা তিনি কখনও পায়ে হাঁটিয়া বৃন্দাবন পরিক্রমা করিতে পারিতেন না। তিনি কাশীতে বেণীমাধবের ধ্বজায়, হরিদ্বারে চণ্ডীর পাহাড়ে এবং পুষ্করে সাবিত্রী-পাহাড়েও আরোহণ করিয়াছিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

পঞ্চতপা

শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং বসু-বলরাম-ভবনে পক্ষকাল থাকিয়া, দক্ষিণেশ্বরে বিগ্রহসকলকে প্রণাম করিয়া স্বামী যোগানন্দ ও গোলাপ মার সঙ্গে কামারপুকুর যাত্রা করিলেন। [নি] বর্ধমান পর্যন্ত রেলে যাইয়া,অর্থাভাবে,তথা হইতে উচালন পর্যন্ত আট ক্রোশ পথ পদব্রজে যাইতে হয় এবং মা তাহাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন।

এই সময়ে শ্রীশ্রীমার অর্থাভাবের একটি বিশেষ কারণও উপস্থিত হইয়াছিল। রাণী রাসমণির দৌহিত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস মাকে মাসিক সাতটি করিয়া টাকা দিতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর কালীবাড়ীর দীনু-খাজাঞ্চী ও অন্যান্য সকলে বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সেই টাকাটা বন্ধ করিয়া দেয়। স্বামী বিবেকানন্দ মার টাকাটা বন্ধ না করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে অবস্থান-কালে পত্রে সেই কথা অবগত হইয়া মা বলিয়াছিলেন, 'বন্ধ ক'রেচে, করুক। এমন ঠাকুরই চলে গেছেন, টাকা নিয়ে আর আমি কি ক'রব!'

শ্রীশ্রীমাকে কামারপুকুরে রাখিয়া যোগানন্দ-মহারাজ চলিয়া আসিলেন এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের ন্যায় তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। মাকে এই সময়ে কখন কখন একাকিনী থাকিতেও হইয়াছে এবং সাধারণতঃ শাকভাত, ক্বচিৎ লবণের অভাবে শুধু ভাত খাইয়া তাঁহার দিন কাটিয়াছে। তাঁহাকে যে এতটা অভাব অনটনের মধ্যে দিনযাপন করিতে হইতেছে, তাহা তাঁহার তপস্যানিরত ত্যাগী সন্তানগণ তৎকালে বুঝিতেই পারেন নাই। যাহা হউক, জানিবার পর অচিরকাল মধ্যে সকল বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহারা মাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন।[১]

চিরকাল স্বল্পে ও যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট শ্রীশ্রীমা সংসারের অভাব অনটনের জন্য বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেন না। ঠাকুরের অদর্শন-জনিত অভাবই এই সময়ে তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্টের কারণ হইয়াছিল। যখনই এই অভাব-বোধ অসহনীয় হইয়া উঠিত তখনই ঠাকুর তাঁহাকে দর্শন দিতেন, উপদেশাদি করিতেন, কখনও বা খিচুড়ি রাঁধিয়া খাওয়াইতে বলিতেন।

* * * *

কামারপুকুরে অবস্থান-কালে শ্রীশ্রীমা পিত্রালয়ে যাইয়া স্বীয় জননীর সঙ্গে কিছুদিন, অন্ততঃ জগদ্ধাত্রীপূজার সময়টা কাটাইয়া আসিতেন।

---

[১] লক্ষ্মীদেবীর উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীশ্রীমার ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য ঠাকুর বলরাম বসুর কাছে কয়েক শত টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। বলরাম উহা নিজেদের জমিদারিতে খাটাইয়া ছয়মাস অন্তর মাকে ত্রিশ টাকা করিয়া সুদ দিতেন। পরে মা সেই মূল টাকা দিয়া ৺জগদ্ধাত্রীপূজার জন্য জমির ব্যবস্থা করেন।

ঠাকুরের তিরোভাবের পর তিনি যখন প্রথম প্রথম দেশে যাইতেন, তখন কামারপুকুরেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। কিন্তু শেষের দিকে তিনি আর কামারপুকুরে বড় একটা যাইতেন না, পিত্রালয় জয়রামবাটীতেই থাকিতেন। বর্ধমান হইয়া কলিকাতা যাতায়াতের পথে কামারপুকুরে যাইতেই হইত, কিন্তু ১৩১২ সাল হইতে তাঁহাকে আর এই পথে গমনা-গমন করিতে হয় নাই। মার এই পিত্রালয়-প্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া কেহ রহস্য করিয়া বলিয়াছিল 'মা, আপনি তো ঠাকুরের বাড়ী একবারও যান না; কলকাতা থেকে দেশে এলেই বাপের বাড়ীতে এসে থাকেন। এটি বোধ হয় আপনাদের পূর্ব পূর্ব ধারা?' তাহাতে মা হাসিয়া উত্তর দেন, 'তা নয় বাবা, ঠাকুরের বাড়ী কি ভুলতে পারি? —শিবু আমার ভিক্ষেপুত্র। তবে ঠাকুর এখন স্থূলদেহ ত্যাগ ক'রেচেন, গেলে বড়ই কষ্ট বোধ হয়, এ জন্যে যাই না।' [উ]

কলিকাতায় আসিলে শ্রীশ্রীমা সাধারণতঃ গঙ্গাতীরে, বেলুড়ে বা বাগবাজারে, ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করিতেন। অল্প কয়েকদিন থাকিবার প্রয়োজন হইলে তিনি প্রায়শঃ ঠাকুবের অন্যতম রসদ্দার বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। তিনচারি বার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাঁহার বাসা-বাড়ীতেও বাস করিয়াছেন। তাহার পরে স্বামী সারদানন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় বাগবাজারে নিজবাটী নির্মিত হইলে তিনি বরাবর সেখানেই থাকিতেন।

* * * *

১২৯৫ সালের প্রারম্ভে দেশ হইতে আসিয়া শ্রীশ্রীমা বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের ভাড়াটে বাড়ীতে ছয়মাস বাস করেন। ঐ সময়ের মধ্যে একদিন স্বামী অভেদানন্দ নিজের লিখিত সুবিখ্যাত মাতৃস্তোত্র মাকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন। মা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া 'তোমার কণ্ঠে সরস্বতী ব'সবেন' বলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন।[২]

---

[২] লেখককে অভেদানন্দজী বলিয়াছেন যে, তিনি যখন শ্রীশ্রীমাকে স্তোত্র শুনাইয়াছিলেন তখন মা বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের বাড়ীতে এবং মঠ বরাহনগরে।

বেলুড়ে শ্রীশ্রীমা যোগীন-মা ও গোলাপ-মার সঙ্গে থাকিয়া কঠোর তপশ্চরণে নিযুক্ত থাকিতেন। এখানে একদিন রাত্রে ছাদে বসিয়া ধ্যান করিবার কালে তিনি নির্বিকল্প-সমাধি-মগ্ন হন। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হওয়ার পরেও, কিছুদিন যাবৎ তাঁহাতে 'ভাবাতীত ভাবে'র একটা আবেশ বিদ্যমান ছিল, এবং লাল, নীল বিবিধ জ্যোতিতে তাঁহার মন লীন হইয়া যাইত। স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দকে মা বলিয়াছিলেন যে এভাব আরও কিছুদিন থাকিলে দেহে মন ফিরাইয়া আনা দুষ্কর হইত।

অতঃপর শ্রীশ্রীমা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, সারদানন্দ, যোগীন-মা, যোগীন-মার গর্ভধারিণী, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে ৺পুরীধামে গমন করেন। তখনও পুরী পর্যন্ত রেল-লাইন না হওয়ায়, কটক পর্যন্ত ষ্টীমারে গিয়া তথা হইতে গরুর গাড়ীতে পুরী যাইতে হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি পৌঁছিবার জন্য সারদানন্দ-মহারাজ স্বয়ং সমস্ত রাত্রি গাড়ী হাঁকাইয়াছিলেন এবং সকালবেলা পুরীতে পৌঁছিয়াই সকলে মিলিয়া মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কারণ সেই সময়ে দর্শন না হইলে পরে অকাল পড়িত। এখানে আসিয়া মা বলরামবাবুদের 'ক্ষেত্রবাসীর মঠে' ২৫শে কার্তিক হইতে দুইমাস বাস করিয়াছিলেন[৩] এবং ঠাকুর জগন্নাথ-দর্শনে যান নাই বলিয়া একদিন ঠাকুরের ছবি বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে জগন্নাথ-দর্শন করাইয়াছিলেন। মা বলিতেন, 'ছায়া, কায়া, ঘট, পট সমান।' ৺জগন্নাথকে দর্শন করিয়া আসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'জগন্নাথকে দেখলুম যেন পুরুষসিংহ, রত্নবেদীতে ব'সে আছেন, আর আমি দাসী হ'য়ে তাঁর সেবা ক'চ্চি।' জগন্নাথকে তিনি স্বপ্নে শিব-মূর্তিরূপেও দর্শন করিয়াছিলেন।

পুরী হইতে কলিকাতা ফিরিবার তিনচারি সপ্তাহ পরে শ্রীশ্রীমা স্বামী যোগানন্দ, সারদানন্দ, মাষ্টার-মহাশয়, লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতির সঙ্গে প্রেমানন্দ-

---

[৩] 'শ্রীম'-দিনলিপিতে আছে : Ma's pilgrimage to Jagannath 5th November, 1888. Returns to our house Saturday at 12 noon—পৌ-শু-১১শী—12th Jan., 1889. [পঞ্জিকানুসারে ১২৯৫ সালের ২৫শে কার্তিক ৯ই নভেম্বর, ৬ দণ্ড ৩৮ পলের পর হইতে ২৫শে পৌষ ৮ই জানুয়ারী, ৫৬ দণ্ড ২ পল পর্যন্ত অশুদ্ধ কাল।]

মহারাজের জন্মভূমি আঁটপুরে যান। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার কতিপয় গুরুভ্রাতা পূর্ব হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মাকে পাইয়া স্বামিজী অত্যন্ত আনন্দিত হন। আঁটপুরে সপ্তাহ কাল থাকিয়া মা গরুর গাড়ীতে তারকেশ্বর হইয়া কামারপুকুরে যান এবং এক বৎসর পরে, ১২৯৬ সালের শেষভাগে কলিকাতায় পুনরাগমন করেন। এখানে মাষ্টার-মহাশয়ের কম্বুলিয়াটোলার বাসায় একমাস থাকিয়া তিনি চৈত্রমাসের মাঝামাঝি স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে ৺গয়াধামে গমন করেন।[৪] ঠাকুর স্বীয় জননীর স্বর্গারোহণের পর শ্রীগদাধর-পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। গয়াকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়া মা বোধগয়া দেখিতে গিয়াছিলেন; বোধগয়া-মঠের ঐশ্বর্য তাঁহার গৃহত্যাগী আশ্রয়হীন অর্ধাশনক্লিষ্ট সন্তানগণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং ঠাকুরের কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহাদিগকেও ঐরূপ একটি স্থান করিয়া দিবার জন্য মা প্রার্থনা করেন। গয়া হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি পরমভক্ত বলরামবাবুর বাড়ীতে চলিয়া আসেন; বলরামবাবুর তখন অসুখ চলিয়াছে। ১২৯৭ সালের ১লা বৈশাখ ঠাকুর প্রিয়ভক্তকে নিজ সকাশে টানিয়া লন।

শ্রীশ্রীমা গৃহী ভক্তদের মধ্যে বলরামবাবুকে সর্বাপেক্ষা বড় বলিয়া নির্দেশ করিতেন। তিনি ঠাকুরের কিরূপ পরমাত্মীয় ছিলেন তাহা মার নিম্নোক্ত কথা হইতে বুঝা যায়ঃ রামের মার [বলরামবাবুর স্ত্রীর] অসুখ হ'য়েছিল। ঠাকুর আমাকে ব'ল্লেন, 'যাও, দেখে এসগে।' আমি ব'ল্লুম, 'যাব কিসে? গাড়ী টাড়ী নাই!' ঠাকুর ব'ল্লেন, 'আমার বলরামের সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে, আর তুমি যাবে না? হেঁটে যাবে, হেঁটে যাও।' শেষে পালকি পাওয়া গেল—দক্ষিণেশ্বর থেকে গেলুম। আর একবার রামের মার অসুখ হয়—তখন আমি শ্যামপুকুরে—রাত্রে হেঁটে দেখতে গেলুম! [গ]

পরবর্তী জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীশ্রীমা ঘুসুড়ীতে স্থান-পরিবর্তন করেন। এখানে

---

[৪] ৺বৃন্দাবন হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ বলরামবাবুকে লিখিয়াছেন: মাতাঠাকুরাণী ৺গয়াধামে সত্বর যাইবেন লিখিয়াছেন এবং গয়াধাম হইতে আসিয়া বেলুড়ে থাকিবেন। [ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ]

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে গান শুনাইয়া ও তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকালের জন্য পরিব্রাজক-বেশে বহির্গত হন। এখানে ভাদ্রমাস পর্যন্ত থাকিয়া রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলে মাকে বরাহনগরে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ীতে চিকিৎসার্থ আনয়ন করা হয়। এই বাড়ীতে শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ পুত্র-সঙ্গে আসিয়া এই প্রথমবার তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করেন।

ঐবৎসর দুর্গাপূজার পরে দেশে গমন করিয়া শ্রীশ্রীমা তথায় কিছু অধিককাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।[৫] ঠাকুরের পার্ষদ-ভক্তগণের অনেকে এই সময়ে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী-দর্শনে আসিয়া মার অহেতুক স্নেহলাভে ধন্য হন। ১২৯৮ সালের চৈত্রমাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ আগমন করেন; জয়রামবাটীতে তাঁহারা একদিন মাকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। অতি আদরের পুত্রটি লোকান্তরিত হইলে গিরিশচন্দ্র শোকে অভিভূত হন; স্বামী নিরঞ্জনানন্দের প্রেরণায় তাঁহারই সঙ্গে আসিয়া গিরিশ কয়েকমাস মার স্নেহচ্ছায়ায় বাস করেন। ১২৯৯ সালের জগদ্ধাত্রীপূজায় স্বামী সারদানন্দ, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, হরমোহন মিত্র, যোগীন্-মা ও গোলাপ-মা জয়রামবাটীতে আসিয়াছিলেন।

১৩০০ সালের আষাঢ় মাসে, বেলুড়ে আসিয়া শ্রীশ্রীমা নীলাম্বর-ভবনে কয়েকমাস অবস্থান করেন। এই বাড়ীতে শ্রীদুর্গাচরণ নাগ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। ভাবের আবেগে নাগ-মহাশয়ের সর্বশরীর তখন কাঁপিতেছিল। মা তাঁহার আনীত সন্দেশ স্বয়ং কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে স্বহস্তে প্রসাদ খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন; আর নাগ-মহাশয় "বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল" বলিতে বলিতে আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন।[৬] মার দেওয়া একখানি কাপড় তিনি পরিধান না করিয়া মাথায় জড়াইয়া রাখিতেন। পরবর্তীকালে শ্রীমতী শচীবালা সরকার একদিন কলিকাতায় মার বাড়ীতে দেখিয়াছিলেন,—মা ঠাকুরঘরের দেয়ালে ঝুলানো স্বামিজীর ছবি, গিরিশবাবুর ছবি এবং নাগ-মহাশয়ের ছবি এক এক করিয়া

---

৫ ১২৯৭ সালে দুর্গাপূজা ৪ঠা কার্তিক তারিখে পড়িয়াছে।

৬ শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বি-এ প্রণীত 'সাধু নাগ-মহাশয়'।

ভিজা গামছায় মুছিলেন ও প্রত্যেকটিতে চন্দনের ফোঁটা দিয়া হস্তস্পর্শ করিয়া চুমা খাইলেন। তাহার পরে নাগ-মহাশয়ের ছবিখানি হাতে লইয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, 'কত ভক্তই আসচে, এমনটি আর দেখচি নি!'

নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে অবস্থান-কালে শ্রীশ্রীমার একটি অভিনব দর্শন উপস্থিত হয়। তিনি দেখিয়াছিলেন,—ঠাকুর গঙ্গায় নামিলেন, নামিবামাত্র তাঁহার দেহ গঙ্গাজলে মিশিয়া গেল; স্বামী বিবেকানন্দ 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' বলিতে বলিতে সেই জল চারিদিকে দুই হাতে অগণিত লোকের মাথায় ছিটাইয়া দিতেছেন ও তাহারা সদ্যোমুক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছে! দৃশ্যটি মার মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল এবং ঠাকুরের দেহে পদস্পর্শ হওয়ার ভয়ে তিনি কয়েকদিন গঙ্গায় নামিয়া স্নানাদি করিতে পারেন নাই।

এই বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা যোগীন-মার সঙ্গে ক্রমাগত পাঁচদিন পঞ্চতপার অনুষ্ঠান করেন। একতলার ছাদের উপর মাটি ফেলিয়া পঞ্চতপার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। [নি] মা বলিয়াছেন: ঠাকুরের দেহ-রাখার পর পাগলের মতন হ'য়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। কিন্তু মনের শান্তি কোথাও পেলুম না। আমার এই অবস্থা দেখে যোগেন [যোগীন-মা] ব'ল্লে, 'মা, চল আমরা পঞ্চতপা করি, তবেই মনের আগুন নিভবে।' পঞ্চতপার যোগাড় করা হ'ল'। চারদিকে পাঁচহাত অন্তর অন্তর চারটি অগ্নিকুণ্ড, তাতে ঘুঁটের আগুন, আর উপরে সূর্যের তেজ। বুঝতেই তো পার, ব্যাপার কি! সকালে স্নান ক'রে এসে দেখি, আগুন খুব জ্বলচে। প্রাণে বড়ই ভয় হ'ল'—কি ক'রে এর ভিতর যাব আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত ব'সে থাকব! যোগেন ব'ল্লে, 'কোন ভয় নাই মা, এস।' তখন মনে মনে ঠাকুরের নাম নিয়ে ঢুকে দেখি, আগুনের কোন তাপ নাই। কিন্তু পাঁচ পাঁচদিন এই রকমে কাজ করায় শরীর যেন পোড়া কাট হ'য়েছিল। [উ]

পঞ্চতপা করিবার পূর্বে, দেশে থাকিতে, শ্রীশ্রীমা কিছুদিন যাবৎ কিশোর-বয়স্কা এক সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মাথায় রুক্ষ চুল ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পঞ্চতপা করিবার পর এই সন্ন্যাসিনী তাঁহার দেহে মিলাইয়া যান। স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দকে মা বলিয়াছিলেন: আমি

দেখতুম, দশ বার বছরের একটি মেয়ে—গেরুয়া পরা, সঙ্গে সঙ্গে ফিরচে, আর আমাকে যেন কিছু ক'ত্তে ব'লচে। তখন আমার ভিতর থেকে উঠল', 'পঞ্চতপা'। পঞ্চতপা কি, জানতুম না। যোগেনকে বল্লুম, 'পঞ্চতপা কি?'

পঞ্চতপা করিবার বহু বৎসর পরে স্বামী অরূপানন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীমার এইরূপ কথাবার্তা হয়: "পঞ্চতপা টপা এসব করে শরীরকে কেন কষ্ট দেওয়া!" "পার্বতীও শিবের জন্যে ক'রেছিলেন। এসব করা লোকের জন্যে। না হ'লে লোকে ব'লবে, 'কই, সাধারণের মতন খায় দায়, আছে!' আর পঞ্চতপা টপা মেয়েলি—যেমন ব্রত সব করে না?" [গ]

সপ্তদশ অধ্যায়

স্বজন-বিয়োগ

১৩০০ সালের পৌষ মাসে বলরাম বসুর কন্যা শ্রীমতী ভুবনমোহিনীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পত্নী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী শোকে জর্জরিত ও রোগে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কোথাও লইয়া যাওয়ার কথা হইলে তিনি শ্রীশ্রীমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুযায়ী মাকে দেশ হইতে লইয়া আসা হয় এবং ঐ বৎসরের শেষভাগে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণভাবিনী ও তাঁহার গর্ভধারিণী, গোলাপ-মা, স্বামী যোগানন্দ, সারদানন্দ, ত্রিগুণাতীত, যোগানন্দ-মহারাজের পিতা নবীনচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি সকলে শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত কৈলোয়ার নামক স্থানে গমন করেন। সেইস্থানে তাঁহারা দুই মাস বাস করিয়াছিলেন এবং মা তথাকার বন্যহরিণসমূহের দল বাঁধিয়া স্বচ্ছন্দ-বিচরণ ও পক্ষিবৎ দ্রুতগতি দেখিয়া বালিকার মত আনন্দিত হইয়াছিলেন।[১]

---

[১] ঐ দেশের লোকের দুঃখদুর্দশা শ্রীশ্রীমা পরবর্তী কালে এইরূপে গল্প করিয়াছেন: ওদেশে লোকের কত দুঃখ জান? ওদেশে ছোট ছোট খেজুরগাছ, তাতে রস হয়। শিয়ালে এসে রস খেয়ে ফেলে; তাই লোকেরা মাটিতে গর্ত ক'রে সারারাত্রি তাতে

কৈলোয়ার হইতে ফিরিয়া শ্রীশ্রীমা ১৩০১ সালের ৺দুর্গাপূজার পূর্ব পর্যন্ত কয়েকমাস বেলুড়ে বাস করেন। [নি] তথা হইতে স্বামী প্রেমানন্দের মাতা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী ঘোষের আমন্ত্রণে তিনি আঁটপুরে যান। অনেক বৎসর বন্ধ থাকিবার পর মাতঙ্গিনী সেইবারে নূতন করিয়া স্বগৃহে জগদম্বার পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশান্তিরাম যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও গুপ্ত-মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) সহ মাকে কলিকাতা হইতে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। পূজার কয়েকদিন আঁটপুরে থাকিয়া মা দেশে চলিয়া যান।

১৩০১ সালের শেষভাগে কলিকাতা আসিয়া শ্রীশ্রীমা পুনরায় ৺কাশী হইয়া বৃন্দাবনে যাইতে মনস্থ করেন এবং তীর্থ করাইবার অভিলাষে স্বীয় গর্ভধারিণীকে ও সহোদরগণকে দেশ হইতে আনাইয়া লন। স্বামী যোগানন্দ, গোলাপ-মা ও যোগীন-মা তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ফাল্গুন হইতে বৈশাখ পর্যন্ত প্রায় তিন মাস তাঁহারা বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে বাস করিয়াছিলেন।[২] বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন কারয়া মা তাঁহার জননী ও সহোদরদিগকে দেশে পাঠাইয়া দেন এবং স্বয়ং মাষ্টার-মহাশয়ের কলুটোলার বাসায় মাসাধিককাল ও শরচ্চন্দ্র সরকার নামক ভক্ত সন্তানের গৃহে রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটের ৫৯-২ নম্বর বাড়ীতে প্রায় একমাস থাকিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শরৎবাবু সম্ভবতঃ স্বামিজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীমা একটি ছোট বালগোপাল-মূর্তি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মূর্তিটিকে কিন্তু পূজা করা হইত না। একদিন মা দেখিতে পান, গোপাল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছে, 'তুমি আমাকে এনে ফেলে

দাঁড়িয়ে থাকে। গর্তের মুখে, তাদের মাথার উপরে মাটির খোলা দিয়ে রাখে; মাঝে মাঝে মাথা তুলে দেখে আর 'দূর দূর' ক'রে শিয়াল তাড়ায়। [বি]

২ শ্রীশ্রীমার দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন-বাসের সময় এইরূপে নিরূপিত হয়: শান্তিরামবাবু সপরিবারে শ্রীহরিবল্লভ বসুকে সঙ্গে লইয়া ১৩০১ সালের দোলপূর্ণিমার (২৮শে ফাল্গুন) দুইএক দিন পূর্বে বৃন্দাবনে পৌছেন। মা তাহার পূর্ব হইতেই বৃন্দাবনে ছিলেন। প্রায় দেড়মাস পরে তাঁহারা যখন বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসেন, মা তখনও বৃন্দাবনে থাকেন। কালাবাবুর কুঞ্জের বাহিরের গেটে,ভিতরে ঢুকিতে বামদিকের ঘরখানিতে মা থাকিতেন।

রেখেচ—তুমি আমাকে খেতে দাও নি, পূজো কর নি—তুমি পূজো না ক'ল্লে আমাকে কেউ পূজো ক'রবে না।' পরদিনই মা মূর্তিটি বাহির করিয়া উহার মুখচুম্বন করেন এবং পূজা করিয়া তাঁহার নিত্যপূজিত ঠাকুরের পার্শ্বে রাখিয়া দেন। [ম]

১৩০৩ সালের প্রথমভাগে কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমা সরকারবাড়ী লেনের গুদামওয়ালা বাড়ীতে পাঁচছয় মাস বাস করেন। ১৩০৪ সালের শেষভাগে পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া তিনি যখন বোসপাড়া লেনের ১০-২ নম্বর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার জীবনে কতকগুলি স্মরণীয় ঘটনা পরপর আসিয়া উপস্থিত হয়।

একদিন সন্ধ্যার পর স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসেন এবং ঠাকুরের উপর অভিমান করিয়া বলিতে থাকেন, "মা, এই তো ঠাকুর! কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আসত বলে সেই ফকিরটা শাপ দিলে, 'হেগে হেগে তিনদিনের ভেতর এই জায়গা ছেড়ে পালাতে হবে।' আর সঙ্গে সঙ্গে তাই কি-না আমাব হল! সামান্য একটা ফকিরের শক্তিও ঠাকুর রোধ করতে পারলেন না?" মা বলিলেন, 'বাবা, শঙ্করাচার্যও তো শুনতে পাই এমনি ক'রে নিজের শরীরে রোগ আসতে দিয়েছিলেন। তোমার শরীরে রোগ আসতে দেওয়া আর তাঁর [ঠাকুরের] নিজের শরীরে আসতে দেওয়া একই কথা। তিনি তো ভাঙ্গতে আসেন নি, গড়তে এসেছিলেন। সবই বিদ্যা, বিদ্যাকে তো মান্য করা চাই। তিনি তো হাঁচি টিকটিকি পর্যন্ত মেনে গেছেন!' স্বামিজী বলিলেন, 'তুমি যাই বল না কেন, আমি মানি না।' মা উত্তর দিলেন, 'না মেনে থাকবার কি যো আছে? তোমার টিকি যে বাঁধা!' [আ]

১৩০৫ সালে ৺কালীপূজার দিন শ্রীশ্রীমা বেলুড়ে নবনির্মিত মঠে প্রথম পদার্পণ করেন এবং তথায় স্বহস্তে পূজার স্থান পরিষ্কার করিয়া স্বয়ং ঠাকুরের পূজাকার্য সম্পন্ন করেন। সিষ্টার নিবেদিতা ঐদিন অপরাহ্নে মা, স্বামিজী, ব্রহ্মানন্দ-মহারাজ ও সারদানন্দ-মহারাজকে সঙ্গে লইয়া বাগবাজারে প্রত্যাবর্তন করিলে বোসপাড়া লেনের ১৬ নম্বর বাড়ীতে 'নিবেদিতা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩০৫ সালের ১৫ই চৈত্র শ্রীশ্রীমার জীবনে একটি গভীর বেদনাদায়ক দিন। স্বামী যোগানন্দ যিনি দ্বাদশ বর্ষকাল তাঁহার সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে নিজেকে সর্বতোভাবে নিযোজিত রাখিয়াছিলেন, তিনি দীর্ঘকাল রক্তামাশায় ও জ্বরে ভুগিয়া অকালে দেহরক্ষা করেন। ৺কাশীক্ষেত্রে অতি কঠোর তপশ্চর্যার ফলে কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যোগানন্দ-মহারাজ মার 'অন্তরের বস্তু' ছিলেন। তাঁহার অসুখ বাড়িতেছে দেখিলে মা বসিয়া কাঁদিতেন, আবার তিনি একটু ভাল আছেন দেখিলে নিজেও ভাল আছেন বোধ করিতেন। তাঁহার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া মার শরীর শুকাইয়া গিয়াছিল। তাঁহার শরীর যাইতে মা বলিয়াছিলেন, 'বাড়ীর একখানা ইট খ'সল', এবার সব যাবে।'

স্বামী যোগানন্দ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি শ্রীশ্রীমা বিভিন্ন সময়ে বলিয়াছিলেন ঃ

"যোগীনের মতন আমাকে কেউ ভালবাসত না। আমার যোগীনকে কেউ যদি আট আনা পয়সা দিত', সে রেখে দিত' ঃ ব'লত', 'মা তীর্থে টীর্থে যাবেন, তখন খরচ ক'রবেন।' সবক্ষণ আমার কাছে ব'সে থাকত।' যোগীন আমাকে বলত', 'মা, তুমি আমাকে 'যোগা' যোগা' ব'লে ডাকবে।' [গ]

"যোগীন দু আনা, চার আনা, আট আনা ক'রে ছশ' টাকা আমার জন্যে জমিয়েছিল। [বি]

"যোগীন যখন দেহ রাখলে, নির্বাণ চাইলে। গিরিশবাবু ব'ল্লেন, 'ছাখ্ যোগীন, নিবাণ নিস নি। ঠাকুর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে, চন্দ্রসূর্য তাঁর চক্ষু—অত বড় ভাবিস নি। যেমন ঠাকুরটি ছিলেন তেমনটি ভেবে ভেবে তাঁর কাছে চলে যা।'

"যোগীন যখন দেহ রাখলে, সে ব'ল্লে, 'মা, আমায় নিতে এসেছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ঠাকুর।' " [গ]

যোগানন্দ-মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে একখানা লেপ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক বৎসর পরে তাহা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যায়। মা উহার তুলাটা পিঁজাইয়া লইয়া, একটা নূতন খোল দিয়া লেপখানা সংস্কার করিয়া আনিবার জন্য বিভূতিবাবুকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যোগীনের দেওয়া

জিনিষ আর তেমনটি থাকিবে না—রূপান্তরিত হইয়া যাইবে, ইহা ভাবিতেই যেন মার প্রাণে একটা ধাক্কা লাগিল। তিনি উহার সংস্কার-বাসনা ত্যাগ করিলেন এবং পুনরায় বিভূতিবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে বলিলেন, 'না বিভূতি, লেপটা নিয়ে যেয়ে কাজ নাই। এই লেপ যোগীন দিয়েছিল। দেখলেই যোগীনকে মনে পড়ে।'[৩]

৺দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা মঠে আসিয়াছেন। তখন ঠাকুরঘরের সম্মুখের দেয়ালে যোগানন্দ-মহারাজের একখানি তৈলচিত্র লম্বিত ছিল। মা নিকটে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সেই চিত্রখানি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি ঠাকুরঘরেও গেলেন বটে, কিন্তু ঠাকুরকে দর্শনমাত্র করিয়া চলিয়া আসিলেন। কোন্ বেদনা সেদিন জননীর প্রাণে বাজিয়াছিল, কে বলিবে!

---

৩ হৃদয়ের ভক্তি-ভালবাসা মিশ্রিত করিয়া কেহ কোন জিনিষ দান করিলে শ্রীশ্রীমা সাধ্যমত তাহা রক্ষা ও আজীবন ব্যবহার করিয়া ভক্তবৎসলা নামের পরিচয় দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও কয়েকটি ঘটনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। মহাযুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত ফণিভূষণ (স্বামী ভবেশানন্দ) মাকে দিবার জন্য একটি তুর্কী মোহর কোন ভক্তের হাতে প্রদান করেন। মা মোহরটি গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'মোহরের আর কি দাম, স্মৃতিরই দাম। সে যে এই মনে ক'রে মোহরটি এনেছিল।' মা স্থূল-শরীরে অপ্রকট হইলে দেখা গেল, মোহরটি তখনও কাগজমোড়া অবস্থায় তাঁহার বাক্সে পড়িয়া আছে।

২। সিষ্টার নিবেদিতা মাকে একটি জার্মান সিলভারের কৌটা দান করেন। সেইটিতে মা ঠাকুরের কেশ রক্ষা করিয়াছিলেন; বলিতেন: যখন পূজো করি, কৌটোটি দেখলেই নিবেদিতাকে মনে পড়ে। নিবেদিতা ব'লেছিল, 'মা, আমরা আর জন্মে হিঁদু ছিলুম, ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে ব'লেই আমরা ওদেশে জন্মেচি।'

৩। একবার মা কলিকাতা হইতে জয়রামবাটীতে যাইলে তাঁহার একখানা ভাল বালাপোষ দেখিতে পাওয়া গেল না। রাখিবার দোষে হারাইয়া গিয়াছে মনে করিয়া, যিনি জিনিষপত্রের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন তাহার মন খারাপ হইয়া যায়, মার মনেও দুঃখ হয়। কিন্তু খুঁজিতে খুঁজিতে পরে যখন উহা অন্য জিনিষের সঙ্গে পাওয়া গেল, তখন মা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'বালাপোষের জন্যে কি, বাবুরামের মা এই বালাপোষটি দিয়েছিল, সেইজন্যে।' [বি]

স্বামী যোগানন্দ ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষ। শ্রীশ্রীমা নিজমুখে বলিয়াছেন যে, তিনি জন্মান্তরে অর্জুন ছিলেন—কৃষ্ণসখা গাণ্ডীবী, ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনে শ্রীভগবানের নবলীলার সাথী। তাঁহার দেহরক্ষার কিয়ৎকাল পর হইতে স্বামী সারদানন্দ মার সেবাধিকার লাভ করিয়া শেষ পর্যন্ত প্রায় একুশ বৎসর সগৌরবে উহা সুনিষ্পন্ন করেন। মা বলিতেন, 'শরৎ আর যোগীন —এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।'

স্বামী যোগানন্দ যে সময়ে দেহত্যাগ করেন, স্বামী সারদানন্দ তখন বেলুড় মঠের তত্ত্বাবধায়ক। সেইজন্য স্বামী ত্রিগুণাতীত ও কৃষ্ণলাল-মহারাজ শ্রীশ্রীমার দেশে গমন পর্যন্ত কয়েক মাস তাঁহার সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ধমানের পথে মাকে দেশে লইয়া যাওয়া, কিংবা দেশ হইতে কলিকাতায় লইয়া আসার কাজ ত্রিগুণাতীত-মহারাজই অধিকাংশ সময়ে করিতেন; এবং মার এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টিত থাকিতেন। একবার যখন মাকে বর্ধমান হইতে পালকির অভাবে গরুর গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, দূর হইতে পথিমধ্যে একটি গভীর গর্ত দেখিতে পাইয়াই তাড়াতাড়ি আসিয়া উহার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়েন। উদ্দেশ্য—তাঁহার দৃঢ়-সবল দেহের উপর দিয়া গাড়ী অনায়াসে চলিয়া যাইবে এবং উহার চাকা গর্তে পড়িয়া মার শরীরে কোন আঘাত লাগিবে না। তখন শেষরাত্রি। মা কিন্তু সমস্তই দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তখনই গাড়ী থামাইতে গাড়োয়ানকে আদেশ করিলেন। তারপরে ঐরূপ করিবার জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া, পায়ে হাঁটিয়া সেই গর্ত পার হইয়া আসিলেন। [আ][৪]

---

৪ ত্রিগুণাতীত-মহারাজ ১৩১৬ সালের ২৮শে শ্রাবণ আমেরিকার সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো হইতে শ্রীশ্রীমাকে যে পত্র লেখেন তাহার কিয়দংশ এইরূপ : মা, আপনার কৃপা অসীম। আমি এতদিন বিদেশে রয়েছি, তথাচ মা, আপনি আমাকে ফেলিয়া দেন নাই। প্রায়ই মা, আপনি আমাকে স্বপ্নে দেখা দেন। আপনার কৃপায় আজও আপনার সেবা করিতে স্বপ্নেও ভুলি নাই। আবার যে কবে মা, আপনার সেবা যাইয়া চাক্ষুষ করিয়া কৃতার্থ হইব, তাহা কিছুই বলিতে পারি না। সবই মা, আপনার ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপার উপরেই নির্ভর করে।

যোগানন্দ-মহারাজের মহাসমাধির চারিমাস পরে, ১৩০৬ সালের ১৮ই শ্রাবণ শ্রীশ্রীমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়চরণ কলেরারোগে আক্রান্ত হইয়া অ-ভয় লোকে প্রয়াণ করেন। [দি] প্রসন্নকুমার একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'দিদি, একপেটে জন্মেচি, আমাদের কি হবে?' তাহাতে মা উত্তর দেন, 'তা তো বটেই, তোদের ভয় কি?' কলিকাতায় অভয়ের মৃত্যুকালে মা যখন পালকি করিয়া চোরবাগান সরকার-লেনে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হন ও শিয়রে বসিয়া আদবে পালিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করেন, তখন অভয় দিদির চক্ষুতে চক্ষু রক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এরা সব রইল, এদের তুমি দেখো।' [বি] এই অসুখের সময়ে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দ অভয়ের খুব সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই মা দেশে চলিয়া যান।

অভয় ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পরীক্ষা দিয়া অল্পদিন পূর্বে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে মা তাঁহার ছোট ছোট ভ্রাতুষ্পুত্রদের সম্বন্ধে বলিতেন, 'ওরা সব মুখ্যু সুখ্যু হ'য়ে বেঁচে থাক।' এইকথা শুনিয়া যদি কোন ভ্রাতৃজায়া আপত্তি করিয়া বলিতেন, 'ঐ রকমই আশীর্বাদ করে নাকি?' তাহাতে মা উত্তর দিতেন, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোরা কি জানিস? আমি অভয়কে মানুষ ক'ল্লুম, অভয় চলে গেল।' [ই] ঐ বংশে বিদ্বান বা উপযুক্ত হইয়া কেহ বাঁচিবে না দেখিয়াই মা ঐ কথা বলিয়াছিলেন কি-না, কে জানে।

অভয় যখন দেহরক্ষা করেন, তাঁহার পত্নী সুরবালা তখন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন। শৈশবে মাতৃহারা সুরবালা তাঁহার দিদিমা ও মাসীমার কোলে মানুষ হইয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁহার দিদিমা লোকান্তরিত হন এবং মাসীমাও রোগে শয্যাশায়িনী হইয়া পড়েন। এই সংবাদ পাইয়াই শ্রীশ্রীমা ভ্রাতার অন্তিমকথা স্মরণ করিয়া সুরবালাকে পিত্রালয় হইতে জয়রামবাটীতে আনাইয়া রাখেন। কিছুদিন পরেই মাসীমারও মৃত্যু-সংবাদ আসে এবং উপর উপর তিনটি গভীর শোক পাইয়া সুরবালার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে তিনি এক সুকুমারী প্রসব করেন, কিন্তু তদবস্থায় তাঁহার পক্ষে

সন্তান-প্রতিপালন অসম্ভব বুঝিয়া মা চিন্তান্বিত হন। সন্তান প্রসূত হওয়ার কয়েকদিন পরে ৺কাশী হইতে স্বামী অচলানন্দের সঙ্গে শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী নামে জনৈক স্ত্রী-ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হন এবং মা তাঁহার হস্তে কন্যাটির প্রতিপালন-ভার অর্পণ করেন। কুসুমকুমারী ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত চারিমাস কাল জয়রামবাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৩০৭ সালের মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসে, ভ্রাতৃজায়া সুরবালা, খুল্লতাত নীলমাধব এবং ভানুপিসীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসেন এবং প্রায় একবৎসর কাল বোসপাড়া লেনের ১৬ নম্বর বাড়ীতে বাস করেন। নিবেদিতা-বিদ্যালয় তখন ১৭ নম্বর বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ১৬ নম্বর বাড়ীর পাশে একটি সরু গলির মত স্থান ছিল; একদিন সেই গলি দিয়া আসিয়া রান্নাঘরের জানালা ভাঙ্গিয়া তাহাতে চোর প্রবেশ করে। চিরকালের অভ্যাস মত শেষরাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রদীপহস্তে বাহিরে আসিয়াই সুরবালা রান্নাঘরে লোক দেখিয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞাহারা হন। ইহার ফলে বহুকষ্টে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলেও তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি অতিমাত্রায় বাড়িয়া যায় এবং বাধ্য হইয়া মা তাঁহাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করেন। কলিকাতায় আসিয়াই মা কুসুমকুমারীর হস্তে কন্যার ভার দিয়াছিলেন। যোগীন-মা প্রভৃতি কলিকাতার ভক্তেরা মাকে বুঝাইলেন যে, জয়রামবাটীতে কন্যা-প্রতিপালনের জন্য এইরূপ একটি স্ত্রীলোক রাখিয়া দিলেই চলিবে এবং তাঁহারা একটি স্ত্রীলোক রাখার ব্যবস্থাও করিবেন; সুতরাং পাগলীকে কন্যা সহ জয়রামবাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হউক, এবং মা এখন কলিকাতায় থাকুন। তাহাদের কথায় মা কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না; কিন্তু সন্ধ্যার সময় জপ করিতে বসিয়া মানসচক্ষে দেখিলেন যে, জয়রামবাটীতে মেয়েটি অযত্নে কষ্ট পাইতেছে, তাহার গর্ভ-ধারিণী বিকৃতবুদ্ধির খেয়ালে এমন যথেচ্ছভাবে পরিচর্যা করিতেছে যে, যে কোন মুহূর্তেই তাহার প্রাণহানির সম্ভাবনা রহিয়াছে। দেখিয়া মা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তখনই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া যোগীন-মাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ও যোগেন, আমার জয়রামবাটী না গেলে চলবে নি।

পাগলীর হাতে মেয়েকে দিয়ে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারব নি—আমি এরকম দেখলুম।'

শ্রীশ্রীমা ভ্রাতৃবধূকে লইয়া জয়রামবাটীতে চলিয়া গেলেন; নীলমাধবও সেই সঙ্গে গমন করিলেন। কেবল ভানুপিসী আরও কিছুদিন গঙ্গাস্নান করিতে ইচ্ছা করিয়া কলিকাতায় রহিলেন।

শুনা যায়, সুরবালার গর্ভাবস্থাতেই ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দেখাইয়াছিলেন যে, ঐ গর্ভস্থ কন্যাটিই ইহলোকে তাঁহার মায়িক অবলম্বন-স্বরূপ হইবে। ঠাকুরের তিরোভাবের পর তখন পর্যন্ত ত্রয়োদশ বৎসর কোনরূপে অতিবাহিত হইলেও, দীর্ঘকাল নিম্নভূমিতে মন রাখিবার মত তেমন কোন মায়িক অবলম্বন না থাকায়, ঐরূপ একটি বন্ধনের প্রয়োজন হইয়াছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, মানবের অশেষ সৌভাগ্যোদয়ে, এতকাল পরে সেই বন্ধন আসিয়া উপস্থিত হইল।

জন্মকাল হইতেই এই কন্যা শ্রীমতী রাধারাণী বা রাধু, এবং তাহার মাতা সুরবালা বা ভক্তদের পাগলী-মামীকে সর্বদাই শ্রীশ্রীমার সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া মার অসংসারী মন একদিকে যেমন সংসারী হইয়াছিল, তেমনি আবার ইহাদের সংস্পর্শে থাকাতেই অগ্নিস্পর্শে কাঞ্চনের ন্যায়, কিংবা জটিলা-কুটিলা দ্বারা লীলা-পুষ্টি হওয়ার মত, তাঁহার দেবচরিত্রের বিশেষত্বগুলিও সমধিক উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ঠাকুরের গলরোগ যেমন বিষয়ী লোকের মনে নানারূপ সংশয় জাগাইয়া তাহাদিগকে দূরে রাখিয়াছিল, রাধুর প্রতি মার ব্যবহারও তেমনি জয়রামবাটী অঞ্চলের লোকের কাছে তাঁহাকে মায়িক সংসারীবৎ প্রতীত করাইয়া অনুরূপ কার্য সাধন করিয়াছিল। কোন কোন বিশিষ্ট ভক্তও যে ঐজন্য কখনও কিছু মনে করেন নাই, একথা জোর করিয়া বলা চলে না। স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ একদিন মাকে বলেন, 'আপনি এত রাধু রাধু করেন কেন? রাধুর উপর আপনার ভারী আসক্তি।' এভাবের কথা তিনি পূর্বেও তাঁহাকে দুইএক বার বলিয়াছিলেন; তাহাতে মা বলিতেন, 'কি ক'রব বাবা, আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের এরকমই।' কিন্তু এবার আর সেইরূপ উত্তর না দিয়া, একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিলেন, 'তুমি এসব কি

বুঝবে? যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন শার্শিতে চমকায়, কিন্তু খড়খড়িতে কিছু হয় না। যাদের ঈশ্বরচিন্তা ক'রে মন শুদ্ধ হয়ে যায়, তারা যখন যে জিনিষটি ধরে তাতেই ষোলআনা মন দেয়। তুমি আমার মতন একটি খুঁজে বার কর দেখি?'

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাধুকে সর্বদা আদরযত্ন করিতে দেখিয়া এক-শ্রেণীর লোক যখন তাঁহার মধ্যে মায়িক আসক্তির অস্তিত্ব অনুমান করিতে-ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই ঐ আদরযত্নের অন্তরালে মার সম্পূর্ণ অনাসক্ত-চিত্ততা অনুভব করিয়া আর এক শ্রেণীর ভক্তেরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন!

* * * *

১৩০৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে ৺দুর্গাপূজা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন এবং নীলাম্বর মুখুজ্যের উদ্যানবাটী ভাড়া করিয়া পূজার কয়েকদিন স্ত্রী-ভক্তগণ সহ শ্রীশ্রীমাকে তথায় আনিয়া রাখেন। স্বামিজী মার হাত দিয়া পূজার তন্ত্রধারক, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীকে পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দেওয়াইয়াছিলেন।

১৩০৯ সালের ২০শে আষাঢ় স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে মহাসমাধি-মগ্ন হন। শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন; সংবাদ-শ্রবণে তিনি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন তাহার কিছুই জানিতে পারা যায় না। ভক্তদের কাছে মা স্বামিজীর অশেষ গুণগ্রাম ও গৌরবময় জীবনের ঘটনাবলী মুক্তকণ্ঠে কীর্তন করিতেন।

শ্রীশ্রীমাকে আনিয়া রাখিবার জন্য স্বামী সারদানন্দ ১৩১০ সালের পৌষ মাসে বাগবাজার ষ্ট্রীটের ২-১ নম্বর বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখেন এবং মাঘ মাসে কলিকাতায় আসিয়া মা এই বাড়ীতে প্রায় দেড় বৎসর বাস করেন। সারদানন্দ-মহারাজ স্বামী বিরজানন্দ, ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ এবং যোগীন-মার সঙ্গে জয়রামবাটীতে যাইয়া বর্ধমানের পথে মাকে কলিকাতায় আনিয়া-ছিলেন; এবং ভানুপিসী, নীলমাধব প্রভৃতি অনেকে মার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বর্ধমানের পথে মার এই শেষবার আসা; ইহার পর

১৩১১ সালে তিনি যখন জয়রামবাটীতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন বিষ্ণুপুর হইয়া বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ খুলিয়া গিয়াছে।

স্বামী সারদানন্দ বাগবাজার ষ্ট্রীটের এই বাড়ীতে থাকিয়া স্বয়ং শ্রীশ্রীমার সেবা পরিচালনা করিতেন। এই সময় হইতে মিসেস্ ওলি বুল মার সেবার জন্য প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য করিতে থাকেন।[৫] এখান হইতে মা ১৩১১ সালের অগ্রহায়ণের মধ্যভাগে স্বামী প্রেমানন্দ, খুল্লতাত নীলমাধব, লক্ষ্মী দেবী, গোলাপ-মা, মাষ্টার-মহাশয়ের স্ত্রী, চুনীলাল বসুর স্ত্রী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পুরী যান ; এবং সুযোগ বুঝিয়া স্বীয় গর্ভধারিণী ও ভ্রাতৃজায়াদিগকে দেশ হইতে আনয়ন করিবার জন্য আশুতোষকে প্রেরণ করেন। তাঁহার গর্ভধারিণী ও ভ্রাতৃজায়াগণ ব্যতীত তাঁহার ভ্রাতা কালীকুমার এবং আরও তিনচারি জন সেই সঙ্গে পুরী গিয়াছিলেন এবং মাষ্টার-মহাশয়ের সঙ্গে কলিকাতা হইতে তাহার অন্যতম ভ্রাতা বরদাপ্রসাদও পরে যাইয়া যোগ দিয়াছিলেন। কনিষ্ঠভ্রাতৃজায়া সুরবালা পূর্ব হইতেই বরাবর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ; শ্যামাসুন্দরী ও তাঁহার অপর তিন পুত্রবধূকে ৺পুরীধামে হঠাৎ সমাগত দেখিয়া পাগলী সুরবালা মার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিতে থাকেন, 'কমলানেবুর প্রাণ, তোমার ভিতর এত রস কে জানে সন্ধান। তোমার ভাল ভাজ,[৬] মা, সকলকে নিয়ে এসেচ!' মা বলিলেন, 'তা আনব নি? আমার বুড়ো মা—তোকে এনেচি, আর তাঁকে আনব নি?' [ই]

পুরীতে যাওয়ার অল্পদিন পরেই শ্রীশ্রীমার পায়ে একটি ফোড়া হইয়া ভীষণ কষ্ট হইতে থাকে ; পাকিয়া গেলেও মা উহাতে কাহাকেও হাত দিতে দিতেন না, অস্ত্রোপচার করিতে দেওয়া তো দূরের কথা। একদিন মন্দিরে

[৫] মিসেস্ বুল মাসে ৬০৲ করিয়া দিতেন। [নি] ১৩১৭ সালের ৪ঠা মাঘ তিনি দেহত্যাগ করেন। [দি]

[৬] বরদাপ্রসাদের স্ত্রী ইন্দুমতী সুরবালা হইতে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। মা তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিলেন এবং নিতান্ত বালিকা বলিয়া—তখন তাঁহার বয়স দশএগার বৎসর মাত্র—যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। সুরবালা তাহাতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া 'ভাল ভাজ' বলিয়া শ্লেষ করিতেন।

দর্শন করিতে গিয়াছেন, অতিরিক্ত ভিড় দেখিয়া পায়ের যন্ত্রণার জন্য ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন আশুতোষ তাঁহাকে দুইহাতে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া, ভিড়ের চাপ নিজের শরীরের উপর সহ্য করিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন। মার এইরূপ কষ্টের কথা জানিয়া স্বামী প্রেমানন্দ এক নূতন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন যে, তিনি লুকাইয়া ছুরি সঙ্গে করিয়া মাকে প্রণাম করিতে আসিবেন এবং প্রণাম করিবার অবসরে সেই ছুরি দ্বারা ফোড়ার মুখ চিরিয়া দিবেন। কোন ভক্তলোক প্রণাম করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া মা ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইলেন এবং পূর্বের পরামর্শানুসারে ডাক্তারও অস্ত্রোপচার করিয়া দিলেন। সেই সময় আশুতোষ দুই-হাতে মার পা চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে হঠাৎ এইরূপ করিতে দেখিয়া মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং আশুতোষকে বারবার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। প্রেমানন্দ-মহারাজ বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, ভয়ে ভিতরে আসেন নাই। ডাক্তারও 'মা, আমার অপরাধ নেবেন না'—এই কথা বলিয়াই তাড়াতাড়ি পলাইয়া যান। যাহা হউক, ফোড়াটি চিরিয়া পূঁজ বাহির করিয়া দেওয়াতে যন্ত্রণার লাঘব হইল; মা আশুতোষকে পা ধোয়াইয়া বাঁধিয়া দিতে বলিলেন এবং পূর্বে তিরস্কার করিয়াছিলেন বলিয়া এখন তাঁহাকে আদর করিয়া খাওয়াইতে বসিলেন।

পুরীর মন্দিরে একদিন সকালবেলা ৺জগন্নাথের বাল্যভোগ খিচুড়ি-মহাপ্রসাদ সকলে শ্রীশ্রীমার মুখে—এবং মাও সকলের মুখে—দিয়াছিলেন। এই সময়ে পুরুষ-ভক্তদের মধ্যে আশুতোষ উপস্থিত ছিলেন এবং দৈবক্রমে মাষ্টার-মহাশয় হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছিলেন। মা নিজেই বলিয়াছিলেন, 'তোমরা আমার মুখে প্রসাদ দাও।'

লক্ষ্মীদেবী একবার শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ভুবনেশ্বরে গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। খুব সম্ভবতঃ এইবারেই মা ভুবনেশ্বরে গমন ও ৺লিঙ্গরাজ-দর্শনাদি করিয়াছিলেন। পুরী হইতে কালীকুমার ও তাঁহার পত্নী প্রভৃতি কয়েকজন পৌষ মাসের মধ্যে জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন করেন এবং অন্যান্য সকলে মাঘ মাসের প্রথমভাগে মার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় আসিবার দুইতিন মাস পরেই ১৩১১ সালের শেষভাগে নীলমাধব হাঁপানি-

রোগে দেহত্যাগ করেন। মার অনুরোধে গণেন্দ্রনাথ তাঁহার খুল্লতাত নীলমাধবের ও মাতা শ্যামাসুন্দরীর ফটো তুলিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমা শেষবয়সে খুল্লতাতকে নিজের কাছে রাখিয়া সযত্ন সেবায় পরিতুষ্ট করেন। সেই সময়ে মার জন্য আম, ম্যাঙ্গোষ্টিন ইত্যাদি ফল অসময়ে অধিক মূল্য দিয়া আনা হইত, আর তিনি ভক্তদের মন রাখার জন্য সামান্য অংশ মাত্র নিজের জন্য রাখিয়া বাকী সমস্তই খুড়াকে খাইতে দিতেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া কেহ আপত্তি জানাইলে মা বলিয়াছিলেন, 'আমরা এখনো অনেক দিন পৃথিবীতে থাকব, অনেক খাবার সময় হবে। কিন্তু খুড়ো আর কদিন? ওর তো হ'য়ে এসেচে। ওর বাসনা শেষ ক'রিয়ে দেওয়াই ভাল।' [আ]

কলিকাতায় অবস্থান-কালে শ্রীশ্রীমা সাধারণতঃ পালকিতে করিয়া একদিন অন্তর গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। পায়ের বাত এবং ম্যালেরিয়ার জন্য তিনি বরাবরই একদিন অন্তর স্নান করিতেন। বাগবাজার-ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বাস-কালে তিনি প্রথম প্রথম পালকিতে করিয়া গণেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্নান করিতে যাইতেন; পরে নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের গাড়ী হইলে সেই গাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। মাঝে মাঝে ঐ গাড়ীতে কিংবা ললিত চাটুজ্যের গাড়ীতে করিয়া তাঁহাকে আলিপুর, মিউজিয়াম, গড়ের মাঠ ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইত। ইহার চারিপাঁচ বৎসর পরে তিনি যখন বাগবাজারে তাঁহাব নিজবাটীতে বাস করিতেন, তখন গোলাপ-মার সঙ্গে খিড়কির দরজা দিয়া পায়ে হাঁটিয়া গঙ্গায় যাইতেন।

১৩১২ সালে সম্ভবতঃ জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীশ্রীমা এই প্রথম বিষ্ণুপুরের পথে দেশে গমন করেন। গণেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত সঙ্গে লইয়া যান এবং আশুতোষ বিষ্ণুপুর হইতে জয়রামবাটীতে পৌঁছাইয়া দেন। ঐ বৎসর মাঘের প্রথম সপ্তাহে[১] তাঁহার রত্নগর্ভা জননী শ্যামাসুন্দরী মরদেহ

[১] স্বামী সারদানন্দের ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী, ১৩১২ সালের ১২ই মাঘের দিনলিপিতে লিখিত আছে: Asu went to Jairambati this morning with purchases for Didima's Sraddha.

ত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিত লোকে প্রয়াণ করেন। এইদিন সকালবেলা শিবোমণিপুব হইতে একটি স্ত্রীলোক তরকারী বিক্রয় করিবার জন্য জয়রাম-বাটীতে আসিয়াছিল। শ্যামাসুন্দরী তাহাব নিকট হইতে কিছু তরকারী ক্রয় করেন এবং জ্ঞাতি-সম্পর্কে নাতি কতিপয় বালকেব সঙ্গে হাস্যপরিহাস, নৃত্যগীত করিয়া স্বগৃহে আসিতে থাকেন। বালকেরা আরও আনন্দ করিবাব অভিপ্রায়ে পশ্চাৎ হইতে 'ঠাকুমা, ঠাকুমা' বলিয়া ডাকিতে থাকিলে, তিনি মুখ ফিবাইয়া 'কি ব'লবি বল্ না হে, আর আমাব দাঁড়াবার সময় নাই; পোড়াবমুখোবা আমাব বেহাবা হবি'—এই কথা বলিয়াই চলিয়া আসেন। [ই] বাড়ীতে আসিয়া দেখেন যে ঢেঁকিতে ধান ভানা হইতেছে। তিনি সেই ধান-ভানাব কাজে সাহায্য কবিতে থাকেন এবং কাজ শেষ হইলে শৌচে যান। শৌচ হইতে ফিবিয়া আসিয়া শরীরে অস্বস্তি বোধ কবিতে থাকায়, ঘবেব দাওয়ায় শুইয়া পড়েন এবং সজ্ঞানে কথাবার্তা কহিয়া বেলা দশটাব মধ্যে শেষ নিশ্বাস পবিত্যাগ কবেন।

শেষ সময়ে শ্রীশ্রীমা ও তাঁহাব ভক্ত-সন্তান আশুতোষ ব্যতীত অন্য কেহ শ্যামাসুন্দবীর নিকটে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি 'ভক্ত-নাতি' ও কন্যা 'সাক'র হাতেব গঙ্গাজল চাহিয়া খাইয়া বলিয়াছিলেন, 'কুমড়োর ঘ্যাট খেতে ইচ্ছে হয়।' সেইজন্য তাঁহাব শ্রাদ্ধে প্রচুব পবিমাণে কুমড়াব ঘ্যাট হইয়াছিল। আশুতোষ কলিকাতা হইতে তিনখানা গরুর গাড়ী বোঝাই কবিয়া তাঁহাব শ্রাদ্ধেব জন্য প্রচুব জিনিষপত্র লইয়া গিয়াছিলেন।

অন্তবঙ্গ-সেবক স্বামী যোগানন্দ, কনিষ্ঠভ্রাতা অভয়, খুল্লতাত নীলমাধব এবং জননী শ্যামাসুন্দবী—এই চারিজনেব দেহত্যাগে শ্রীশ্রীমা ডাক ছাড়িয়া সাধাবণ সংসাবী লোকেব মত ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

বাৎসল্য-রসময়ী শ্যামাসুন্দবী জগদম্বিকাকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া কেবল ভগবদ্ভক্তদিগকে নহে, সকল দেবদেবীকেও ঘবেব লোক জ্ঞান করিতেন এবং আজীবন ভক্ত-ভগবানের সংসার কবিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহার কথায় একদা বলিয়াছিলেন: আহা, আমার মা ছিলেন যেন লক্ষ্মী। সমস্ত বছর সব জিনিষটি পত্রটি গুছিয়ে টুছিয়ে রাখতেন; ব'লতেন, 'আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার। আমাব সারদা (স্বামী

ত্রিগুণাতীত) হয়তো কখন আসবে, যোগীন আসবে—এসব দরকার।' ভাল চালটাল যা পেতেন, সব ঠিকঠাক ক'রে রাখতেন ; ব'লতেন, আমি যতক্ষণ আছি, ব্রহ্মা আছেন, বিষ্ণু আছেন, জগদম্বা আছেন, শিব আছেন —সব আছেন। আমিও যাব, এঁরাও সঙ্গে সঙ্গে যাবেন। তোরা কি যত্ন ক'ত্তে পারবি? আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার।' [ধ] স্বামী গিরিজানন্দকে মা বলিয়াছিলেন : আমার মা শরৎকে খুব ভালবাসতেন। শরৎ আমেরিকা যাবে ব'লে আমার অনুমতি নিতে এসেচে। আমি তাকে আশীর্বাদ ক'রে বল্লুম, 'কোন ভয় নাই—ঠাকুর তোমাদের সর্বদা রক্ষা ক'চ্চেন।' শরৎ চলে গেলে মা আমাকে ব'লতে লাগলেন, 'হ্যাঁ মা সারু, তুই মা হ'য়ে কোন্ প্রাণে শরৎকে সাত সমুদ্র তের নদী দূরে পাঠালি? তোর প্রাণ কি কঠিন!'

সম্ভবতঃ ১৩১২ সালের শেষভাগে কলিকাতা আসিয়া শ্রীশ্রীমা বাগবাজারের পূর্বোক্ত ২-১ নম্বর বাড়ীতে কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে—১৩১৩ সালের ২৪শে আষাঢ়—ঠাকুরে বাৎসল্যরতি-সম্পন্না গোপালের মা গঙ্গাপ্রাপ্ত হন। মা তাঁহাকে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বাড়ীতে মাঝে মাঝে দেখিতে যাইতেন। শেষাশেষি একবার মেয়েদিগকে সঙ্গে লইয়া মা তাঁহাকে দেখিতে গেলে, 'কিগো বৌমা, এলি মা—এলি মা।' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গোপালের মা বলিয়াছিলেন, 'মা, তোমাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছিল।' [ই] গঙ্গাতীরে গোপালের মার অন্তিম শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া 'বৌমা' তাহাকে গলবস্ত্র হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন এবং কিছু মিষ্টি ও জল স্বহস্তে খাওয়াইয়া দেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

নিজবাটীতে শুভাগমন

১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তাঁহার আমন্ত্রণে ও বন্দোবস্তে কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমা বসু-বলরাম-ভবনে কিছুদিন বাস করেন। দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া এই সময়ে তাঁহার শরীব অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল এবং তখনও জ্বব হইতেছিল। শুনা যায়, গিরিশবাবুব পূজা করিবাব কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, মা-দুর্গা স্বপ্নে দেখা দিয়া পূজা করিতে বলেন এবং তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও চণ্ডীমণ্ডপ উজ্জ্বল কবিয়া বসেন। কাজেই গিরিশবাবু সেই বৎসব পূজা না করিয়া পারিলেন না। সিন্ধুনাথ পাণ্ডা লিখিতেছেন ঃ "সপ্তমীর দিন বেলা প্রায় এগারটার সময় গিরিশবাবুর বাড়ীতে আমি এই প্রথম শ্রীশ্রীমাব দর্শন লাভ করি। সেই সময়ে তাঁহার জ্বর ছিল। মহাষ্টমীর দিনও জ্বরে কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া, রাত্রে সন্ধিপূজার সময়ে মা আর আসিবেন না স্থিব হইয়াছিল, কিন্তু পূজার অব্যবহিত পূর্বে নিজেই আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং গভীর রাত্রে অন্যান্য স্ত্রী-ভক্তদের সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া খিড়কির দরজায় আঘাত করিয়া বলিলেন, 'আমি এসেচি!'

"গিরিশবাবু উপরে বৈঠকখানায় ভক্তদের সঙ্গে বসিয়াছিলেন; মা আসিলেন না এই অভিমানে সন্ধিপূজার সময় চণ্ডীমণ্ডপে যান নাই। এমন সময় সাড়া পড়িয়া গেল, মা আসিয়াছেন! সকলে তাড়াতাড়ি চণ্ডীমণ্ডপে ছুটিয়া গেলেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে যাইয়া দেখি, দেবী-মূর্তির সম্মুখে, উত্তরপশ্চিমের কোণটিতে মা প্রতিমার উপর নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া দণ্ডায়মানা—সমাধিস্থা; ভক্তগণ রাশীকৃত ফুল ও বেলপাতা লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতেছেন। সকলের দেখাদেখি আমিও অঞ্জলি দিলাম এবং অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। গিরিশ-

বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া উল্লাসপূর্ণ গদ্‌গদস্বরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিলেন, 'আমি তো ভেবেছিলুম, আমার পূজোই হল না। এমন সময় দরজায় ঘা দিয়ে ডাকচেন, 'আমি এসেচি' !"

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিনদিনই পূজার সময়ে শ্রীশ্রীমা গিরিশবাবুর বাড়ীতে আসিয়া সমবেত ভক্তমণ্ডলীর পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৺কালীপূজার পরে, ২৪শে কার্তিক তিনি জয়রামবাটী যাত্রা করেন। [দি]

* * * *

ঠাকুরের জন্মমহোৎসব তাঁহারই জন্মস্থানে করিবার অভিপ্রায়ে কাঁকুড়-গাছি যোগোদ্যানের স্বামী যোগবিনোদ কলিকাতা হইতে বহু ভক্তকে সঙ্গে লইয়া ১৩১৫ সালে ফাল্গুনের শেষভাগে কামারপুকুরে আসেন। শ্রীশ্রীমাকে জয়রামবাটী হইতে কামারপুকুরে লইয়া আসা হয়। তাঁহার উপস্থিতিতে উৎসবটি সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ও বিশেষ আনন্দদায়ক হইয়াছিল।

শ্যামাসুন্দরীর দেহরক্ষার পর হইতে শ্রীশ্রীমাই প্রকৃতপক্ষে সহোদরগণের সংসারে অভিভাবিকা হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে বৈষয়িক স্বার্থ-জনিত বিরোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তিনি তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে বিষয় বিভাগ করিয়া দিবার জন্য স্বামী সারদানন্দকে আহ্বান করেন। মার পত্র পাইয়াই সারদানন্দ-মহারাজ স্বামী ভূমানন্দকে সঙ্গে লইয়া জয়রাম-বাটীতে গমন করিলেন। গৃহাদি বণ্টন করিবার সময় যখন মাকে তিনি কোন্ ঘরে থাকিতে ইচ্ছা করেন জিজ্ঞাসা করা হইল, মা বলিয়া পাঠাইলেন,ঠাকুর ব'লতেন, ইঁদুর গর্ত করে,সাপ সেই গর্তে থাকে।···দুদিন প্রসন্নের ঘরে, দুদিন কালীর ঘরে থাকব।'[1] বিভাগকর্তারা আর কথা না কহিয়া, মা যে ঘরখানিতে থাকিতেন তাহা প্রসন্নকুমারের ভাগে ফেলিয়া দিলেন। এই বিষয়বিভাগ-কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর মা কলিকাতায় শুভাগমন করিলেন।

ঠাকুরের তিরোভাবের পর আজ ২৩ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীমাকেও ইতোমধ্যে বহুবার কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে হইয়াছে,

---

[1] স্বামী ভূমানন্দ প্রণীত 'স্বামী সারদানন্দ'।

কিন্তু ভাড়াটে বাড়ীতে কিংবা গৃহস্থভক্ত-বাড়ীতে ব্যতীত নিজস্ব গৃহে তাঁহাকে আনিয়া রাখা সন্ন্যাসী সেবকেব পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। আর তাহাতে বহু অসুবিধাও ভোগ করিতে হইয়াছে। ভাড়াটে বাড়ীতে রাখা বহুব্যয়সাধ্য, অথচ গঙ্গার নিকটবর্তী স্থানে ইচ্ছানুরূপ বাড়ীও সকল সময়ে পাওয়া যাইত না। নানা কারণে গৃহস্থ-বাড়ীতে মাকে অধিকদিন রাখা সম্ভবপর ছিল না। ইদানীং মার সঙ্গে দুইচারি জন আত্মীয়স্বজন সবদাই থাকিতেন এবং কলিকাতা ও দূরবর্তী স্থানসমূহ হইতে আগত ভক্তেরা প্রায় নিত্যই তাঁহার দর্শনার্থী হইতেন বলিয়া গৃহস্থ-বাড়ীতে বাসের পক্ষে আরও অসুবিধা হইত। মার স্বচ্ছন্দে কলিকাতা-বাসের সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য স্বামী সারদানন্দ নিজের দায়িত্বে প্রায় এগার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কেদারদাস-প্রদত্ত চারিকাঠা জমির উপরে এতদিনে নিজস্ব বাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন।[২] এখানে উদ্বোধন-আপিসের কার্য পরিচালিত হইলেও, ইহা মায়ের জন্য নির্মিত মায়েরই বাড়ী। ১৩১৬ সালের ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে মা সবপ্রথম এই নবনির্মিত গৃহে পদার্পণ করিলেন। [দি] শ্রীশ্রীসারদামাতার উদ্দেশ্যে রচিত ভবনে তাঁহাকে আবাহন ও আনয়ন করিয়া সারদানন্দের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি নিজেকে মার বাড়ীর দারোয়ান মাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহারই তৃপ্তিবিধানের জন্য সকল কাজ পূর্বে যেমন করিতেছিলেন তেমনই করিয়া যাইতে লাগিলেন; কেবল তাঁহার কর্মশক্তি যেন অদম্য উৎসাহে বহুগুণে বর্ধিত হইয়া তাঁহাকে সর্বত্র জয়শ্রী-মণ্ডিত করিয়া তুলিল।

বহু স্বজন ও ভক্তগোষ্ঠী-পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীমার সেবাকার্য সারদানন্দ-মহারাজ কিরূপ যোগ্যতার সহিত নিষ্পন্ন করিতেন, সেই সম্বন্ধে অনেক কথা তদীয় জীবনী-গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্বামী অরূপানন্দের

---

[২] ইহার বহুপূর্বে, বেলুড়ে রামলোচন সাহার ঘাটের নিকটে, বলার মার শ্মশানের সম্মুখে, শ্রীশ্রীমার বাড়ী করিবার জন্য খানিকটা জমি ক্রয় করা হইয়াছিল। মঠ যখন নীলাম্বরবাবুর বাগানে সেই সময় মাকে ঐ জমি দেখাইতে লইয়া যাওয়া হয়। শ্মশানের গন্ধ আসে বলিয়া তিনি ঐ স্থান অপছন্দ করেন। [গ]

সঙ্গে কথাবার্তায় মা স্বয়ং তাঁহার এই সেবাধিকার কিরূপ কীর্তন করিয়াছেন দেখুন: "শরৎ যে কদিন আছে, আমার ওখানে [কলিকাতায়] থাকা চলবে। তারপর আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে, দেখি না। যোগীন ছিল; কেষ্টলালও আছে [৩]—ধীর স্থির, যোগীনের চেলা। গণেনও খানিকটা পাবে। শরৎটি সর্বপ্রকারে পাবে—শরৎ হ'চ্চে আমার ভারী। রাখাল শরৎ টরৎ এরা সব আপনার শরীর থেকে বেরিয়েচে [অর্থাৎ অন্তরঙ্গ]।" "মহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] পারেন না?" "না, রাখালের সে ভাব নয়—ঝঞ্ঝাট বইতে পাবে না: মনে মনে পাবে, কি কারুকে দিয়ে করাতে পারে—রাখালের ভাবই আলাদা।" "বাবুরাম-মহারাজ?" "না সেও পাবে না।" "মঠ চালাচ্চেন যে?" "তা হোক; মেয়ে-মানুষের ঝঞ্ঝাট! দূর থেকে খবর নিতে পাবে, 'কেমন আছেন?' কি কখন হয়তো মনে পড়ল, 'মা কেমন আছেন?' এই বাধুর বিয়ের কথা—এটি আমার বোঝা। অনেক ভক্ত সাহায্য ক'ত্তে পারে, দশ হাজার টাকাও দিতে পারে, আপন মায়ের বোঝা কে মনে ক'চ্চে? আপনার জন কটি আর?—দুচারটি। ঠাকুর ব'লেছিলেন, 'কটিই বা অন্তরঙ্গ?'" [গ]

এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমার উক্তি-সম্বলিত আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন: আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৌরীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া তাহার দীক্ষার জন্য কলিকাতায় মার কাছে যাই। মা নিজের শরীর অসুস্থ বলিয়া কিছুদিন পরে আসিতে বলেন, কিন্তু আমরা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেইদিনই দীক্ষা দিবার জন্য একেবারে নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিয়া বসি। তাহাতে মা বলেন, 'আচ্ছা, শরতের কাছে যাও, সে যা ব্যবস্থা ক'রবে, তাই হবে।' আমি বলিলাম, 'আমরা

---

[৩] স্বামী ধীরানন্দ। স্বামী যোগানন্দ যেকালে কলিকাতায় শ্রীশ্রীমার তত্ত্বাবধান করিতেন, কৃষ্ণলাল-মহারাজ তাঁহার সহকারী ছিলেন। শুদ্ধাভক্তির সাধক ও হৃদয়বান এই সন্ন্যাসীর উচ্চ আধার ও আধ্যাত্মিক অধিকার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা, স্বামিজী, ব্রহ্মানন্দ-মহারাজ সকলেই কিছু-না-কিছু বলিয়া গিয়াছেন। মঠে সমাগত ভক্তগণের মঙ্গলসাধনে তিনি স্বামী প্রেমানন্দের অনুগামী ছিলেন।

আর কাকেও জানি না, এক আপনাকেই জানি—আপনাকে দিতেই হবে।' মা বলিলেন, 'বল কি? শরৎ আমার মাথার মণি! সে যা ক'রবে, তাই হবে।' অগত্যা আমরা শরৎ-মহারাজের কাছে যাইয়া দীক্ষার প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু তিনিও মার শরীর অসুস্থ বলিয়া আপত্তি জানাইলেন। তখন মা যেসকল কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে নিবেদন করিলাম। তিনি কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, 'মা এই কথা বলেচেন? আচ্ছা তোমরা অমুক দিন প্রস্তুত হয়ে আসবে।'

শ্রীশ্রীমা তাঁহার যোগ্যতম সেবককে এত করিয়া মান দিলেও অন্তরের কি যে অপূর্ব দৈন্য লইয়া জগন্মাতার এই বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করিতেন, নিম্নোক্ত ঘটনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। সুরেন-বাবু বলেন: একদিন উদ্বোধন কার্যালয়ের ছোট ঘরটিতে বসিয়া শরৎ-মহারাজ লীলাপ্রসঙ্গ লিখিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় আমি ঘরে ঢুকিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমাকে যে এত বড় প্রণামটা করচ, এর মানে কি, বল তো?' আমি বলিলাম, 'সে কি মহারাজ, আপনাকে করব না তো কাকে করব?' তিনি বলিলেন, 'তুমি যাঁর কাছে যাও ও যাঁর কৃপা পেয়েচ, আমিও তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছি। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে এখনই আমার এই আসনে বসিয়ে দিতে পারেন!'

* * * *

বর্ত্তমান উদ্বোধন লেনের ১ নম্বর বাটীতে নিজগৃহে শ্রীশ্রীমা এইবার প্রায় ছয়মাস বাস করেন। এখানে জ্যৈষ্ঠমাসে তাঁহার পানিবসন্ত হইয়াছিল। উহা সারিয়া যাইবার পর গাড়ীতে করিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে গড়ের মাঠ ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইত। একদিন তিনি রামরাজাতলায় গিয়া ঠাকুর দর্শন করেন ও ফিরিবার পথে রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষের বাড়ী হইয়া আসেন। সেবকের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া অবশেষে তিনি ৩০শে কার্তিক জয়রামবাটী যাত্রা করিলেন। [দি]

ঊনবিংশ অধ্যায়

মা

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

জগৎ-কারণকে 'মা' বলিয়া ডাকা এবং সকলের ভিতর সেই মাতৃরূপিণীকে দেখা এই যুগের বিশিষ্ট আদর্শ যাহা ঠাকুর নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে মাতৃভাবের বিস্তার করিতে হইলে এমন একটি মাতৃমূর্তির প্রয়োজন, যাঁহাকে সকল মানুষ নিঃসঙ্কোচে 'মা'-নামে সম্বোধন করিতে পারে—যাঁহার অভয় কোলে আশ্রয় লইয়া পাপ-তাপপূর্ণ সংসারের সকল জ্বালা নিঃশেষে ভুলিতে পারে।

কথাপ্রসঙ্গে উমেশবাবু শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'মা, ঠাকুরের অপ্রকট হওয়ার পর আপনি যেমন সংসারে থেকে লোককে শিক্ষাদীক্ষা দিচ্চেন, আর আর অবতারে তো শক্তিরা এরূপ কাজ করেচেন বলে শোনা যায় না; আর আর অবতারে কেবল তাঁদের পার্ষদ ভক্তেরাই লোকশিক্ষা দিয়েচেন—এই নূতনত্বের কারণ কি?' তাহাতে মা উত্তর দেন, 'বাবা, জান তো, ঠাকুর সকলের ভিতর মাকে দেখতেন; সেই মাতৃভাব জগৎকে শেখাবার জন্যে এবার আমাকে রেখে গেছেন।'

ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, যৌবনে পতি সহ মিলিত হইয়া অন্যের পরামর্শে, শ্রীশ্রীমা একটি সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন; ঐ সময়ে তাঁহার হৃদয়স্থিত মাতৃভাব উন্মেষিত হইতেছিল, বলা যাইতে পারে। ঠাকুরের ভক্ত-সন্তানগণের সেবার মধ্য দিয়া উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার তিরোভাবের পর উত্তরোত্তর বর্ধিত হইলেও, উহার পূর্ণ পরিণতি সংশয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, তেমন মায়িক অবলম্বনের অভাববশতঃ মা চেষ্টা করিয়াও দেহের উপর মন সুস্থির করিতে পারিতেছিলেন না। দৈবনির্দেশে রাধারাণীর প্রতিপালন-ভার গ্রহণ করায় যখন সেই অভাব দূরীভূত হইল,

তখন হইতে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন বিশেষভাবে এক অশ্রুতপূর্ব অ-মায়িক মাতৃত্বের কিরণে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সহস্র সহস্র পুত্রকন্যা সেই অপার্থিব স্নেহরসাস্বাদে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, এখনও হইতেছে এবং পরেও হইতে থাকিবে।

অহর্নিশি সন্তানগণের ঐহিকপারত্রিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা; দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর শরীরের অত্যাবশ্যক বিশ্রামটুকুর বিনিময়ে সময়ে-অসময়ে দূরদূরান্তর হইতে আগত সন্তানদিগকে রন্ধনাদি করিয়া ভোজন করানো, তাহাদের আব্দারসকল, অনেক সময়েই অবিবেচনা-প্রসূত হইলেও, বিনা প্রতিবাদে পূর্ণ করা; কেহ বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছে দেখিলে অলক্ষিতে নিজ দেহে তাহার পাপতাপ আকর্ষণ ও অনিবার্য ফলস্বরূপ নিদারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগ, এইরূপে সর্বতোভাবে আপনার করিয়া লইয়া নিজের ত্যাগময় সহনশীলতাময় জীবনাদর্শে তাহা-দিগকে অনুপ্রাণিত করা, শুধু তাহাই নহে, যাহাতে তাহারা চিরকালের জন্য ত্রিতাপজ্বালার মূল কারণ অবিদ্যা ও তন্নিবন্ধন জন্মমৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে মায়াপারের একক নায়িকা গুরু-শক্তির আশ্রয় দান—সংক্ষেপে ইহাই জগতে শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মাতৃ-ভাবের বিকাশ।

উপরিধৃত কথাগুলির মধ্যে যে অনুমাত্র অত্যুক্তি নাই তাহা শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্য ও সমাগত সন্তানগণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহায্যে বুঝাইতে প্রয়াস পাইব। ইহার ফলে যদি সেই মানবীরূপিণী দেবীর চরিত্র কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, যদি সেই মাতৃমূর্তি বিকৃত অথবা পক্ষপাত-দোষযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, মাতৃভক্ত উদার পাঠক! তাহা হইলে আমাদের অহমিকা-প্রসূত বুদ্ধির দোষে, বুঝিবার ত্রুটিতে এবং এবম্বিধ সহস্র অপূর্ণতার জন্যই ঐরূপ হইয়াছে জানিও। আর যদি তাহা না হয়, তোমার বুঝিতে বিলম্ব হইবে না,—কেন তাঁহার ভক্ত সন্তানগণের অনেকেই তাঁহাকে পাইয়া নিজ নিজ পার্থিব জননীর অভাব বিস্মৃত হইয়াছিল এবং সকল জননীর সমষ্টিরূপা জগজ্জননী জ্ঞানে তৎপদে হৃদয়ের ভক্তি-প্রীতি ঢালিয়া দিয়াছিল; কেনই বা অপরে পার্থিব জননীর মধ্যে তাঁহারই

আংশিক প্রকাশ বুঝিতে পারিয়া নিজ নিজ গর্ভধারিণীর সেবায় অধিকতর অবহিত হইয়াছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, জগতের ইতিহাসে এই মাতৃমূর্তি নিরুপমা—কলির প্রভাববশে মাতৃভক্তিহীন পাপ-মলিন সংসারে সন্তপ্ত সন্তানগণকে অভয়কোলে আশ্রয় দিবার জন্য মাতৃ-ভক্তির প্রচারক শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান-গঠিতা মানসী প্রতিমা।

৺বৃন্দাবন হইতে প্রথমবার ফিরিয়া শ্রীশ্রীমা যখন কামারপুকুরে বাস করিতেন, তখন সন্তানের অভাবজনিত চিন্তায় এক এক সময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। একদিন ঠাকুর তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, 'তুমি ভাবচ কেন? তুমি একটি ছেলে চাচ্চ, আমি তোমাকে এইসব রত্ন-ছেলে দিয়ে গেলুম। কালে কত লোকে তোমাকে মা, মা ব'লে ডাকবে।' [গ] ঐ সময়ে একাকী থাকার ফলে, 'মা'-ডাক শুনিতে না পাইয়াই যে তিনি প্রাণে বিষম অভাব অনুভব করিতেছিলেন তাহা ঠাকুরের শ্রীমুখোক্ত কথা হইতেই বুঝা যায়। তাঁহার এই মাতৃত্বের কামনা—এই 'মা' ডাক শুনিবার বাসনা কিরূপ গভীর অথচ সীমাহীন ছিল সেই সম্বন্ধে এই একটিমাত্র ঘটনা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, একবার শিলং হইতে কতিপয় ভক্ত[১] সন্তান তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলে মা ভানুপিসীকে বলিয়াছিলেন, 'ওদের মতন যেন জন্মে জন্মে আমার ছেলে হয়!'

সমীপাগত সন্তানেরা শ্রীশ্রীমার বিশিষ্ট স্নেহের ভাগী হইলেও তাঁহার মাতৃভাব-রূপ স্ব-ভাব সংকীর্ণ দেশে সীমাবদ্ধ ছিল না এবং কেহই এই মাতৃ-হৃদয়ের শুভকামনা হইতে বঞ্চিত হইত না। স্বামী তারকেশ্বরানন্দ লিখিতেছেন: কোনও কারণে জনৈক স্বদেশসেবককে মা বলিয়াছিলেন, 'ত্যাখ, তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে [বিলাতের লোকদের সহিত] যে যা ইচ্ছে কর, কিন্তু তারাও তো আমার ছেলে বটে!' একবার ৺জন্মাষ্টমী-মহোৎসবে কাঁকুড়গাছিতে যাইবার জন্য তথাকার ভক্তেরা মাকে বিশেষ অনুরোধ করে; তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া মাও যাইতে সম্মত হন। কেহ কেহ তাঁহার যাওয়া সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতে থাকিলে মা বলিয়াছিলেন,

---

১ স্বামী জগদানন্দ, শ্রীশচন্দ্র ঘটক প্রভৃতি।

'তোমাদের ঝগড়া বাপু, আমি কি ওদের মা নই?' সেদিন তিনি কাঁকুড়-গাছি গিয়াছিলেন। [আ] শ্রীশচন্দ্র ঘটক যখন মহাযুদ্ধ-বিরতির সংবাদ মাকে জানাইলেন, মা পতিপুত্রহীনাদের দুঃখ যেন মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছেন এমনি সমবেদনা ও করুণা তাঁহার মুখের ভাবে ও কথায় ব্যক্ত হইল। শ্রীশশিভূষণ ঘোষ বলেন : আমার একটু অভিমান হইয়াছিল যে, মা আমার সঙ্গে গল্প করেন না। তিনি আমার মন বুঝিয়া, তখনই ডাকিয়া আদর করিয়া কাছে বসাইলেন এবং দেশের কথা আলাপ করিতে লাগিলেন। লোকের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনিয়া তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিল। তাঁহার কাছে দেশের প্রত্যেক জনহিতকর কাজই ঠাকুরের কাজ জ্ঞান করিতে শিখিয়াছি। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ লিখিতেছেন : বাগবাজারে মার বাড়ীতে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছি; মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁগো, তোমার বাড়ী কোথায়?' আমি বলিলাম, 'পূর্ববঙ্গে।' তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের দেশে কেমন ধান হ'য়েচে?' আমি বলিলাম, 'ভাল ধান হয় নাই।' তখন তিনি দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'শুনলুম, পাঞ্জাবে নাকি ফসল হয়নি, আর আর জায়গায়ও হয় নি, হায় ঠাকুর! লোকের দশা কি হবে?' ডাক্তার কাঞ্জিলালের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'মা, আশীর্বাদ করুন, আপনার ছেলের যেন উপায় হয়।' মা তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'বৌমা, এমন আশীর্বাদ ক'রব আমি,—সকলের অসুখ হোক, কষ্ট পাক? আমি তো তা ক'রব না মা; সকলে ভাল থাক, জগতের মঙ্গল হোক মা!' [ই] পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া উঠিয়া জগন্মাতার উদ্দেশ্যে করযোড়ে প্রণাম করিয়া মাকে বলিতে শুনা যাইত, 'মা জগদম্বে! জগতের কল্যাণ কর।'

১২৯৩ সালে ৺বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের আদেশে স্বামী যোগানন্দ মহারাজকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন। জগতের সমক্ষে ইহা তাঁহার গুরুভাবের প্রথম প্রকাশ বলা যাইতে পারে। এই প্রকাশ অতি ধীরে বর্ধিত হইয়া ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং দীক্ষাপ্রার্থী ভক্তগণের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। শেষের প্রায় দশ বৎসর ভক্তের ভিড় এমনই বাড়িয়া উঠে যে, তাঁহার আহার-নিদ্রার অতিমাত্রায় ব্যাঘাত হইতে থাকে

ও শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। সংসারের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া যাহারা উহা হইতে উদ্ধারের পথ পাইবার আশায় তাঁহার পাদমূলে ছুটিয়া আসিত, তাহারা এখানে আসিয়া দেখিত,—স্নেহ-প্রেম-করুণায় গঠিতা এক অপূর্ব মাতৃমূর্তি তাহারা আসিবে বলিয়া পথের পানে চাহিয়া আছেন; গ্রীষ্মতপ্ত হইয়া ঘর্মাক্ত-কলেবরে পৌঁছিবামাত্র হয়তো পাখা আনিয়া স্বহস্তে বীজন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; রাস্তায় আসিতে কষ্ট হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিয়া কত কথা কহিতেছেন; তারপরে জলখাবার খাইতে দিয়া তাহাদের জন্য আহার্যের ব্যবস্থা করিতে ত্বরান্বিতা হইতেছেন। মন্ত্র-দীক্ষা এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনানুসারে উপদেশাদি দানের কার্যও অবশ্য পরে যথাকালে অনুষ্ঠিত হইত। সমীপাগত ভক্ত-সন্তান বিস্মিত হইয়া দেখিতে ও মর্মে মর্মে অনুভব করিত, ইনি কেবল ঈশ্বরের পথনির্দেশকারিণী গতি-মুক্তি-বিধায়িনী গুরু নহেন, পরন্তু এক অপূর্ব স্নেহশীলা জননী! শ্রীশ্রীমার গুরু-ভাবটিকে সেইজন্যই তাঁহার মাতৃভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারা যায় না। যিনি মা তিনিই গুরু—তাঁহার মাতৃত্ব যেমন সর্বপ্রকার মোহবর্জিত, তাঁহার গুরুমূর্তিও তেমনি সমধিক মহিমান্বিত।

যাহা হউক, তাঁহার গুরুভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দানের কথা যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া ভিন্ন অধ্যায়ে বলিবার চেষ্টা করিব। এখানে তাঁহার অতুলনীয় মাতৃস্নেহ বাহিরে কিভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে কতিপয় ঘটনায় তাহারই একটি অসম্পূর্ণ চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। 'কতিপয় ঘটনায়' বলিতেছি এই জন্য যে, ঐরূপ ঘটনা প্রায় নিত্যই ঘটিত বলিয়া তাহাদের উপযুক্ত সংখ্যা সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। আর বিভিন্ন-সংস্কার-বিশিষ্ট সহস্র সহস্র পুত্রকন্যা যাঁহার স্নেহসুধা-পানে পরিতৃপ্ত এবং তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই যাঁহার ব্যবহারগত পার্থক্য রহিয়াছে, তাঁহার স্নেহাভি-ব্যক্তির সম্পূর্ণ চিত্র কে অঙ্কন করিতে পারে!

* * * *

ভক্ত-চূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ একদিন শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি রকম মা?' অমনি মা উত্তর দেন, 'আমি সত্যি মা। গুরুপত্নী নয়, পাতান মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্যি জননী।'[২] গিরিশবাবু

তাঁহার স্নেহের পরিচয় জীবনে নানাভাবে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি ঘটনা তাঁহার জীবনী-গ্রন্থ[৩] হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিতেছেন: একদিন দেখিলাম মাতাঠাকুরাণী সাবান, বালিশের ওয়াড় ও বিছানার চাদর লইয়া নিকটবর্তী পুকুর-ঘাটের দিকে যাইতেছেন। রাত্রে শয়ন করিবার সময় দেখি, আমার বিছানা সাদা ধপ্‌ধপ্‌ করিতেছে। একার্য মায়েরই বুঝিয়া কষ্টও হইল, আবার মার অপার স্নেহের কথা ভাবিয়া হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল।

১৩১১ সালে রথযাত্রার সময় ইটালি শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের ভক্তেরা শ্রীশ্রীমাকে আমন্ত্রণ করিয়া তথায় লইয়া যান। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় স্বরচিত একটি সঙ্গীত[৪] ছোট ছেলেদের দ্বারা গান করাইয়া মাকে শুনাইয়াছিলেন। মা অশ্রু বিসর্জন করিতে কবিতে বালকগণকে কোলে টানিয়া লইয়া আশীর্বাদ করেন এবং তাহাদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথের হাতে তুইটি টাকা দেন। সেদিন তিনি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ওখানকার ভক্তগণকে বিশেষভাবে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।[৫]

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় বলেন: "শৈশবে পিতামতা ইহলোক ত্যাগ করায় পিসা-মহাশয় আমাকে প্রতিপালন করেন। ভক্ত-সঙ্গ, কথামৃত-পাঠ ইত্যাদির ফলে ঠাকুরের কথা জানিতে পারিয়াছিলাম। তুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া ডাক্তারি পড়িতে যখন কলিকাতা যাই, তখন বিশ একুশ বৎসর বয়স। শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আছেন, কোনরূপে জানিতে পারিয়া একদিন তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তদবধি চারিবৎসব কাল, মা কলিকাতায় থাকিলে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতাম। হ্যারিসন রোড হইতে পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইত—অর্থ-সম্বল ছিল না। সেখানে পৌঁছিয়া বেশী ভক্তের ভীড় দেখিলে নীচে বসিয়া থাকিতাম এবং লোক কমিলে মাকে প্রণাম করিতে উপরে যাইতাম। তাঁহার সঙ্গে কখন

---

[২] ব্রহ্মচারী প্রকাশ সঙ্কলিত 'স্বামী সারদানন্দ'। [৩] শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'গিরিশচন্দ্র'। [৪] 'এল তোর তুষ্টু ছেলে, তুষ্টু করে নে মা কোলে।' [৫] ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার প্রণীত 'মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ।'

কখন সামান্য কথাবার্তাও হইত। একদিন ক্লান্ত হইয়া ঘামিয়া উপরে গিয়াছি, মা তাড়াতাড়ি একখানি পাখা হাতে নিয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন। আমি নিষেধ করিলেও তাহা শুনিলেন না, আমাকেও হাওয়া করিতে দিলেন না ঃ বলিলেন, 'না বাবা, তুমি ব'স, আমি হাওয়া করি।'

"আর একদিন বিকালে তিনচারিটার সময় গিয়াছি, মা প্রসাদী দুধভাত রাখিয়াছিলেন, আনিয়া খাইতে দিলেন। জীবনে কখন মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাই নাই, হঠাৎ কেমন ভাবান্তর হইল ও বলিয়া ফেলিলাম, 'না, খাব না—খাইয়ে না দিলে খাব না।' মা পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া খাওয়াইতে বসিলেন। তখনও বলিলাম, 'না, খাব না, মুখে ঘোমটা দিয়ে খাওয়ালে খাব না।' মা তখন মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিলেন এবং খাওয়াইতে খাওয়াইতে, কোথায় আমার বাড়ী, এখানে কি করি, ইত্যাদি কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।"

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ বলেন ঃ জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা-গ্রহণের পরে ঘরের ভিতর খাইতে বসিয়াছি ; আমাকে খাইতে দিয়া মাও খাইতে বসিয়াছেন। কথাবার্তা চলিতেছে, আর মাঝে মাঝে পাত হইতে প্রসাদ তুলিয়া লইয়া মা আমার পাতে দিতেছেন। খাওয়া শেষ হইলে যখন আমি উচ্ছিষ্ট পাথর, বাটি ইত্যাদি তুলিয়া লওয়ার উপক্রম করিতেছি মা আমাকে উহা করিতে নিষেধ করিলেন এবং আমি নিবৃত্ত না হওয়ায় তাঁহার বাম হাত দিয়া আমার ডান হাত ধরিয়া বলিলেন, 'ও কি ক'চ্চ?' আমি বলিলাম, 'আমার এঁটো বাসন ধুয়ে নিয়ে আসি।' মা বলিলেন, 'না, আমিই নেব।' আমি বলিলাম, 'তা কি হয়? আপনি নিলে আমার অকল্যাণ হবে।' তখন মা বলিলেন, 'ছাখ, মার কোলে ছেলে কত হাগে মুতে, আমি তোমার কি ক'ত্তে পেরেচি বাছা?'

জয়রামবাটীতে ভক্তেরা খাওয়ার পর শালপাতা উঠাইয়া স্থান পরিষ্কার করিতে যাইলে শ্রীশ্রীমা প্রায়ই বলিতেন, 'থাক্, লোক আছে।' তারপর নিজ হাতেই সেই সকল কাজ সম্পন্ন করিতেন। মার কাছে যেসকল স্ত্রীলোক থাকিতেন, তাঁহারা সকল বর্ণের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে চাহিতেন না, এবং মাকে অনুযোগ করিয়া বলিতেন, 'তুমি বামুনের মেয়ে—গুরু,

ওরা তোমার শিষ্য ; তুমি ওদের এঁটো নাও কেন ? এতে যে ওদের অমঙ্গল হবে ।' তাহাতে মা উত্তর দিতেন, 'আমি যে মা গো, মায়ে ছেলের ক'রবে না তো কে ক'রবে ?'

স্বামী কৈবল্যানন্দ বলেন : একবার মঠে ঠাকুরের সাধারণ উৎসবে আমি ও রাজেন দত্ত ভাণ্ডারী। অশোক-মহারাজ [জাতিতে কায়স্থ] যিনি নিত্যকার ভাণ্ডারে কাজ করিতেন, তিনিও সেইদিন আমাদের সহকারী হইয়াছেন। উৎসবের দিন মা কলিকাতা হইতে মঠে আসিয়া উপরের যে ঘরটিতে মহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] থাকিতেন, সেই ঘরে আছেন। কাজের ভিড়ে আমাদের এইটুকুও সময় নাই যে একবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসি। অশোক-মহারাজ কিন্তু 'ভাই, আমি একটু আসি'—এই বলিয়া আমাদের কাছে ছুটি লইয়া একেবারে মার কাছে যাইয়া উপস্থিত। মা তখন ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিতেছিলেন এবং কৃষ্ণলাল-মহারাজ কাছে থাকিয়া দেখাশুনা করিতেছিলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি অশোক, তুমি কিছু খেয়েচ ?' তিনি বলিলেন, 'না মা, কিছু খাই নি।' মা বলিলেন, 'তবে এস, এই বাটিটাশুদ্ধ তুলে নিয়ে যাও।' বাটি মার থালার সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে দেখিয়া অশোক-মহারাজ বলিলেন, 'না মা, আপনি বাটি থেকে হাতে করে তুলে দিন।' মা বলিলেন, 'তাতে কি, তুমিই নাও না।' অশোক-মহারাজ বাটি ধরিতে যাইতেই কৃষ্ণলাল-মহারাজ আপত্তি করিলেন। মা বলিলেন, 'ও যে ছেলে, নেবে বই কি। নাও অশোক, নাও।' অশোক-মহারাজ বাটিশুদ্ধ প্রসাদ লইয়া চলিয়া আসিলেন, আমরা তিনজনে আনন্দে ভাগ করিয়া খাইলাম।

আশুতোষ মিত্র বলেন : শ্রীশ্রীমার পানিবসন্ত হইয়াছিল, প্রায় সারিয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও অন্নপথ্য দেওয়া হয় নাই ; এমন অবস্থায় একদিন তাঁহার ডাঁটা-চচ্চড়ি খাওয়ার ইচ্ছা হয় ও আমার কাছে সেই ইচ্ছাটা প্রকাশ করেন। আমি বলিলাম, 'আমি গোপীনাথের (পাচক) কাছ থেকে এনে দিচ্চি।' মা বলিলেন, 'কেউ টের পাবে না তো ?' শালপাতায় করিয়া চচ্চড়ি আনিয়া দিয়াছি ; মা কয়েকটি ডাঁটা চিবাইয়া ছিবড়াগুলি পাতার উপরেই রাখিয়াছেন এবং অবশিষ্ট তুইএকটি ডাঁটা মুখে দিয়াছেন,

এমন সময় গোলাপ-মা আসিয়া উপস্থিত। আমার পিছন দিক হইতে যেমন তিনি ঘরে ঢুকিতে যাইবেন, তাড়াতাড়ি এক হাতে ছিবড়াগুলি মুখে পুরিয়াই গিলিয়া ফেলিয়াছি এবং অন্য হাতে শালপাতাখানা লুকাইয়াছি। মাকে মুখ নাড়িতে দেখিয়া গোলাপ-মার সন্দেহ হইয়াছে; জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, কি খাচ্চ?' মা বলিয়া ফেলিলেন, 'দুটো ডাঁটা চিব'চ্চি।' 'ডাঁটা কে এনে দিলে?—আশু? এ তো ভাতে-ছোঁয়া জিনিষ—(চীৎকার করিয়া) শূদ্রের হাতে খাচ্চ?' 'তাতে কি? ভক্ত ছেলে—তাতে দোষ কি?' 'ছিবড়েগুলো গেল কোথায়? আশু খেয়ে ফেলেচে বুঝি? নরেনকে ঠাকুরের রক্তমিশানো গয়ার খেতে দেখে সকলেই খেয়েছিল।* আমিও ছিবড়ে খাব!' গোলাপ-মার সরলতায় মা হাসিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণী গোলাপ-মা মার মুখের অবশিষ্ট ছিবড়াটুকু খাইয়া সরিয়া পড়িলেন!

সুশীলাবালা দত্ত [জাতিতে বারুজীবী] বলেন: এক বৎসর জগদম্বা-আশ্রমে রাঁধুনী ছিল না। রুটি আমরাই করিয়া লইলাম, কিন্তু তরকারী কে রাঁধিবে, সমস্যা দাঁড়াইল। শ্রীশ্রীমা তখন রাধুর কাছে ভিন্ন বাড়ীতে ছিলেন; তথায় উপস্থিত হইয়া, আমি রাঁধিব কি-না এবং আমার হাতের রান্না তিনি খাইবেন কি-না, জিজ্ঞাসা করিলাম। মা বলিলেন, 'বেশ তো, রান্না কর না। তোমরা আমার মেয়ে।' আনন্দিত হইয়া চলিয়া আসিতেছি, এমন সময় কেদারের মা মাকে কহিলেন, 'তুমি বামুনের মেয়ে হ'য়ে এদের রান্না কেন খাবে? ঠাকুর না হয় সন্ন্যাসী ছিলেন, তুমি তো সন্ন্যাসী হও নাই?' মা আমাকে ডাকিয়া রাস্তা হইতে ফিরাইয়া বলিলেন, 'এদের জ্বালায় কিছু হবে না; এরা বারণ করে—এই রকম সব বলে। তুমি মনে কিছু কষ্ট কোরো নি; ঠাকুর যদি কখন সুযোগ দেন তো হবে।'

শ্রীপীতাম্বর নাথ বলেন: জয়রামবাটীতে আমি সকলের সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে ইতস্ততঃ করিতাম এবং গৌরী-মাকে সে কথা বলিয়াছিলাম।

---

* স্বামিজীর কাছে প্রশ্ন করিয়া আশুতোষ জানিতে পারেন যে, নিরঞ্জন-মহারাজ, শশি-মহারাজ ও শরৎ-মহারাজ এই তিনজন নির্বিকারচিত্তে ঠাকুরের রক্তমিশ্রিত গয়ার খাইয়াছিলেন।

গৌরী-মা বলিয়াছিলেন, 'গুরুগৃহে তোমরা সকলেই এক।' একদিন সকালে মা আমাকে বলিলেন, 'তুমি কি যুগী ব'লে সঙ্কোচ বোধ কর? তাতে কি বাছা, তুমি যে ঠাকুরের গণ—ঘরের ছেলে ঘরে এসেচ। তোমাকে কিছু না জিজ্ঞাসা ক'রেই মন্ত্র দিয়েচি, তাতে কি বুঝতে পার না যে তুমি আমাদের ঘরের ছেলে? পাড়াগাঁয়ে সামাজিক বাধা আছে ব'লে তুমি শঙ্কা কোরো নি—এখানে কেউ তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রবে না। গায়ে প'ড়ে পরিচয় দেবার দরকার কি?'

এস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, শ্রীশ্রীমা তাঁহার ভক্তসন্তান-মাত্রকেই ঠাকুরকে অন্নভোগ দেওয়ার অধিকার দিয়া গিয়াছেন। শ্রীরাজেন্দ্রলাল দে প্রমুখ অনেকেই তাঁহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া সম্মতি-সূচক উত্তর লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সুরমা রায়কে [জাতিতে বৈদ্য] মা লিখিয়াছিলেন, 'ভক্ত তাহার ঠাকুরকে ভালবাসিয়া যে ভাবে ইচ্ছা খাওয়াইতে পারে। ঠাকুর ভক্তের হাতে খাইবেন না তো কাহার হাতে খাইবেন?'

কি সুদৃঢ় স্নেহবন্ধনেই যে শ্রীশ্রীমা তাঁহার সন্তানদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন তাহা অন্যকে বলিয়া বুঝানো দুষ্কর। নিয়তির কুটিল বিধানে মার কোন সন্তান মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, স্থির করিয়াছেন। মা সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, 'ভয় কি বাবা, আমি আছি ঃ হেসে নেচে চ'লে যাও।' পরদিন প্রণামান্তে যখন সন্তানটি বিদায় লইবেন, মা সাশ্রুনয়নে কহিলেন, 'আমায় ভুলো না—ভুলবে না তা জানি, তবুও ব'লচি।' কাঁদিতে কাঁদিতে সন্তান জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, আপনি?' মা বলিলেন, 'মা কি কখন ভুলতে পারে ছেলেকে?' আঁচলে নিজের চক্ষু মুছিয়া মা পুনরায় কহিলেন, 'কলঘরে গিয়ে চোখমুখ ধুয়ে এস—কেউ না টের পায়।' [আ]

সিন্ধুনাথ পাণ্ডা লিখিতেছেন ঃ ৺বিজয়া দশমীর দিন বিকালে জয়রাম-বাটী হইতে কেদারের মার সঙ্গে কোয়ালপাড়া চলিয়া আসিব, স্থির করিলাম। কারণ আমি রাস্তা জানি না। যদি কেদারের মা সেদিন জয়রামবাটীতে থাকেন, তবেই আমার থাকা হয়। কেদারের মাকে থাকিবার জন্য অনুনয় করিয়া মা তাঁহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে

লাগিলেন। তিনি কিছুতেই থাকিবেন না, মাও ছাড়িবেন না। অবশেষে বহুক্ষণ সাধাসাধির পর তিনি সেই রাত্রির মত থাকিয়া গেলেন। পরদিন সকালে মাকে প্রণাম করিয়া একটি টাকা দিতে যাইতেই মা বলিলেন, 'টাকা দিতে হবে না, তুমি টাকা দিতে কোথা পাবে? আমি তোমার মেয়ের জন্যে দিলুম, তুমি নিয়ে যাও।' বিদায়-কালে মা প্রায় সেরখানেক সন্দেশ সঙ্গে দিলেন। কিছু রাস্তা যাইতে না যাইতে প্রবলবেগে কান্না আসিল ও কাঁদিতে লাগিলাম। পথে যাইতে যাইতে কিছু কিছু সন্দেশও খাইয়া চলিলাম; মা দিয়াছেন, খাইব না তো সেগুলির কি হইবে? কলিকাতায় আসিয়া বন্ধু কাঞ্জিলালকে অবশিষ্ট প্রসাদ দান করিলাম।

আশুতোষ মিত্র বলেন: গিরিশবাবুর বাড়ীতে ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমা যখন বলরামবাবুর বাড়ীতে ছিলেন, সেই সময়ে আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। ডাক্তার বিপিনবাবু সাগু-পথ্যের ব্যবস্থা করেন। শরৎ-মহারাজ ডাক্তারি ব্যবস্থা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার পক্ষপাতী, কিন্তু আমি সাগু একেবারেই খাইতে পারি না। প্রবল ক্ষুধা লইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছি: শরৎ-মহারাজ যখন খাইতে গিয়াছেন, মা লুকাইয়া রাধুর হাতে কিছু ফলমিষ্টি পাঠাইলেন, আহারের পর বিশ্রাম করিতে যাইয়া শরৎ-মহারাজ যখন ঘুমাইয়া পড়িলেন, তখন বাটিতে করিয়া একখানি রুটি, কিছু তরকারী ও মিষ্টি পাঠাইলেন; বিকাল-বেলা আবার চুপিচুপি পাশের ঘরে ডাকাইয়া লইয়া প্রচুর ফল ও কিছু মিষ্টি খাওয়াইলেন; এবং রাত্রিকালে, শরৎ-মহারাজের অনুপস্থিতিতে, যথেষ্ট পরিমাণে রুটি ও তরকারী পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময়ে বাড়ীর ভিতর হইতে ব্যবস্থা মত সাগুও আসিয়াছিল; পেটভরা রুটি খাইয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল এবং যাহাতে শরৎ-মহারাজ আসিয়া কিছু না বুঝিতে পারেন সেইভাবে রুটির বাটিটা সাগুর বাটির নীচে ফেলিয়া রাখিলাম। আমি যে প্রবল ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছি, সাগু একেবারেই খাইতে পারি না এবং রুটিই আমার প্রিয় খাদ্য—এই সমস্ত বিষয় মা কি করিয়া জানিলেন, বলিতে পারি না। কারণ, পরের বাড়ীতে মাকে কিছুই জানাইবার সুযোগ পাই নাই। এমনভাবে লুকাইয়া মা পরেও কতদিন খাওয়াইয়াছেন। প্রসাদ

দিবার সময় দেখিয়াছি, যে জিনিষটি খাইতে ভালবাসি, মুখে কিছু না বলিলেও, ঠিক সেই জিনিষটিই অধিক করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীকালীপদ রায় জয়রামবাটী হইতে কামারপুকুর ও আনুড় হইয়া কোয়ালপাড়া যাইবার জন্য রওনা হইতেছেন, এমন সময় কয়েকটি ভক্ত কাঁঠাল লইয়া উপস্থিত। মা দুঃখ করিয়া বলিলেন, 'এখন চলে যাচ্চে, এর কাঁঠাল খাওয়া হ'ল' না!' কালীপদবাবু সন্ধ্যার সময় কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিয়া দেখেন, মা কেদারের মার হাতে জয়রামবাটী হইতে কাঁঠাল পাঠাইয়া দিয়াছেন!

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন ময়নাপুর হইতে শ্রীশ্রীমার জন্য এক হাঁড়ি চিঁড়া পাঠাইয়া দেন—মা তখন কোয়ালপাড়ায়। দুইএক দিন পরেই তিনি জয়রামবাটী চলিয়া গেলে জনৈক সেবক মাথায় করিয়া চিঁড়ার হাঁড়ি জয়রামবাটী দিয়া আসিলেন। সপ্তাহকাল পরে পুনরায় যখন সেবকটি জয়রামবাটী গিয়াছেন, মা বলিলেন, 'তুমি চিঁড়ে ব'য়ে আনলে, সেদিন তোমাকে তাড়াতাড়িতে খেতে দিতে পাল্লুম নি, আমার মনে বড় কষ্ট হ'য়েচে, বাবা, তোমার জন্যে চিঁড়ে তুলে রেখেচি—তুমি খাও।' [ম]

স্বামী স্বরূপানন্দ (আশু-মহারাজ) বলেনঃ একবার জয়রামবাটীতে গিয়া আমার জ্বর হয়। মা ভাবিত হইলেন ও বলিলেন, 'তাইতো গো, ছেলেটির জ্বর হ'য়ে গেল।' মেজমামার বৈঠকখানায় শুইয়াছিলাম, সকালে উঠিয়া রাস্তায় আসিয়া বসিয়াছি; আমাকে দেখিয়া মা বলিলেন, 'কেমন আছ?' আমি বলিলাম, 'মা, ভাল আছি!' মা বলিলেন, 'রাত্রে আমারও জ্বর হ'য়েচে বাবা।' সেদিন রাত্রে মা নিজেই আমার জন্য রুটি খাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু প্রবলজ্বরে শয্যাশায়িনী হইলেন। রাত্রে যখন আমরা খাইতে বসিয়াছি, শুনিতে পাইলাম মা খবর নিতেছেন, 'আশু কি খেলে?'

শৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বাল্যকাল হইতে চা-পানে এমনই অভ্যস্ত ছিলেন যে, সকালে চা-পান না করিয়া কোন কাজই করিতে পারিতেন না। শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষাগ্রহণের পর নিজের অসহায় অবস্থা চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'মা, আমার যে ঘুম থেকে উঠেই চা খাওয়া অভ্যাস, কি হবে?'

মা স্মিতমুখে উত্তর দিলেন, 'বাবা, মা কি কখন সৎমা হয়? তোমার যেমন খুসী, আগে খেয়ে নিয়ে তারপরে জপধ্যান ক'রবে।'

কোয়ালপাড়া-মঠের সাধুরা সকালে কিছু না খাইয়া প্রায় দশটার সময় ঠাকুর-পূজা করিতেন। একদিন স্বামী বিদ্যানন্দকে শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 'তোমরা না খেয়ে পূজো কর, তাতে মন চঞ্চল হয়। পেট ঠাণ্ডা থাকলে মনটি ঠাণ্ডা থাকবে। তোমরা সকালে কিছু খেয়ে পূজো ক'রবে।' [ম]

আহার সম্বন্ধে স্বামী অব্যয়ানন্দকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, 'তোমরা নিরামিষ খাবে কেন? তোমরা মায়ের ছেলে, তোমরা মাছে দুধে খাবে। ওতে তোমাদের দোষ নাই।' নিরামিষ আহার করিতেন এমন অনেক ভক্ত-সন্তানকেই মা স্বহস্তে মাছ পরিবেষণ করিয়া খাওয়াইয়াছেন ও বলিয়াছেন, 'ঠাকুর শেষ পর্যন্ত মাছের ঝোল খেয়েচেন; ওতে দোষ নাই—মাথা ঠাণ্ডা থাকে।' কিন্তু তিনি জোর করিয়া কাহারও নিষ্ঠাভঙ্গ করিতেন না। জয়রামবাটীতে স্বামী কৈবল্যানন্দকে মা জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি মাছ খাও?' তিনি বলিলেন, 'না মা।' মা বলিলেন, 'এ গ্রাম-দেশ; এখানে তো মাছ ছাড়া ভাল কিছু পাওয়া যায় না।' কৈবল্যানন্দজী বলিলেন, 'মা, আমি খেতে পারি না।' মা তাঁহাকে আর কখন মাছ খাইতে বলেন নাই।

কোয়ালপাড়া-মঠে প্রথম প্রথম ঠাকুরকে নিরামিষ ও আতপান্ন ভোগ দেওয়া হইত। তৃতীয়বার কাশী হইতে কলিকাতা ফিরিয়া, মণি-অর্ডারে কিছু টাকা পাঠাইয়া শ্রীশ্রীমা স্বামী কেশবানন্দকে লিখিয়াছিলেন, 'এই টাকা দিয়া ঠাকুরকে দই-মাছ ভোগ দিয়া তোমরা প্রসাদ পাইবে।' [ম]

অব্যয়ানন্দজী একবার শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি মঠের সন্ন্যাসীদের তাঁদের সন্ন্যাস-নাম ধরে ডাকেন না কেন?' মা উত্তর দেন, 'আমি মা কি-না, সন্ন্যাস-নাম ধ'রে ডাকতে প্রাণে লাগে।' একথায় কেহ যেন মনে না করেন যে তাঁহার সন্তানদের উপর কিছুমাত্র মায়িক আসক্তি ছিল। তাঁহার শ্রীপদাশ্রিত অনেক ভক্ত-সন্তান আছেন, যাঁহারা তাঁহারই শ্রীহস্ত হইতে ত্যাগের চিহ্ন গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,

'আপনি আমাদের কি ভাবে দেখেন?' তাহাতে মা উত্তর দেন, 'নারায়ণ-ভাবে দেখি।' বিশ্বেশ্বরানন্দজী বলিলেন, 'আমরা আপনার সন্তান, নারায়ণ-ভাবে দেখলে তো সন্তান-ভাবে দেখা হয় না।' মা বলিলেন, 'নারায়ণ-ভাবেও দেখি, সন্তান-ভাবেও দেখি।' প্রবোধবাবু বলেন: পূর্ববঙ্গের জনৈক ভক্ত [দ্বারকানাথ মজুমদার] জয়রামবাটীতে দীক্ষা নিয়া কোয়ালপাড়ায় যাইয়া কঠিন রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হন। যখন অন্তিম সময় উপস্থিত, কোন সাধু অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিলে, তিনি জোড়হাতে কয়েকবার উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুরের নাম করিতে করিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইহার কয়েক দিন পরে জয়রামবাটীতে মার কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করিতেই তিনি অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, 'আমার সোনার চাঁদ একটি ছেলে চলে গেল! আহাহা, বাছার আমার শেষ জন্ম।' জীবনে আমি অনেক পুত্রশোকাতুরার কান্না দেখিয়াছি, কিন্তু মার এই গণ্ডপ্লাবী অশ্রুধারা যেন একটু স্বতন্ত্র রকমের—ইহাতে অশ্রু আছে বটে, কিন্তু প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলাম, মায়িক আসক্তির নামগন্ধও নাই!

* * *

পাগলী-মামী প্রায় সমস্তদিনই মাকে গালাগাল দিতেন, মা শুনিয়াও শুনিতেন না। কিন্তু একদিন গালাগালি করিবার সময় তাঁহাকে 'সবনাশী' বলাতে মা বলিয়াছিলেন, 'আমাকে আর যা বল, সবনাশী বোলো নি; আমার জগৎ জুড়ে ছেলেরা রয়েচে, তাদের অকল্যাণ হবে।' [ত]

স্বামী শ্যামানন্দ বেলুড় মঠ হইতে হাটখোলা হইয়া বড়বাজার অঞ্চলে বাজার করিতে প্রায়ই আসিতেন। কাজ শেষ করিবার পর অনুকূল জোয়ারে নৌকার সুবিধা হইলে তখনই মঠে ফিরিতেন; নতুবা ট্রামে বাগবাজারে আসিয়া শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে আগে স্নানাহার করিয়া লইতেন। একদিন তিনি বাজারের কাজ শেষ করিয়া যখন মার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন বেলা প্রায় দুইটা হইবে। তাঁহার স্নান হইয়া গিয়াছে, এমন সময় গোলাপ-মা একটু বিরক্তির সহিত, 'এরা কোন খবর দিয়ে যায় না; সকালবেলা খবর দিয়ে গেলেই তো হয়! তা নইলে আমাদেরও অসুবিধে, আর এদেরও খাবার কষ্ট।'—এইরূপ বলিতে বলিতে তেতলা

হইতে দোতলার সিঁড়ি পর্যন্ত আসিলেন। মা শুনিতে পাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, 'এখন তোমাদের দিন দিন সংসার বাড়চে, এরকম দুএক জন তো আসবেই। তার কি ক'রবে?' গোলাপ-মা কহিলেন, 'খুদু তো হামেশাই আসচে, একদিনও তো বলে যায় না!' 'তা হোক, তুমি এখন ওকে শীগ্গির শীগ্গির খেতে দাও—অনেক বেলা হ'য়েচে, বাছা আমার ঘুরে ঘুরে আসচে।' 'ওর ওপর তোমার এত দরদ কেন, তোমার শ্বশুর নাকি?'[৭] 'হ্যাঁ, তাই তো!—ওরা আমার শ্বশুর, আমার সব।'

শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা লইয়া কোন ছেলে হয়তো বাড়ী রওনা হইয়াছে, আর তাহার খানিক পরেই জলঝড় আরম্ভ হইল। মা মহাভাবিত হইয়া বলিতেছেন, 'তাইতো, ছেলেটি আমার যাচ্ছে গো, এতক্ষণে বোধ হয় অমুক জায়গায় গেছে, সেখানে নিশ্চয়ই কোন আশ্রয় আছে।' দেখিতে দেখিতে জলঝড় হয়তো কাটিয়াই গেল। বিভূতিবাবু জয়রামবাটী হইতে কর্মস্থানে ফিরিয়া যাইতেছেন, রাস্তায় জলকাদা; তাহার উপর আবার দ্বারকেশ্বর-নদ পার হইতে হইবে। পরের রবিবারে যখন তিনি মার কাছে গিয়াছেন, মা বলিলেন, 'বিভূতি, তুমি তো চ'লে গেলে, জল হ'চ্ছিল, আমি ভাবছিলুম, বিভূতি আমা—র এত—ক্ষণ বড় নদী—পেরুল!'

সুষমা রায় বলেন: "আমরা কামারপুকুর দর্শন করিয়া পায়ে হাঁটিয়া জয়রামবাটী ফিরিতেছি, রাস্তায় জলঝড় আরম্ভ হইল। এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মা নিজের ঘরের বারান্দায় কেবল এদিক ওদিক করিতেছেন আর বলিতেছেন, 'ছোট বৌ [শিবরামের স্ত্রী] পাগলী, কি জানি এদের খাওয়া দাওয়া হ'ল কি-না! এখনো কেন ফিরচে না?' আমরা ফিরিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই মা ব্যস্ত হইয়া, 'এস মা, এস মা' বলিয়া হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন।

"আমার শ্বশুর-বাড়ীতে ব্যবহার ভাল ছিল না। স্বামী তখন সিরাজগঞ্জে শিক্ষকতা করেন, কিন্তু বাসা করিয়া থাকিতে পারেন না—অল্প আয়।

---

৭ শ্রীশ্রীমার শ্বশুরের নাম 'খুদিরাম'; শ্যামানন্দ মহারাজের ডাক-নাম 'খুদিরাম' ও 'খুদুমণি' (বাবুরাম-মহারাজের দেওয়া)।

আবার স্ত্রীকে লইয়া স্বতন্ত্র বাসা করিয়া থাকা বিবেক-বিরুদ্ধ জ্ঞান করিতেন। যখন মার কাছে গেলাম, মা সংসারের প্রত্যেক খুটিনাটি ব্যাপার—কে কেমন লোক, কে কিরূপ ভালবাসে, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি সকল কথাই বলিলাম. মা শুনিয়া গেলেন মাত্র, কোন উত্তর করিলেন না। যেদিন চলিয়া আসিব, মা নিজের অসুস্থ শরীর নিয়া সদর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৌমাকে তোমার কাছে রাখবে।' তিনি বলিলেন, 'কি করে রাখব মা, আমার যে অল্প আয়। বাসা করে থাকলে বাপ-মাকে কিছু দেওয়া হয় না।' মা দৃঢ়তার সহিত বলিলেন 'তা হোক, তাদের আরো তো ছেলে আছে। এতে যে পাপ হবে, সে পাপ আমি নিলুম।'"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক যখন জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার কাছে উপস্থিত হইলেন, মা কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই পূর্বপরিচিতের মত বলিলেন, 'কখন রওনা হ'য়েচ? রাস্তায় কোথায় খেয়েচ? কি খেয়েচ? রাস্তায় কোন কষ্ট হয় নাই তো?' উত্তর শুনিয়া মা দুঃখ করিয়া বলিলেন, 'এখানে আসতে বড় কষ্ট; তবুও তুমি ছেলেমানুষ একা এতদূর এসেচ!'

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভৌমিক লিখিতেছেনঃ "১৩২৪ সালের বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহের সুদূর পল্লী হইতে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করি। এই কমপক্ষে তিন দিনের রাস্তায় একের পর অন্য আমার সঙ্গী জুটিতে লাগিল এবং তাহারাই রান্নাবাড়া করিয়া খাওয়াইল। জয়রামবাটীতে যখন পৌছিলাম, মা দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এই কাটফাটা রোদে অতপথ এলে অসুখ হ'তে পারে।'

"কামারপুকুর দর্শন করিয়া দেশে ফিরিবার জন্য যাত্রা করিলাম; কিন্তু আরামবাগ ছাড়াইয়া যাওয়ার পর কোন কারণবশতঃ মার কাছে যাইবার জন্য মন পুনরায় ব্যাকুল হইল ও পরদিন আবার জয়রামবাটী অভিমুখে ফিরিয়া চলিলাম। প্রায় একটার সময় জয়রামবাটীতে পৌছিবামাত্র উপস্থিত ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন, 'তুমি মাকে বড় কষ্ট দিয়েচ, তুমি রোদে রোদে আসচ বলে মা আগে থেকেই বলচেন, তাঁর শরীর রোদের তাপে জ্বলে যাচ্চে।' তাঁহাদের কেহ কেহ আমাকে বাতাস করিতে

লাগিলেন। আমি না পৌঁছা পর্যন্ত কেহই আহার করিতে বসেন নাই। ভক্তগণ আমাকে খাইতে বসিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথা শিরোধার্য করিয়া বসিবামাত্র পতিতপাবনী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভয় কি, তোমার চিন্তা নাই, খাও—তুমি শান্তি পাবে।' আমি কাঁদিয়া আকুল হইলাম। বিকালে মা আমাকে ডাকিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া অনেক কথা কহিলেন; হৃদয় শান্ত হইয়া মনে অপার আনন্দ অসিল। শেষ রাত্রে উঠিয়া যাত্রা করিব শুনিয়া বলিলেন, 'যাওয়ার সময় দেখা কোরো।' আমি রাত্রি তিনটায় উঠিয়া মনে করিলাম, মাকে আর কষ্ট দিব না; কিন্তু দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া দেখি, মা পূর্ব হইতেই আমাকে চরণধূলি দিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন!

"আর একবার কোয়ালপাড়ায় মাকে দর্শন করিতে গিয়াছি: বিদায়ের কালে জগদম্বা-আশ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইব এমন সময় চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়া গেল। মা তৎক্ষণাৎ আমার হাত ধরিয়া ঠাকুরের সম্মুখে আনিয়া বসাইলেন এবং সিংহাসন হইতে নির্মাল্যপুষ্প লইয়া নিজহাতে আমার মাথায় বুলাইয়া দিলেন।

"একবার আমার কাজের ভুল হওয়ায় চাকুরি লইয়া গোলযোগ হয়, এমন কি জেল হওয়ার সম্ভাবনা দাঁড়ায়। আমি কাতর হইয়া মাকে সকল কথা নিবেদন করিলাম। মা শুনিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই, কোন চিন্তা কোরো না।' আমার হৃদয়ে বল আসিল—সমস্ত বিপদ অচিন্তনীয়রূপে কাটিয়া গেল।"

স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ বলেন: এক সময়ে আমি মঠে খুব কাজকর্ম করিতাম বলিয়া ঠাকুরের সন্তান স্বামিজীরা আমাকে খুব ভালবাসিতেন। তাঁহাদের ভালবাসা পাইয়া আমার অভিমান অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। মঠের বাহিরে কিছুদিন তপস্যায় কাটাইব স্থির করিলাম, কিন্তু স্বামিজীরা যাইতে দিবেন না। শ্রীশ্রীমা অনুমতি দিলে তাঁহারা আর অমত করিবেন না মনে করিয়া তাঁহার অনুমতি লইবার জন্য কলিকাতায় গেলাম ও প্রণাম করিয়া বলিলাম, 'মা, আমার একটি কথা আছে।' স্নেহমাখা কণ্ঠে মা কহিলেন, 'কি? বল বাবা।' 'মা, আমি কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসি—আবার আসব।

মঠে থেকে আমার মন বিগড়ে যাচ্ছে ঃ মহারাজদের ভালবাসা পেয়ে আমি আর আর সাধুদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না—একএক সময়ে তাঁদের যা তা বলে ফেলি। কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে আমার মনটি ঠিক হয়ে যাবে।' 'কোথায় যাবে বাবা? সঙ্গে টাকাপয়সা আছে?' 'না; গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে কাশীর দিকে চলে যাব।' 'কার্তিক মাস, যমের চারদোর খোলা—লোকে বলে। আমি তো মা, আমি কি ক'রে বলি বাবা, তুমি যাও? আবার শুনচি, তোমার হাতে পয়সা নাই; খিদে পেলে কে খেতে দেবে বাবা?' আমার আর যাওয়া হইল না।

স্বামী মহাদেবানন্দ বলেন: শ্রাবণ মাস—কয়েকদিন যাবৎ অবিরাম বৃষ্টি হইতেছে। কোতুলপুরে হাট করিয়া কোয়ালপাড়া মঠ[৮] হইতে পরদিন সকালবেলা জয়রামবাটী পৌঁছিবামাত্র মা বলিলেন, 'এসেচ? বেশ হ'য়েচে।

[৮] কোয়ালপাড়া-মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপ: কোয়ালপাড়া জয়রামবাটী হইতে দুইক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া ১৩১১ সালের বর্ষারম্ভে স্বামী নির্মলানন্দ যখন স্বামী ধীরানন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটী যান, রাস্তায় কোয়ালপাড়ার শ্রীকেদারনাথ দত্তের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি তখন কোয়ালপাড়া ও কোতুলপুর এই দুইটি গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেন। সন্ন্যাসিদ্বয়ের সৌম্যমূর্তি তাঁহাকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি তাহাদিগকে নিজ বাটীতে লইয়া যান। তাহাদের উপদেশে কেদার (পরে, স্বামী কেশবানন্দ) মাকে দর্শন করিতে যাইলে মা তাঁহাকে ঠাকুরের ও স্বামিজীর দুইখানি ফটো দান করেন। ঐ বৎসর শ্রাবণ মাসে স্বদেশী ভাবের প্রেরণা লইয়া তিনি কোয়ালপাড়ায় তাঁতশালা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার ছাত্র কতিপয় বিবাহিত ও অবিবাহিত যুবক ক্রমশঃ তাহার সহযোগী হন। ইঁহারা অনেকেই পরে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ১৩১৫ সালের ফাল্গুন মাসে ঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া তাঁহার নিত্যপূজা আরব্ধ হইলে মঠের সূত্রপাত হয়। ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতায় আসিবার পথে মা তথায় স্বহস্তে ঠাকুরের ও নিজের ফটো প্রতিষ্ঠা করেন। এই একটিমাত্র স্থানেই মার স্বহস্তে নিজ ফটো প্রতিষ্ঠার কথা শুনা যায়। সেই সময়ে গৌরীমা, লক্ষ্মীদেবী ও ব্রহ্মচারী প্রকাশ মার সঙ্গে ছিলেন। মা প্রথমতঃ লক্ষ্মীদেবীকে পূজা করিতে বলিলে তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া আপত্তি করেন। তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, 'তুমি গুরুকন্যা, তুমি পূজো ক'রবে না কেন?'

অনেকদিন থেকে কেউ আসে নাই, বাজার টাজার হয় নাই, আজ থেকে বাজার ক'রে দিয়ে যেও।' বিকালে হল্‌দিপুকুরে একটিন কেরোসিন, আটা, চিনি, ঘি, ময়দা, মিছরি ইত্যাদি অনেকগুলি জিনিষ কিনিয়া আনিতে গেলাম। সমস্ত কেনা হইয়া গেলে বোধ হইল, প্রায় একমন হইবে। দোকানদার কহিল, 'আপনি পারবেন না, লোক ডেকে দি।' মা আমাকে কুলি নিতে বলেন নাই; এমন অবস্থায় কুলি নেওয়া সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া বলিলাম, 'না, কুলির দরকার হবে না, আমিই পারব। আপনি ঝুড়িটা আমার মাথায় তুলে দিন, তা হলেই হবে।' ঝুড়ি মাথায় লইয়া খানিক রাস্তা যাইতে না যাইতে ভীষণ ভারী বোধ হইতে লাগিল ও মাথা জ্বালা করিতে লাগিল। উপরে বৃষ্টি—একহাতে ঝুড়ির উপর ছাতা ধরিয়া রাখিয়াছি; পথ পিচ্ছিল—সন্তর্পণে চলিতে হইতেছে। মনে মনে নিজেই নিজেকে বলিতেছি, 'পা পিছলাইলে চলিবে না, এ তোমাকে লইয়া যাইতেই হইবে।' পথিমধ্যে গরুর গাড়ী চলিবার একটি নীচু, বর্ষার জলপূর্ণ রাস্তা অতিক্রম করিতে হয়। কোনরূপে সেই রাস্তাটির ওপারে গিয়াছি, আর সঙ্গে সঙ্গে বোধ হইল যেন বোঝা একেবারে হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। কি হইল বুঝিতে না পারিয়া সেখানে মিনিটখানেক দাঁড়াইলাম; কিন্তু কারণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া অক্লেশে মার বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম। বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই দেখি, মা নিজের ঘরের বারান্দায় একবার পশ্চিম হইতে পূর্বে, আবার পূর্ব হইতে পশ্চিমে ছুটাছুটি করিতেছেন—সমস্ত মুখ-

---

স্বামী কেশবানন্দের পৈত্রিক ভিটায় যে ঘর ছিল, উহা তিনচারি বৎসর পরে জগদম্বা-আশ্রমে পরিণত হয়। মা ঐ আশ্রমে তিনবার কিছু বেশীদিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁতশালার আয় হইতে কোয়ালপাড়া-মঠের অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহিত হইত এবং সপ্তাহে দুইদিন বাজার হইতে ক্রীত তরীতরকারী জয়রামবাটীতে মার সেবার জন্য পাঠানো হইত। সেবকেরাই মাথায় করিয়া উহা দিয়া আসিতেন। মার কাছে যাতায়াতের পথে ভক্তেরা কোয়ালপাড়া-মঠে বিশ্রাম করিতেন। কেহ কেহ বা কিছু অধিকদিন থাকিয়া প্রত্যহ বা একদিন অন্তর মাকে দর্শন করিয়া আসিতেন। [কোয়ালপাড়া-মঠের বিবরণ স্বামী ধ্রুবানন্দের নিকট হইতে, স্বামী কেশবানন্দের হস্তলিখিত 'শ্রীশ্রীমার অস্ফুট স্মৃতি' হইতে ও স্বামী সারদানন্দের দিনলিপি হইতে সংগৃহীত।]

খানা লাল, চক্ষু দুইটি যেন কপালে উঠিয়াছে, আর আপন মনে বলিতেছেন, 'আমি কেন একটা কুলি নিতে ব'ল্লুম না?' বোঝা নামানো হইলে মা বলিলেন, 'একটা কুলি নিতে হয়। আমি বলি নাই, তাতে কি হ'য়েচে? এরকম ক'রে কি আসতে হয়?'

* * * *

শ্রীশ্রীমাকে ভক্ত-সন্তানগণের মনস্তুষ্টির জন্য কত রকম আব্দারই যে সহ্য করিতে হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। দূরাগত কোন ভক্ত হয়তো জেদ ধরিয়াছেন, ধূলা-পায়ে মার পদ-পূজা না করিয়া জলগ্রহণই করিবেন না। অগত্যা মা তাহার জেদ রক্ষা করিবার জন্য পিঁড়ির উপর কাষ্ঠবিগ্রহের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং পূজা গ্রহণ করিয়া সেই ভক্তেরই আহারের ব্যবস্থা করিতে ছুটিলেন।

উমেশবাবু লিখিতেছেন: একবার জয়রামবাটীতে মাকে বলিলাম, 'আমরা তিনচার দিন পরেই দেশে যাব, আমাদের ইচ্ছা আপনার অন্নপ্রসাদ শুকিয়ে নিয়ে যাই।' প্রসাদ পাওয়ার পর মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ঐ গো—তোমার সেই জিনিষ।' মা একখানা রেকাবিতে তাহার অন্ন-প্রসাদ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ঘরের সম্মুখে একখানা টিন ঝুলানো ছিল, আমি প্রসাদ শুকাইবার জন্য রেকাবিখানা উহার উপরে রাখিতেই মা বলিলেন, 'দেখো যেন কাকে মুখ না দেয়।' আমি বলিলাম, 'এখনই ফিরে এসে এখানে বসব।' কিন্তু বাহিরের ঘরে যাইয়া তামাক খাইতে খাইতে প্রসাদের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রায় তিনটার সময় ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র ভিতরে যাইয়া দেখি, মা সেই ভাবেই বসিয়া আছেন! জিজ্ঞাসা করিলাম 'মা, আজ আপনি বিশ্রাম করেন নাই?' মা বলিলেন, 'না বাবা, তোমার ওটিতে পাছে কাকে মুখ দেয়, সেই জন্যে ব'সে আছি।'

স্বামী তন্ময়ানন্দ লিখিতেছেন: একবার আমি ও পতিতপাবন মণ্ডল কোয়ালপাড়া হইয়া জয়রামবাটী যাই। যদি মার বাড়াতে পৌঁছিয়া তাঁহার একটু সেবা করিতে পারি, তবে জীবন ধন্য জ্ঞান করি—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এবং মুখে 'জয় মা, জয় মা' বলিতে বলিতে জয়রামবাটী পৌঁছিলাম। বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখি, মা একটি বাটিতে তেল লইয়া

পা দুইখানি মেলিয়া বসিয়া আছেন—মনে হইল যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা দুইজনে প্রণাম করিয়া তাঁহার শ্রীপদপ্রান্তে বসিলাম, তিনি আমাদিগকে কুশল-প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দিলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই ঐ বাটির তেল হাতে ঢালিয়া তাঁহার পায়ে ধীরে ধীরে মাখাইতে লাগিলাম। মা বলিলেন, 'এই পায়ে একটু জোরে জোরে মাখাও তো, এটাতে বাত।' প্রায় আধঘণ্টা উত্তীর্ণ হইলে মা বলিলেন, 'বেলা হ'য়েচে, ঠাকুরপূজো ক'ত্তে হবে। (আমার মুখের দিকে চাহিয়া) এবার হ'য়েচে তো?' ফিরিবার পথে পতিতপাবন বলিল, 'দেখুন, আমিও মনে মনে এই চিন্তা করেছিলুম যে, গিয়েই যদি মার একটু সেবা করতে পাই!'

শ্রীহরিবল্লভ ঘোষ বলেন : এক বৎসর ৺দোল-পূর্ণিমার দিন সকালে চারিজনকে (ভ্রাতুষ্পুত্র নিরঞ্জন, দুইটি ছাত্র উপেন্দ্রনাথ নন্দ ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন, যোগেন্দ্র আচার্য) সঙ্গে লইয়া গরুর গাড়ীতে কোয়ালপাড়া পৌঁছি। শ্রীশ্রীমা তখন জগদম্বা-আশ্রমে ছিলেন। গাড়ী হইতে নামিতেই জনৈক ব্রহ্মচারী আমাদের চারিজনকে মাকে প্রণাম করিবার জন্য লইয়া গেলেন, কেবল যোগেন্দ্র গাড়ীতে রহিল। বিকালবেলা ঐ ব্রহ্মচারী আসিয়া কহিলেন, 'আপনাদের ভিতর যিনি সকালে মাকে প্রণাম করেন নাই কেবল তিনি আসুন।' যোগেন্দ্র তাঁহার সঙ্গে চলিল। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনার তো সকালে দর্শন হয়ে গেছে, আর আসবেন না।' অনেকদিন পূর্ব হইতে দোল-পূর্ণিমায় মার পাদপদ্মে আবীর দেওয়ার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কটক হইতে যাত্রা করিবার সময় উহা সঙ্গে লইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাড়াতাড়িতে ভুল হইয়া যায়। পুনরায় বিষ্ণুপুরে পৌঁছিয়া উহা কিনিয়া লইব স্থির করি, কিন্তু সেখানেও ভুল হয়। এখন আবীর তো সঙ্গে নাইই, অধিকন্তু সেবকটি মার কাছে যাইতেও নিষেধ করিতেছেন। নিষেধ সত্ত্বেও মনের আকুলতায় আমি যন্ত্রচালিতবৎ অগ্রসর হইতেছি দেখিয়া তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার বারণ করিলেন। মনের দুঃখে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সম্মুখে ঝোড়জঙ্গল ব্যতীত কোন পথ দেখিতে পাইলাম না। স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া

আছি, আর ফিরিয়া ফিরিয়া আশ্রমের দরজার দিকে তাকাইতেছি এমন সময় যোগেন্দ্র আসিয়া বলিল, 'হরিকাকা, শীগ্‌গির আসুন, মা ডাকচেন।' ভিতরে যাইয়া দেখি, উঠানে একটি টুলের উপর মা বসিয়া আছেন—তাঁহার কোলে ফাগের থালা। প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, 'ওরে, আজ যে দোল-পূর্ণিমা, ফাগ দিতে হয়।' আমি পরিপূর্ণ-প্রাণে পাদপদ্মে আবীর দিয়া পুনরায় প্রণাম করিলাম।

শ্রীগৌরীকান্ত বিশ্বাস লিখিতেছেন : জয়রামবাটীতে দুপুরবেলা খাইতে বসিয়াছি, সঙ্গে যতীন-দাদা ও প্রসন্ন-মামা বসিয়াছেন, আর শ্রীশ্রীমা নিজে পরিবেষণ করিতেছেন। আমি মনে মনে মাকে অন্ন নিবেদন করিতেছি এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন, এ তো [ঠাকুরের] প্রসাদ, এই ছাখ, আমি নিজেও প্রসাদ ক'রে দিচ্চি।' এই বলিয়া মা নিজহাতে আমার থালা হইতে দুটি অন্ন লইয়া মুখে দিয়া আবার আমার পাতে দিলেন। বিদায়ের পরে, মার স্বহস্তে দেওয়া প্রসাদ খাওয়ার অভিপ্রায়ে জল চাহিলাম। মা নিজে কলসী হইতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। এমন জল কখনও খাই নাই, মনে হইল যেন সুধা। আমি, যতীন-দাদা ও চারু-দাদা তিনজনেই ইহা অনুভব করিলাম এবং বারবার চাহিয়া পান করিতে লাগিলাম। মাও বারবার দিতে লাগিলেন ও মৃদুমৃদু হাসিতে লাগিলেন। যতীন-দাদা বলিয়াই ফেলিলেন, 'মা, এ তো জল নয়—সুধা, তাই বারবার খেতে ইচ্ছে হচ্চে।' মা বলিলেন, 'তা হবে।'

স্বামী প্রশান্তানন্দ বলেন : "আমার মাতৃবিয়োগের পর শ্রীশ্রীমার ছবি দর্শন করি এবং তাঁহাকেই আমার মা বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে। ইহার পরে যখনই মার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও মেলামেশা হইয়াছে, পেটের ছেলের মত ব্যবহার করিয়াছি ও পাইয়াছি, কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই।

"ছেলেবেলা হইতে আমার খুব ঘোড়ায় চড়ার সখ ছিল। জিবট্যা হইতে ডাক্তার রোজ ঘোড়ায় চড়িয়া জয়রামবাটীতে আসিতেন। মাকে ধরিয়া বসিলাম,—'মা, তুমি ডাক্তারকে বলে দাও, আমি তাঁর ঘোড়ায় চড়ে একটু বেড়াব।' ঘোড়াটা খুব দুষ্ট ছিল বলিয়া মা বারবার নিষেধ করাতে উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, 'তুমি বাপের জন্মে ঘোড়ায় চড়া দেখনি বলে ভয়

করচ, আমি ঢের ঘোড়ায় চড়েছি।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা ডাক্তারকে বলিলেন, 'ছেলে ঘোড়ায় চড়তে চায়, তোমার ঘোড়াটা একবার দিও তো বাপু!' ডাক্তার সানন্দে সম্মত হইলেন, কিন্তু ঘোড়ায় চড়িবামাত্র সে একেবারে জিবট্যার দিকে ছুটিল ; কিছুতেই বাগ মানাইতে পারিলাম না। অনেকদূব যাওয়ার পব বহুকষ্টে তাহাকে ফিরাইলাম বটে, কিন্তু সে ঝোড়জঙ্গল বাঁশ-বনের ভিতর দিয়া চলিল। গা হাত ছড়িয়া গিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে ফিরিয়া আসিলাম। মা একদৃষ্টে পথের পানে চাহিয়া ততক্ষণ দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন আর বলিতেছিলেন, 'কি হবে গো, ঘোড়াটা যে একেবারে বেসামাল হ'য়ে চলে গেল!' আমাকে ফিবিয়া আসিতে দেখিয়া মা আশ্বস্ত হইলেন এবং গা হাত কাটিয়া গিয়াছে দেখিযা নিষেধ না শুনার জন্য বকিতে লাগিলেন। পরিধানের কাপড়খানাও ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, মা তখনই একখানা নূতন কাপড় আনিয়া পরিতে দিলেন।"

—

বিংশ অধ্যায়

মা

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীশ্রীমা তাঁহার সকল সন্তানের উপর কিভাবে লক্ষ্য রাখিতেন এবং দৃষ্টিমাত্রে মনের ভাব বুঝিয়া লইয়া সাধ্যানুযায়ী পূর্ণ করিতেন, তাহা ছোট খাট ঘটনায় নিত্য পরিস্ফুট হইত। শ্রীমতী দুর্গাদেবী বলেন : মার অসুখের পর একবার জয়রামবাটী যাই। সরলাদিদি তাঁহার সেবার জন্য আসিয়াছিলেন, তিনিই সমস্ত ফাইফরমাস কাজকর্ম করিতেছেন। আমাকে মা কোন কাজের কথা না বলায় দুঃখিত মনে বসিয়া আছি, আমার মুখের দিকে চাহিয়াই বলিলেন, 'মুখটি কেন ভার ক'রে ব'সে আছ মা? এস আমার পা টিপবে, পাকা চুল তুলবে।'

শ্রীমতী প্রফুল্লমুখী বসু লিখিতেছেন : একদিন বিকালে 'বৌ'[১] শ্রীশ্রীমার

---

[১] শ্রীশ্রীমার অন্যতমা সেবিকা 'নবাসনের বৌ' শ্রীমতী মন্দাকিনী রায়।

লেপ, তোষক ইত্যাদি ছাদ হইতে আনিয়া ওয়াড় পরাইয়া বিছানা করিতে লাগিলেন। আমি সেইদিকে তাকাইয়া আছি—যদি ঐ কাজটি করিতে পাই! বৌ কাজ সারিয়া চলিয়া যাইতেই মা ঘরে আসিলেন এবং বিছানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিলেন 'দেখচ মা, সব ভুল ক'রে রেখেচে—ওয়াড়গুলো ওলট পালট ক'রে পরিয়েচে! তুমি মা, ওগুলো খুলে, লেপের আর তোষকের ওয়াড় ব'দলে পরিয়ে ঠিক ক'রে বিছানাটা ক'রে দাও তো।'

সকল সময়েই দীনদুঃখী সন্তানের উপর শ্রীশ্রীমার বিশেষ করুণা প্রকাশিত হইতে দেখা গিয়াছে। শ্রীশচন্দ্র ঘটক বলেন: আমার বাবার মাতুল এক বৃদ্ধ কলিকাতায় থাকিতেন; তাঁহার অবস্থা কপর্দকহীন বলিলেও হয়। তিনি ছেলেবেলা হইতে আমাকে ভালবাসিতেন এবং সদ্ভাবপূর্ণ ছিলেন। আমার ইচ্ছা হইল, তাঁহাকে একবার মাতৃ-দর্শন করাইয়া আনি। তাঁহার মত লোকের ভাগ্যে মাতৃ-দর্শনের সম্ভাবনা আছে জানিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং আমার পরামর্শে এক পয়সার বাতাসা কিনিয়া সঙ্গে লইলেন। মাকে প্রণাম করিয়া সঙ্কোচের সহিত সেই বাতাসা বাহির করিবামাত্র মা একখানা বাতাসা হাতে নিয়া তখনই মুখে দিলেন।

একবার দুইজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক—অতি দরিদ্র, পরণে ময়লা কাপড়,গায়ে ছেঁড়া জামা—মার কাছে আসেন। মা তাহাদের কথা শুনিয়া স্নান করিয়া আসিতে বলেন। স্নানান্তে ভিজা কাপড় পরিয়া আসিলে মা সেই অবস্থায়ই তাহাদিগকে মন্ত্র দিয়া বলিলেন, 'হা কি কষ্ট, হা কি কষ্ট! এত কষ্ট ক'রে তোমরা এলে গো! (সুশীলা দত্ত প্রমুখ ভক্তদের প্রতি) ভক্তির টানে এখানে এসেচে!'

শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন: এক বৎসর মহাষ্টমীর দিন আমরা অনেকগুলি ভক্ত ঘরের ভিতর শ্রীশ্রীমার পায়ে ফুল দিয়া প্রণাম করিয়াই বাহির হইয়া আসিলাম, তাঁহার শরীর তেমন সুস্থ ছিল না। একটি লোক উঠানে দাঁড়াইয়াছিল, মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার বাড়ী কোথা বাবা?' সে বলিল, 'তাজপুরে।' মা বলিলেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে

কেন বাবা, তুমিও পায়ে ফুল দিয়ে যাও।' লোকটি নিঃসঙ্কোচে ঘরে ঢুকিয়া পায়ে ফুল দিয়া প্রণাম করিল। সে জাতিতে বাগ্‌দি।[২]

শ্রীশ্রীমার দৈনন্দিন অতি সাধারণ ব্যবহারও মাতৃত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল থাকিত এবং সমীপাগত সন্তান প্রাণে প্রাণে উহা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইত। রাধুর খুড়শ্বশুর তাজপুরের ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে মা নিমন্ত্রণ-পত্র লিখাইতেছেন ঃ বলিলেন, 'লেখ বাবাজীবন!' রাধুর মা শুনিয়া বলিলেন, 'সে কিগো, সে যে তোমার বেয়াই।' মা উত্তর দিলেন, 'তা হোক, সে আমাকে মা ব'লে আনন্দ পায়, আমি তার কাছে তাই।' [স]

মাণিকতলা বোমার মামলার আসামী খুলনার বিজয়কুমার নাগ শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসেন শ্রীরামচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে। মা ঘোমটা দিয়া আছেন দেখিয়াই বিজয় বলিয়া উঠিলেন, 'আমি তোমাকে দেখতে এলুম, তুমি যে মুখ ঢাকা দিয়ে রইলে!' মা মুখের কাপড় সরাইয়া দিলেন ও দুই হাতে বিজয়ের চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন। বিজয়ের বয়স তখন ষোল সতর বছর।

স্বামী তন্ময়ানন্দ একদিন শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, "মা, আমি পাড়াগেঁয়ে লোক, কখন আপনাকে 'আপনি' বলি, কখন বা 'তুমি' বলে ফেলি—আমাদের 'তুমি' বলা অভ্যাস। আপনার কাছে কত যে অপরাধী হই, তার কি হবে?" মা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'তাতে আপরাধ কি? মার সঙ্গে ছেলে কি অত হিসেব কিতেব ক'রে কথা কইবে?'

শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের পথ চলিতে চলিতে পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। পান না খাইয়া তিনি পথ চলিতেই পারিতেন না; দাঁতের অসুখ থাকায় খড়িকাও ব্যবহার করিতে হইত। তাঁহার গর্ভধারিণী ব্যতীত আর কেহ ইহা জানিত না। জয়রামবাটী হইতে আরামবাগ যাওয়ার সময়

---

[২] কোয়ালপাড়া মঠে গৌরী-মা তথাকার এক বাগ্‌দি ছেলেকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'মা, এই ছেলেটি বেশ।' মা প্রসন্নদৃষ্টিতে ছেলেটিকে দর্শন দিলেন—সে কি হাসিমুখ! কাশীতে দুর্গাবাড়ী যাওয়ার সময় 'খ্যাঁদা গুণ্ডা' হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিতেই মা সস্নেহদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলেন। [বি]

শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে পাতার ঠোঙায় কতকগুলি পান দিয়া বলিলেন, 'এইগুলি পথে খাবে।' ঠোঙাটি খুলিয়া দেখা গেল, তন্মধ্যে একটি খড়িকা সযত্নে রক্ষিত আছে!

নলিনবাবু শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে গিয়াছেন, মা পুলিপিঠা করিয়াছিলেন, আনিয়া খাইতে দিলেন। নলিনবাবু বলিলেন, 'মা, আমার গর্ভধারিণী দেহ রেখেচেন, এখন অশৌচ—এ অবস্থায় আমি খাব?' মা কহিলেন, 'তাতে দোষ কি বাবা, আমিও তো মা, আমি দিচ্চি, এখানে কিছু দোষ নাই।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় বলেন: বালিগঞ্জ হইতে আমরা চারিজন একসঙ্গে দীক্ষা নিতে জয়রামবাটী যাই। বিষ্ণুপুরে শিবুবাবু নামে আর একজন আমাদের সঙ্গে মিলিত হন, তিনি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। সকাল বেলা বিষ্ণুপুরে চা-পানের সময় শিবুবাবু ডিম খাইতে চাহিলেন, কিন্তু তাহার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা তাঁহাকে খাইতে দিলাম না। জয়রামবাটী পৌঁছিবার পরদিন আমাদের দীক্ষা হয়। তাহার পরদিন দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার সময় মা নলিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ছেলেদের জন্যে যে ডিম রান্না হ'য়েচে,দিয়ে যা। (শিবুবাবুকে দেখাইয়া) এই ছেলেটির পাতে দুটো দে, আর সকলকে এক একটা দে। ও খেতে চেয়েছিল, ছেলেরা খেতে দেয় নি। আকাঙ্খা অপূর্ণ রাখতে নাই, খেতে খেতেই ছেড়ে যাবে। তোমরা বারণ ক'ল্লে কেন?' শিবুবাবু কাঁদিয়া আকুল।

শ্রীমতী কমলা ঘোষ বলেন: জগদম্বা-আশ্রমে শ্রীশ্রীমা একঝুড়ি আম কিনিয়া ঢেঁকিশালে আমাকে ও ভূদেবের স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমরা দুজনে এখানে ব'সে আমগুলি খাও।' সেইদিন বিকালে আবার কতকগুলি কচি তাল আনাইলেন: ভূদেব কাটিয়া দিতে লাগিল, আর আমরা খাইতে লাগিলাম। সেইদিন হইতে তালশাঁস আর আমি মুখে করি না, আম খাওয়ারও কিছুমাত্র আগ্রহ নাই।

স্বামী বরদানন্দ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ অধ্বর্যু প্রভৃতি জয়রামবাটীতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীমার জন্য তাঁহারা বাঁকুড়া হইতে উত্তম 'দানার গুঁড়ি' চাউল, ফুলকপি ইত্যাদি সঙ্গে আনিয়াছেন। সেইদিন রাত্রে এবং পরদিন দুপুরবেলা আহারের সময় দেখা গেল, মা ঠিক সেই জিনিষগুলি তাঁহাদের

জন্য রন্ধন করিয়াছেন। তজ্জন্য অনুযোগ করায় মা উত্তর দিলেন, 'বাবা, তোমরা না খেলে কি আমি খেতে পাবি ?'

স্বামী তপানন্দ বলেন ঃ একবাব কলিকাতা হইয়া জয়বামবাটী যাইতেছি, শরৎ-মহাবাজ মার জন্য তুইঝুড়ি আম এবং কিছু সন্দেশ সঙ্গে দিলেন। বিষ্ণুপুবে পৌঁছিয়া গরুব গাড়ীতে চাপিবাব পব ভীষণ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মাকে নিজেব কিছু দিবার সামর্থ্য নাই, শবৎ-মহাবাজ কিছু জিনিষ সঙ্গে দিয়াছেন, তাহাও বুঝি পৌঁছাইতে পারিলাম না !—ভাবিয়া মন উতলা হইল। সন্দেশের হাঁড়ি বুকের নীচে আগলাইয়া রাখিলাম ; ক্রমে প্রকৃতি শান্ত হইয়া আসিল। তুপুববেলা মা যখন খাইতে বসিয়াছেন, সেই সময় জয়বামবাটী যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমাব বডই সাধ ছিল, একদিন মার আহারের পর তাঁহাব পাতে বসিয়া প্রসাদ পাইব। মা চিরকালই আগে ছেলেদেব খাওয়াইয়া পবে নিজে খাইতেন এবং খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেদিগকে কিছু প্রসাদ [সাধাবণতঃ তুধভাত] পাঠাইয়া দিতেন। আমি যাইয়া পৌঁছিবামাত্র মা কেদাবেব মাব দ্বাবা জলখাবাব ও একছিলিম তামাক পাঠাইয়া দিলেন। আমি যে তামাক খাই, তাহাও মা অবগত আছেন ! কেদারেব মাব মুখে শুনিলাম, মা আমাব জন্য সকাল হইতে কেবল ঘব-বাহিব কবিয়াছেন—একএক বাব গ্রামেব প্রান্তে যাইয়া মাঠের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া কাতবকণ্ঠে বলিয়াছেন, 'বাছার আমাব ঝড়বৃষ্টিতে না জানি কত কষ্টই হ'য়েচে !' নিজেব খাওয়া শেষ হইলে মা আমাকে ভিতবে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শালপাতায় আহাব কবিয়াছিলেন, প্রসাদী জিনিষ সমস্তই চারিধাবে সজ্জিত ছিল ; বলিলেন, 'ব'সে পড় বাবা, এ পাতে আমি খেয়েচি।'

শ্রীহরিপদ মাঝি বলেন ঃ কোন ঘটনায় আমার কোয়ালপাড়া মঠে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়। কলিকাতা যাওয়ার পথে শ্রীশ্রীমা পূজনীয় শরৎ-মহারাজের সঙ্গে কোয়ালপাড়া আসিয়াছেন ; তুপুববেলা থাকিয়া বিকালে রওনা হইবেন। মঠ লোকজনে ভর্তি। আমি মাকে স্মবণ করিয়া কাঁদিতেছি, আর মনে মনে বলিতেছি, মা তো জগজ্জননী, আমার অন্তরেব ব্যথা নিশ্চয়ই জানিতে পারিতেছেন। ক্ষেতে কাজ করিতে গেলাম, কিন্তু

কাজে মন বসিল না। এমন সময় স্বামী বিদ্যানন্দ আসিয়া বলিলেন, 'পদ্দ, মঠে আয়।' আমি বলিলাম, 'মঠে যাবার যে নিষেধ আছে—কেশবানন্দ-মহারাজ মানা করেচেন।' 'মহারাজই তোকে ডাকচে'—বিদ্যানন্দজীর এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া মঠে যাইতেই কেশবানন্দ-মহারাজ বলিলেন, 'মা তোকে ডাকচেন, যা।' ঠাকুর-ঘরের পশ্চিমের ঘরটিতে মা খাটের উপর পশ্চিমাস্যা হইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া উঠিতেই আমার হাতে একখানি প্রসাদী লুচি দিয়া বলিলেন, 'যা বাবা, এবার অনেক লোক; বাসনা পূর্ণ হ'য়েচে তো?'

স্বামী মহেশ্বরানন্দ যেবার কলিকাতায় মার বাড়ীতে প্রথম যান, সারদানন্দ-মহারাজ জ্বরে শয্যাগত ছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহার হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলেন, 'বাবা, এটি বাবুরামের হাতে দিয়ো; ঠাকুরের পূজো দেবে আর শরতের নামে তুলসী দেবে।'

প্রভাকর মুখোপাধ্যায় আরামবাগ হইতে শ্রীশ্রীমার কাছে আসিবার সময় ছেলেটির হাম হইয়াছে দেখিয়াছিলেন। যখন তিনি বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন, মা নিজে তাঁহার হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলেন, 'কামারপুকুরে শীতলার পূজো দিয়ে যাবে।'

ছেলেদের জন্য শ্রীশ্রীমার ভাবনার অন্ত ছিল না। পাছে তাহারা ঘটনা-চক্রে বিরূপ অবস্থায় পড়িয়া কষ্ট পায়, তজ্জন্য সর্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। বিভূতিবাবু বলেন: তখন স্বদেশের কাজে লিপ্ত যুবকদের উপর সরকারের বিষদৃষ্টি পড়িয়াছিল এবং মার কাছে যে সকল ভক্ত আসিতেন, পুলিশের লোক আসিয়া নিত্য তাহাদের সন্ধান লইত। একবার বাঁকুড়া জেলার পুলিশের বড়কর্তা শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হন। আমি তাঁহাকে শিরোমণিপুর হইতে সঙ্গে করিয়া জয়রামবাটীতে লইয়া যাই। তাঁহার আগমনের কথা শুনিয়া মা ঘরের ভিতর হইতে বলিলেন, 'ওকে ডেকে নিয়ে এস।' ভোলানাথবাবুর পায়ে বুট পরা ছিল; বেলা অধিক নাই দেখিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, 'ভিতরে যেতে হলে আমাকে বুট খুলতে হবে।' মা সেইকথা শুনিয়া বলিলেন, 'আমি যাচ্চি।' মা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভোলানাথবাবু করজোড়ে প্রণাম করিলে

আশীর্বাদ করিলেন, 'তোমার ভক্তি হোক।' তারপরে মা এক বাটি জিলিপী আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন। শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি অল্প একটু মুখে করিয়া বলিলেন, 'মা, আপনার কি ভয় হয়—এখানে যে-সব লোক আসে তাদের নাম লেখা হয় বলে?' আমি বলিলাম, 'ভয় কেন হবে?' মা কিন্তু ঘোমটার ভিতর হইতে আস্তে আস্তে কহিলেন, 'না বাবু, আমার ভয় হয়।' ভোলানাথবাবু কহিলেন, 'ভয় কিসের মা, আপনি কি বলতে পারেন, কোন ভক্ত লোককে কষ্ট দেওয়া হয়েচে? যারা দুষ্ট লোক তাদেরই ভয়ের কথা। আমি যতদিন আছি, ততদিন ভয়ের কোন কারণ নাই।' এই কথায় মা তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন, 'তুমি দীর্ঘজীবী হও!' প্রায় পনর মিনিট কথা কহিয়া পালকিতে চাপিয়া যাইতে যাইতে ভোলানাথবাবু বলিলেন, 'আমার দেহ সম্বন্ধে মাকে কিছু বল্লে না?' আমি বলিলাম, 'আমি ওসব পারব না।' তিনি চলিয়া গেলে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কি ব'লেছিল?' আমি বলিলাম, 'ওর শরীরের কথা আপনাকে বলতে বলেছিল, আমি বল্লুম, পারব না।' মা বলিলেন, 'পারবে না কেন? ওসব লোক বেঁচে থাকলে অনেকের উপকার হয়।'[৩]

ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল প্রত্যেক বৎসর অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নৌকাযোগে সপরিবার বেলুড় মঠে ও দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। একবার দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার পথে খুব জলঝড় হয় এবং তাঁহারা কোনও রূপে কূলে অবতরণ করিবামাত্র নৌকাখানি ঝড়ের বেগে ছিটকাইয়া দূরজলে চলিয়া যায়। সেদিন অনেকরাত্রে তাঁহারা কলিকাতার বাসায় প্রত্যাবর্তন করেন। পরদিন সকালে ডাক্তার শ্রীশ্রীমাকে সেকথা জানাইলে মা বলিলেন, 'তুমি আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, আর কখনো অক্ষয়তৃতীয়ার দিন নৌকো ক'রে মঠে বা দক্ষিণেশ্বরে যাবে না।'

অহেতুক করুণার বশে শ্রীশ্রীমা বহু সন্তানের দুরারোগ্য ব্যাধির ভোগ

---

৩ গ্রন্থপ্রণয়ন-কালে ভোলানাথবাবু হাওড়ার পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তৎসম্পর্কিত ঘটনাটি যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে কি-না জানিবার জন্য তাঁহার অভিমত লইতে যাই। তিনি বর্ণনাটি পড়িয়াই বলেন, 'ঠিক হয়েচে!'

নিজের দেহে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দেবী বলেন ঃ আমি যখন জয়রামবাটীতে দীক্ষা নিতে যাই, সেই সময়ে আমার হাতে একগাছি রূপার তাগা ছিল, হিষ্টিরিয়া রোগের প্রতিকারের জন্য। উহাতে যে বিশেষ কিছু উপকার হইত এমন নহে। রোগের কথা কেহ স্মরণ করাইয়া দিলে সেইদিন অনিবার্যরূপে উহা ঘটিত এবং ক্রমাগত পাঁচ-সাত দিন নিত্য সন্ধ্যার সময়ে সুরু হইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত স্থায়ী হইত। আমার হাতে তাগা দেখিয়া পাগলী-মামী উহা কেন পরিয়াছি জিজ্ঞাসা করিলেন। মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কেন সব কথা লোককে জিজ্ঞাসা কর? কোন অসুখের জন্যে প'রে থাকবে আর কি।' তারপর আমাকে কহিলেন, 'তোমার আর এ তাগা পরবার দরকার নাই মা, এ রোগ তোমার অমনিই সেরে যাবে।' তদবধি সেই রোগ আমার আর কখন হয় নাই; ইহার পরে তো কত হিষ্টিরিয়া-রোগীরই সেবা করিয়াছি!

সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় বলেন ঃ বরিশালে কয়েকটি যক্ষ্মারোগীকে দেখিবার ফলে সেই রোগ আমার দেহে সঞ্চারিত হয় এবং সর্দিকাশি হইয়া ও মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়া শয্যাগত হইয়া পড়ি। মনে হইয়াছিল আর বাঁচিব না! মরিবার পূর্বে একবার শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে সাধ হয় ও এই মর্মে একখানা পত্র লিখি ঃ 'মা, আমার এই রকম অসুখ—বাঁচিব না। সাধ, মরিবার পূর্বে একবার তোমাকে দেখি। আমি এখন নিঃস্ব, রুগ্ন—সাধ্য নাই তোমার কাছে যাই; কিন্তু তুমি ইচ্ছা করিলে বরিশালে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইতে পার। মা, একবার আমাকে দেখিয়া যাও।' মা আমাকে নিজের একখানি ফটো ও এক বৎসরের বাঁধানো উদ্বোধন (১৩১৯-২০) পাঠাইয়া উত্তরে লিখিলেন, 'বাবাজীবন,...ভয় নাই, অসুখ তোমার সারিয়া যাইবে। অতদূর যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার যে ফটো পাঠাইলাম উহাই দেখিও এবং উদ্বোধনখানা পড়িও।'[৪] ফটো পাইয়া আমি যেন সাক্ষাৎ মাকেই পাইলাম, মনে হইল। ফটোখানি শিয়রে রাখিয়া দিলাম—ক্রমে রোগ সারিয়া গেল।

---

৪ উদ্বোধনে এই সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ প্রকাশিত হইতেছিল।

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ ধর্মসাধনার অঙ্গ জ্ঞানে নিজের খেয়াল-বশে চলিয়া দারুণ বক্ষ-রোগে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘকাল নানাপ্রকার চিকিৎসা করিয়াও কোনরূপ ফল প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার কাশিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে দেখিয়া মা কেবল বলিয়াছিলেন, 'বাছার আমার বড় কষ্ট!' ইহার পরে অল্পদিনের মধ্যেই সেই রোগ একেবারে সারিয়া যায়।

বিভূতিবাবু বলেন: ব— প্রভৃতি রিলিফ-কার্য করিয়া জয়রামবাটী আসিয়াছে। মা একটাকার গরম জিলিপী আনাইলেন এবং ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া সেই জিলিপী ও মুড়ি সকলকে খাইতে দিলেন। আমরা বড় মামার বৈঠকখানায় বসিয়া যেই খাইতে যাইব, মা কহিলেন, 'কপাটটা দিয়ে দিও, লোকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকবে' পরে মা ব—কে দেখাইয়া আমাকে বলিলেন, 'ছেলেটি কে? ওঃ! মনে প'ড়েচে। কাশীতে যখন এল' মাথায় তখন চুল বেশী নাই—উস্‌কো খুস্‌কো চেহারা। আর এখন ছ্যাখ, কেমন [রূপ] হ'য়েচে! এই জন্যেই (নিজের পা দেখাইয়া) এই সব [পায়ের অসুখ]।'

শ্রীশ্রীমাকে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখিয়া এক সময়ে কোন সেবক বলিয়াছিল, 'মা, আপনি এত কষ্ট পাচ্চেন, কষ্টটা আমায় দিন না?' একথায় মা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, 'বল কি? ছেলে! মা কখন ছেলেকে দিতে পারে? ছেলের কষ্ট হ'লে যে মার আরো বেশী কষ্ট হ'য়ে থাকে। (শান্ত হইয়া) আমি সেরে যাব, ভয় নাই।' [আ]

* * * *

বাহির হইতে দেখিতে গেলে শ্রীশ্রীমার ভক্তসেবা এক বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিন্তু তাঁহার কাছে উহা কত সহজ ও স্বাভাবিক নিত্যকার ঘটনা। সময়ে অসময়ে নিত্য নূতন লোক আসিতেছে, তাহাদের জাতিবর্ণ, নামধাম বা পদবী কোন কিছুই বিশেষ করিয়া জানা নাই; গ্রামের লোক অবাক বিস্ময়ে, কখনও বা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে—তাহাদের প্রায় সকলেই যে ভদ্রঘরের সন্তান এবং অনেকেই উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদবীবিশিষ্ট তাহা তাহাদের আকৃতি ও চালচলন দেখিয়া এবং কথাবার্তা শুনিয়া অনুমান করিয়া লইতেছে; কিন্তু

যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এই সকল ভক্তের গমনাগমন ও স্থিতি, তাঁহার মনে কোনরূপ বিস্ময় বা কৌতূহল তো নাইই, কি করিয়া তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবেন তজ্জন্য কিছুমাত্র উদ্বেগও নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কোন সময়েই নিশ্চেষ্ট নহেন; নিঃসঙ্কোচে, নিরুদ্বেগে তাহাদের অভ্যাস ও রুচির অনুকূল দ্রব্যাদি যথাসম্ভব সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার কর্মেরও বিরাম নাই।

আগন্তুক ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো বিদেশে চাকুরি করেন এবং ঘুম হইতে উঠিয়া হাত-মুখ ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চা-পানটি অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন, শ্রীশ্রীমা পাত্রহস্তে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কাহার ঘরে গাই দোহানো হইয়াছে—একটু দুধের প্রয়োজন, ছেলেরা চা খাইবে।

জয়রামবাটীর মত ক্ষুদ্র গ্রাম—তরীতরকারী বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না; দূরবর্তী হাট হইতে মধ্যে মধ্যে তরকারী ও অন্যান্য দ্রব্য আনীত হইলেও তাহাতে সকল সময়ে কুলায় না। লোকজন খাওয়াইবার মত ঘরে তেমন কিছু নাই, এমন সময় হয়তো কয়েকজন ভক্ত আসিয়া উপস্থিত। শ্রীশ্রীমা তাহাদিগকে জলখাবার খাইতে দিয়া প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া কিছু তরকারী সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। এদিকে পা খোঁড়াইয়া চলিতে হইতেছে, পায়ে বাত।

পল্লীগ্রামে সহজলভ্য মুড়িগুড় জলখাবার সকল ভক্তের মনঃপূত হইত না, সকলে খাইতেও পারিতেন না। শ্রীশ্রীমা তাঁহাদিগকে ফলমিষ্টি-হালুয়াদি প্রসাদ ঠাকুরের পূজান্তে খাইতে দিয়া, আঁচলে খানিকটা মুড়ি ও লঙ্কা লইয়া বারান্দায় পা মেলিয়া জলযোগ করিতে বসিতেন। ভালর মধ্যে, শরীরের অনুরোধে, কেবল মিছরির সরবৎটুকু গ্রহণ করিতেন। যেদিন ঘরে মুড়িগুড় ব্যতীত অন্য কিছু থাকিত না, সেদিন তাঁহাকে কখন কখন অসুবিধায়ও পড়িতে হইত। শৌরীন্দ্রনাথ মজুমদারকে মুড়ি, মুটি আর গুড় খাইতে দিলে তিনি দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, 'একি খাবার খেতে দিয়েছ? এগুলো আমি খাই না।' তখন মাকে বুঝাইয়া বলিতে হয়, "বাবা, এখানে এই পাওয়া যায়, আর কিছু পাওয়া যায় না। এ খেলে

অপকার হবে না, খাও বাবা। যখন ক'লকাতা যাব, তখন তোমাকে ভাল ক'রে খাওয়াব।'

পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গে মাছ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় এবং পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ লোকই দুইবেলা মাছের ঝোল দিয়া ভাত খাইতে অভ্যস্ত। তাহারা জয়রামবাটী যাইলে শ্রীশ্রীমা তাহাদিগকে মাছ খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। কিন্তু ইচ্ছামাত্র সেখানে ভাল মাছ সংগ্রহ করা সকল সময়ে সম্ভবপর হইত না।

এই সমস্ত অসুবিধা সত্বেও শ্রীশ্রীমা তাঁহার ভক্ত-সন্তানগণকে খাওয়ানো অতি সহজ জ্ঞান করিতেন। গৃহাগত আত্মীয়কুটুম্বের মনস্তুষ্টি বিধানে বিব্রত হইয়া মা তাঁহার ভ্রাতৃজায়াদিগকে অনেক সময়ে বলিয়াছেন, 'ওগো, আমার ছেলেপুলের কিছু জ্বালা নাই; আমার একশ' ছেলে যদি আসে, আমি সকলকেই আঁটাতে পারি।' [ই]

শ্রীশ্রীমা তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকেই যেন উত্তম বস্তুটি খাওয়াইতে চাহিতেন। কখন কখন এমন দেখা গিয়াছে যে ভক্তেরা এক এক করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে যাইতেছে আর মা প্রত্যেককেই প্রসাদী দ্রব্যের মধ্যে যেটি সর্বোৎকৃষ্ট সেইটি দিয়া পরিতুষ্ট করিতেছেন। প্রথমাগত ব্যক্তি তাঁহার কাছে উত্তম বস্তুটি পাইয়া সরিয়া পড়িল; দ্বিতীয় ব্যক্তি অবশিষ্ট প্রসাদের মধ্যে যেটি উত্তম বলিয়া বোধ হইল, সেইটি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। এইরূপে প্রত্যেকেই মনের মত বস্তুটি পাইয়া ভাবিতে লাগিল, মা তাহাকেই বিশেষ স্নেহ করেন!

শ্রীশ্রীমার সকল সন্তানেরই উপর সমান আন্তরিক টান ও সীমাহীন স্নেহ ভক্তদের মনে এক এক সময়ে অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার করিত। নলিনবাবু বলেন: বেলডিহার শ্যামদাস গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া হঠাৎ একদিন মাকে দর্শন করিতে যাই। দেখা হইবামাত্র আমরা কিছু বলিবার আগেই মা কহিলেন, 'আহা, তোমরা কত রাস্তা ঘুরেচ বাছা! কত কষ্ট হ'য়েচে! আগে জল খাও।' মা আমাদের দুইজনকেই নিকটে বসাইয়া মুড়ি-সন্দেশ খাওয়াইলেন। দুপুরবেলা প্রায় পনরজন একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিলাম। মা নিজে পরিবেষণ করিতেছিলেন; আমার মনে হইতেছিল, মা যেন

আমাকেই বিশেষভাবে খাওয়াইতেছেন! এত লোকের মধ্যে আমার প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করাতে, অন্তরে আনন্দিত হইলেও, লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। আহারান্তে সেই কথা অন্য সকলের কাছে প্রকাশ করিতে যাইয়া দেখি, সকলের অনুভূতি একই প্রকারের হইয়াছে—প্রত্যেকেই ইহা অনুভব করিয়াছে যে, মা তাহাকেই বিশেষ স্নেহ করিয়া খাওয়াইয়াছেন!

শ্রীশ্রীমার এই স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহধারা কেবলমাত্র তাঁহার সমীপাগত ও তাঁহাতে দেবী-বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণের পিপাসা চরিতার্থ করিয়াই নিবৃত্ত হইত না। জয়রামবাটী গ্রামের ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহের বহুলোকও সময়ে সময়ে উহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইত। তবে কি-যে দেবদুর্লভ বস্তু তাহারা বহুভাগ্যে ভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহা যেন কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। বাহ্য জগতের কাছে চির-অবগুণ্ঠনময়ী মা চতুষ্পার্শ্ববর্তী লোক-দিগকে নিত্য দর্শনদান করিয়াও তাহাদের প্রায় সকলেরই কাছে তৎকালের জন্য নিজেকে যেন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন! ঐ সকল প্রতিবেশী ও পরিজন ব্যতীত, যাহারা দিনের মধ্যে দশবার শ্রীশ্রীমার সংস্পর্শে আসিতেন এমন ভক্তলোকদের কাছেও তিনি নিজের স্বরূপ প্রায়শঃ গোপন রাখিতেন বলিয়াই মনে হয়। উদ্বোধন-আপিসের কর্মচারী শ্রীচন্দ্রমোহন দত্ত একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'মা, আপনাকে কত দূরদেশ থেকে কত লোক দর্শন করতে আসে। আপনি তো ঘরের ঠাকুরমার মত পান সাজেন, সুপারি কাটেন, কখন বা ঘর ঝাঁট দেন।* আপনাকে দেখে আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।' তাহাতে মা উত্তর দেন, 'চন্দ্র, তুমি বেশ আছ; আমাকে তোমার বুঝবার দরকার নাই।'

উপযুক্ত লোক পাইলে স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীমার জন্য কলিকাতা হইতে ফলমিষ্টি পাঠাইয়া দিতেন। কখন কখন সম্পন্ন গৃহস্থ-ভক্তেরাও মাতৃদর্শনে আসিবার সময় ফলমিষ্টি সঙ্গে লইয়া আসিতেন। ঐসকল দ্রব্যের কিয়দংশ মা কামারপুকুরে ৺রঘুবীরের ভোগের জন্য পাঠাইতেন; কিয়দংশ গ্রামস্থ

* শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, 'ছাই-চাপা বেরাল'।

৺সিংহবাহিনী ও অন্যান্য দেবতাকে দিতেন এবং বাকী সমস্তই ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া, পরিমাণে অধিক হইলে, ভক্তমণ্ডলী ও আত্মীয়স্বজন ব্যতীত গ্রামবাসীদের মধ্যেও বণ্টন করিতেন। মার বাড়ীতে প্রসাদভোজনে গ্রাম-বাসীরা কিরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিল তাহার একটি চিত্র প্রদান করিলে মন্দ হয় না। উমেশবাবু লিখিতেছেন: একবার জয়রামবাটীতে মার জ্বর হয়। তাঁহার অসুখ শীঘ্র সারিয়া গেলে ৺সিংহবাহিনীর পূজা দিব, মানত করিয়াছিলাম। প্রায় সকলেরই ইচ্ছা ছিল দেবীকে একটি পাঁঠা দিয়া পূজা দেওয়া হয়। মাকে সেই কথা জানাইলে মা পাঁঠার পরিবর্তে কিছু মিষ্টি আনাইতে বলিলেন।[৬] তদনুসারে কয়েক টাকার রসগোল্লা আনাইয়া ৺সিংহবাহিনীকে পূজা দেওয়া হইল। স্থির হইল, বিকালবেলা সেই প্রসাদ সকলকে বিতরণ করা হইবে। প্রায় চারিটার সময় ঘণ্টাধ্বনি করা হইল; অল্পক্ষণ পরে দ্বিতীয়বার ঘণ্টাধ্বনি করিবামাত্র দলে দলে আবালবৃদ্ধ সকলে কেহ বাটি কেহ বা ডালা হাতে করিয়া আসিতে লাগিল এবং মার বাড়ীর পশ্চিমদিকের

---

[৬] শ্রীশ্রীমা নিজে সম্মুখে থাকিয়া পশুবলি দেখিতে পারিতেন না। জয়রামবাটীতে ৺জগদ্ধাত্রীপূজায় প্রথম প্রথম বলি হইত; এক বৎসর মা উহা বন্ধ করিয়া মিষ্টিভোগ দেন, তদবধি আর বলি হয় না। মঠে যেবার প্রথম দুর্গোৎসব হয়, স্বামিজী বলি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মার আদেশে বলি রহিত হয়। জয়রামবাটীর এবং মঠের পূজাদিতে যজমানরূপে মার নামে সঙ্কল্প হইয়া থাকে। তিনি কেবলমাত্র নিজের কৃত পূজায়ই বলি বন্ধ করিয়াছেন দেখা যায়। একবার মা তাঁহার পালিতা কন্যা রাধুর জন্য ৺সিংহবাহিনীকে দুইটি পাঁঠা মানত করিয়া বলি দেওয়াইয়াছিলেন।

শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্তী বলি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমার মতামত জানিতে চাহিলে মা তাঁহাদের বাড়ীতে বলি দেওয়া হয় কি-না জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলি দেওয়া হয় শুনিয়া বলিলেন, 'বাড়ীতে যে নিয়মে পূজা, বলি হয়, সেই নিয়মেই চলবে। তুমি নিজের হাতে বলি দিয়ো না।'

শ্রীশ্রীমা প্রসাদী মাংস স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভক্তদিগকে খাওয়াইতেন। বিভূতিবাবু বলেন: আমি একদিন ৺সিংহবাহিনীর পূজা দেখিতে গিয়াছিলাম। সেদিন অনেক পাঁঠা বলি হইয়াছিল, আমাকে পাঁঠার একখানা পা পাঠাইয়া দেয়। তাহা দেখিয়া নলিনী 'ছিছি মাগো—মাংস গো—এসব ক'রবে কে?' ইত্যাদি কথা বলিতে থাকে। শুনিয়া মা বলিলেন, 'এরকম ক'স্তে নাই সাক্ষাৎ মহামায়া খেয়েচেন—মহাপ্রসাদ। তোরা

রাস্তায় ছুইসারি হইয়া মাটিতেই বসিয়া পড়িল। মা সদর দরজায় দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। সাধুরা পরিবেষণ করিতেছেন আর সকলে জয়ধ্বনি দিয়া আনন্দে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতেছে। মার অধরে মৃদুমন্দ হাসি, মুখমণ্ডল স্বর্গীয় স্নেহে উদ্ভাসিত।

মনে পড়ে, শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ একসময় আমাদিগকে বলিয়াছেন : মার কাছে আমি কখন ধর্মলাভের জন্য যাই নাই ; সাধারণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা তিনি যে কোন বিশেষগুণসম্পন্ন তাহাও জানিতাম না। আমার শ্বশুর-বাড়ীতে যাতায়াত করিবার কালে রাস্তায় জয়রামবাটী পড়িত বলিয়া সেখানে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিতাম ও যেন কি-এক আকর্ষণ-বলে আকৃষ্ট হইয়া মার কাছে যাইয়া উপস্থিত হইতাম। মা আমাকে মুড়ি, গুড় ও জল খাইতে দিতেন। প্রত্যেকবার শ্বশুর-বাড়ীতে যাওয়া ও তথা হইতে ফিরিয়া আসার পথে তাঁহার হাতে মুড়িগুড় খাওয়া শেষকালে আমার নিয়ম হইয়া গিয়াছিল। উহা না হইলে যেন তৃপ্তি হইত না।'

মাতৃহৃদয়ের এই ছুবার আকর্ষণ এমন বহুলোকই উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছে, অপার সুকৃতি-বশে তাঁহার বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত সন্তানগণের তো কথাই নাই। ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ কাছে না থাকিলে শ্রীশ্রীমা বৎস-হারা গাভীর মতই অভাব অনুভব করিতেন। তবে ভাব চাপিবার অসীম ক্ষমতাবলে সহজে তাহা বাহিরে প্রকাশিত হইতে দিতেন না। কদাচিৎ

না পারিস, আমি রাঁধব।' খাওয়ার পর মা বিশ্রাম না করিয়া সেই মাংস রান্না করিলেন। বিকালে আমাকে একবাটি মাংস খাবার দিয়া বলিলেন, 'খাও বিভূতি, মার প্রসাদ—খেলে শক্তি হবে।' শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায় বলেন : নবমীর দিন বিকালে প্রসন্ন-মামা পূজা করিয়া একটি পাঁঠার মুড়া লইয়া আসিয়াছেন। মা স্বহস্তে রান্না করিলেন এবং খাইবার লোক বেশী ছিল বলিয়া তাহাতে প্রচুর আলু ও জল দিলেন। কিন্তু সে মাংসের যে কি অপূর্ব স্বাদ হইয়াছিল, জীবনে এমনটি আর কখন খাই নাই।

শ্রীমতী গিরিজা গুপ্তার সাক্ষাতে মা কোন ভক্তকে বলিলেন, 'বাধুর বর মাংস খেতে চায়, তুমি মাংস এনে দিতে পার?' ভক্তটি বাজারের মাংস আনিবার প্রস্তাব করিলে মা বলিলেন, 'ও তো বৃথা মাংস।' মা অধিক দাম দিয়াও কালীঘাটের প্রসাদী মাংস আনিতে বলিয়া দিলেন।

অনুচ্চস্বরে তাঁহাকে বলিতে শুনা গিয়াছে, 'ছেলেরা তোরা আয়!' একবার স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ মার জন্মতিথির আগে জয়রামবাটীতে গেলে মা বলিয়াছিলেন, 'এসেচ বেশ ক'রেচ; আমি তোমাকে কদিন ধ'রে ডাকচি—রাজেনকে ডাকতে গিয়ে তোমার নাম ধ'রেই ডাকচি!'

এই সীমাহীন স্নেহের কাছে আপন গর্ভধারিণীর স্নেহও যে তুচ্ছ হইয়া যাইবে ইহা বিচিত্র নহে। সমীপাগত কোন কোন জননীও ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে ছেলেকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিতে দেখিয়া রোহিণীবালা ঘোষ বলিয়াছিলেন, 'বিভূতি এখানে তো বেশ খায়, আমার ওখানে মাত্র এত কটি খায়!' অমনি মা বলিলেন, 'আমার ছেলেকে তুমি খুঁড়ো [দৃষ্টি দিয়ো] না। আমি ভিখারীর রমণী, আমার ছেলেদিকে আমি যা খেতে দি, ছেলেরা আমার তাই আদর ক'রে খায়।'

স্নেহ-বিতরণে শ্রীশ্রীমা সুপুত্র-কুপুত্রের মধ্যে তারতম্য করিতেন না—গুণী-দোষী বিচার করিতেন না। যাহাকে অন্য সকলে অবজ্ঞা উপেক্ষা করে, মা যেন তাহারই পক্ষে থাকিতেন বলিয়া বোধ হইত। চিকিৎসাসূত্রে দীর্ঘকাল জয়রামবাটীতে থাকিয়া স্বামী মহেশ্বরানন্দ দেখিয়াছেন, অত্যন্ত অসৎপ্রকৃতি লোকের সমস্ত দোষ-দুর্বলতা জানিয়াও শোকে বিপদে সময়োচিত সহানুভূতি করিতে, ঔষধপথ্যাদি দিয়া সাহায্য করিতে মা বিরত হইতেন না এবং তদ্রূপ করিতে অপরকেও শিক্ষা দিতেন। ইহার ফলে কত দুশ্চরিত্র লোকের স্বভাব যে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা কেহই জানে না। এমন কি, দস্যুরাও মার সংস্পর্শে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই লোকের অনিষ্টসাধন-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে।

আমজাদের বাড়ী শিরোমণিপুর—একজন ডাকাত। তাহার জেল হইয়াছিল, বাড়ীতে বড় কষ্ট। একদিন দেখা গেল, তাহার স্ত্রী আর মা খুব কাতরভাবে মার বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া আছে: মা তাহাদিগকে একটি টাকা দিলেন। আমজাদ যখন মার বাড়ীতে কজকর্ম করিত, মা নলিনীর ঘরের বারান্দায় তাহাকে ভাত খাইতে দিতেন, মুসলমান বলিয়া বিশেষ দ্বিধাবোধ করিতেন না। পূর্বে শিরোমণিপুরের মুসলমানদের মধ্যে অনেকে ডাকাতি করিত বলিয়া জয়রামবাটীর লোক তাহাদিগকে মজুর

খাটাইত না। মার বাড়ীতেই তাহারা প্রথম কাজ পায়, আর মার কৃপাতেই তাহাদের অনেকের মতিগতি পরিবর্তিত হয়। [বি]

শ্রীশ্রীমা যখন ১০-২ নম্বর বোসপাড়া লেনে বাস করিতেছিলেন, মঠের একটি উড়িয়া চাকরকে চুরি করা অপরাধে স্বামিজী তাড়াইয়া দেন। সে নিরুপায় হইয়া মার কাছে উপস্থিত হইয়া, 'মা, আমি গরীব লোক, যা মাইনে পাই তাতে আমার কুলায় না। বাড়ীতে সংসার আছে, তাই আমার স্বভাব এরকম—' বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। মা দয়াপরবশ হইয়া লোকটিকে নিজের কাছে রাখিয়া স্নানাহার করাইলেন। ঐদিন বিকাল-বেলা স্বামী প্রেমানন্দ মাকে প্রণাম করিতে আসিলে মা বলিতে লাগিলেন, 'দ্যাখ বাবুরাম, এই লোকটি বড় গরীব; অভাবের জন্যে সংসারের তাড়নায় ওরকম ক'রেচে। তাই বলে কি নরেন ওকে গালমন্দ ক'রে তাড়িয়ে দিলে? তোমরা সন্ন্যাসী—সংসারের যে বড় জ্বালা, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না! লোকটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।' উহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলে স্বামিজী বিরক্ত হইবেন জানাইলে মা উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, 'আমি ব'লচি, নিয়ে যাও।' সন্ধ্যার কিছু পূর্বে লোকটিকে সঙ্গে লইয়া বাবুরাম-মহারাজ মঠে প্রবেশ করিলেন। স্বামিজী তখন বারান্দায় বসিয়া-ছিলেন, দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'ওটাকে আবার নিয়ে এসেচে—বাবু-রামের কাণ্ড দেখেচ?' বাবুরাম-মহারাজ মার আদেশ জানাইলে স্বামিজী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া লোকটিকে মঠে স্থান দিলেন।

শ্রীশম্ভুচরণ মণ্ডল বাড়ীতে বিবাদ করিয়া প্রায় চব্বিশ বছর বয়সে বাহির হইয়া যান ও জয়রামবাটীতে আসিয়া মুনিষ নিযুক্ত হন। রৌদ্রে খাটিয়া ঘর্মাক্ত ও পিপাসার্ত হইয়া যখন তিনি ঘরে ফিরিতেন ও 'মা, জল দাও' বলিয়া ডাকিতেন, শ্রীশ্রীমা তাড়াতাড়ি তাঁহার জন্য জল ও গুড় লইয়া আসিয়া বলিতেন, 'লও বাবা, বড় কষ্ট হ'য়েচে, আহা!' আর স্বহস্তে পাখার বাতাস দিয়া তাহার দেহনিঃসৃত ঘর্মবিন্দু নিঃশেষে মুছিয়া দিতেন। কোন দিন শম্ভু বাহিরে আড্ডা দিয়া অধিক রাত্রে ভয়ে ভয়ে বাড়ীতে আসিলে মা হাসিমুখে বলিতেন, 'কিরে, শম্ভু এসেচ বাপ, এস ভয় নাই, খাওয়া দাওয়া সেরে নাও।'

এই সর্বমঙ্গলা মাতৃশক্তি দুর্নিবার বেগে, অথচ যেন অজ্ঞাতসারে, লোকের মনের উপর কার্য করিয়া এমনভাবে পরিবর্তন আনিয়া দিত যে তাহারা উহার নির্দেশ অবনত মস্তকে পালন না করিয়া পারিত না; এবং ঐরূপ করাই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিত। বিবাদ-বিসংবাদে দুর্বল ও ন্যায্যপক্ষ সেইজন্যই অনেক সময়ে শ্রীশ্রীমার কাছে আসিয়া বিচারপ্রার্থী হইত। স্বামী অসিতানন্দ বলেন: একদিন মা জগদম্বা-আশ্রমের বাহিরে তেঁতুল-তলায় খাটের উপর বসিয়া আছেন, এমন সময় গ্রামস্থ এক ডোমের মেয়ে আসিয়া কাঁদিয়া বলিল যে, তাহার উপপতি তাহাকে অসময়ে ত্যাগ করিয়াছে—সে তাহার জন্য সর্বস্ব ছাড়িয়া আসিয়াছিল। তাহার করুণ কাহিনী শুনিয়া মা সেই লোকটিকে ডাকাইলেন, এবং স্নেহপূর্ণ মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, 'ও তোমার জন্যে যথাসর্বস্ব ফেলে এসেচে; এতকাল তুমি ওর সেবাও নিয়েচ; এখন যদি ওকে ত্যাগ কর, তোমার মহা অধর্ম হবে—নরকেও স্থান হবে না।' মার কথায় লোকটির চৈতন্য হইল ও স্ত্রীলোকটিকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গেল।

লোকের কল্যাণ-সাধনে এই অহেতুকী আন্তরিকতা ছিল বলিয়াই শ্রীশ্রীমা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যখন যে প্রার্থনা উচ্চারণ করিতেন তাহা ব্যর্থ হইত না। কোন কোন ভক্তের কাছে মা বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুর চলে যাওয়ার পর যখন ছেলেরা সব ঘরবাড়ী ছেড়ে আসতে আরম্ভ ক'ল্লে, তখন আমি কেঁদে কেঁদে ঠাকুরের কাছে কত প্রার্থনা ক'রেচি, ওদের যেন মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয়। তাই ঠাকুর এখন দিচ্চেন।' এক বৎসর অনাবৃষ্টিতে জয়রামবাটী অঞ্চলের ক্ষেতের শস্য জ্বলিয়া যায়। চাষীরা মার কাছে যাইয়া বলে, 'এবার মা, আমাদের ছেলেপুলের বাঁচার আশা নাই—সকলকেই না খেয়ে ম'র্ত্তে হবে।' একথা শুনিয়া মা তাহাদের সঙ্গে ক্ষেত দেখিতে গেলেন ও চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'হায় ঠাকুর, একি ক'ল্লে! শেষটায় কি এরা না খেয়ে ম'রবে?' সেই রাত্রিতেই মুষলধারে বৃষ্টি হইল। সেই বৎসর এত শস্য জন্মিয়াছিল যে, বহু বৎসরের মধ্যে এরূপ হইতে দেখা যায় নাই। [সু]

* * * *

শ্রীশ্রীমার লোক-কল্যাণসাধনে একটি বিশেষত্ব সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়। যেখানে একের বাসনাপূর্তি অন্যের বা অনেকের অনিষ্ট করে, যেখানে ব্যক্তি-বিশেষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার অর্থ তদীয় পরিবারের অনেককে নিরাশ্রয় করা, সেখানে মা ঐ ব্যক্তিবিশেষের মনস্কামনা সর্বাংশে পূর্ণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন এবং নিজের অচিন্ত্যশক্তি-বলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণের মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য আনিয়া দিতেন; দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীহরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "প্রথম-বয়সে আমি ক্যালকাটা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীতে কাজ করিতাম। বেতন কুড়িটাকা মাত্র, কিন্তু উপরি পাওনা যথেষ্ট। অসদুপায়ে উপার্জন করিতে হয় বলিয়া মনে ধিক্কার আসে। তখন সেই কাজ পরিত্যাগ করিয়া জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে ঠিকাদারের কাজ স্বীকার করি। অল্পদিনেই বুঝিলাম যে এই কাজটি ততোধিক। মনে গ্লানি জন্মিল, সে কাজও ছাড়িয়া দিলাম। কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া একেবারে জয়রামবাটীতে যাইয়া শ্রীশ্রীমার সমীপে উপস্থিত হইলাম। মুখ ফুটিয়া মাকে কিছুই বলিলাম না, কিন্তু আমি স্নান করিয়া আসিবামাত্র তিনি আমাকে ডাকাইয়া নিলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই দীক্ষা দিলেন।

"দুপুরবেলা আহারের সময় যখন আসিল, মা খাবারের থালাখানা ধরিয়া দিয়া একখানি পাখা হাতে নিয়া থালার কাছে বসিলেন ও আমাকে খাইতে বলিলেন। আমি তখন সুযোগ বুঝিয়া বলিলাম, 'মা, আমি তো তোর[১] কাছে খাওয়ার জন্যে আসি নি; আমার মনে যে ব্যথা আছে, তার একটা প্রতিকার না করলে আমি খাব না।' অবশ্য, কোনরূপ সাংসারিক অভ্যুদয়ের ইচ্ছা আমার মনে ছিল না; একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় ও সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাই—এই আকাঙ্ক্ষা লইয়াই তাঁহার কাছে

---

[১] শ্রীশ্রীমার প্রতি 'তোর' ইত্যাকার শব্দ-প্রয়োগ সরল-বিশ্বাসী এই একটিমাত্র ভক্তই করিয়াছেন দেখা যায়। ক্বচিৎ কোন ভক্ত মাকে 'তুমি' এবং অপর সকলেই 'আপনি' বলিতেন।

গিয়াছিলাম। মা বলিলেন, 'ত্যাখ্, কতকগুলি পোয়্যের ভার ভগবান তোর উপর দিয়েচেন ; তুই সংসার ছেড়ে গেলে তারা নিরাশ্রয় হবে, আর তাদের জন্যে আমাকে ভাবতে হবে। একজনকে সংসার ছাড়তে নিষেধ ক'রেছিলুম; সে কথা না শুনে জেদ ক'রে ধরাতে সংসার ত্যাগ হ'য়ে গেল। তার ছেলেপুলেদের খুব কষ্ট, সেজন্যে আমাকেই বিব্রত হ'তে হয়। আমি তোকে ব'লচি, তোর সংসার ছাড়বার দরকার নাই ; আমার সংসার মনে ক'রে তুই থাক্। তোর কোন ভয় নাই, তোর যা কিছু একদিনেই হ'য়ে যাবে। আর যা রোজগার ক'রবি আমার জন্যেই ক'চ্চিস মনে ক'রবি। না হয়, আমাকে কখন কিছু দিবি। তুই তো আমার ছেলে, ছেলে হ'য়ে মায়ের জন্যে খাটবি না তো খাটবি কার জন্যে ?'"

উপর্যুক্ত ঘটনায় উদ্ধৃত শ্রীশ্রীমার নিজের উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সকলকেই তিনি একই প্রকারের বিধান দিতেন না। ব্যক্তি-বিশেষের আগ্রহ ও ঐকান্তিকতার জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে ভিন্নরূপ বিধানও দিতে হইয়াছে। কিন্তু যেখানেই তিনি ঐরূপ করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের প্রার্থিত সন্ন্যাসাদি দান করিয়াছেন, সেখানেই ঐ ব্যক্তি-বিশেষের উপর একান্তভাবে নির্ভরকারী অনন্যসহায় অপরের ঐহিক পারত্রিক দায়ও যথাসম্ভব নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন কিংবা লইতে চাহিয়াছেন। স্বামী তপানন্দ বলেন : "শ্রীশ্রীমার কাছে সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে মনের অবস্থা অন্তর্মুখী হইল। যখন তখন নাদশ্রবণ ও জ্যোতিদর্শন হইতে লাগিল। ক্রমে আত্মীয়স্বজন সকলকেই ঈশ্বরলাভের পথে বিঘ্ন জ্ঞানে ভয় করিতে লাগিলাম। স্ত্রী নিকটে আসিলে ভয়ে বুক দুড়দুড় করিত, বেশী কথা কহিতে ইচ্ছা হইত না। এক বৎসর যাইতে না যাইতে ঘরে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

"সঙ্কল্প করিলাম, শ্রীশ্রীমার অনুমতি লইয়া সংসার ত্যাগ করিব। অন্নপূর্ণার মা[৮] পূর্বেই স্ত্রীকে লইয়া মার কাছে গিয়াছে এবং যাহাতে মা

---

[৮] ঠাকুরের সময়কার জনৈক স্ত্রী-ভক্ত। তখন মনোহরপুকুরে ই'হাদের বাসার একাংশে বাস করিতেন।

অনুমতি না দেন তজ্জন্য উভয়ে কান্নাকাটি করিয়া আসিয়াছে। তাহারা জানে যে মা অনুমতি দিবেন না। আমি যখন মার কাছে গেলাম সেই সময়ে গোলাপ-মা নিকটে ছিলেন। মার পায়ে মাথা রাখিয়া কেবল কাঁদিতেছি, অশ্রুতে তাঁহার পা ভিজিয়া গিয়াছে, বলিলেন, 'বাবা, গোলাপকে কি স'রে যেতে ব'লব ? আমাকে কি নির্জনে কিছু ব'লবে ?' আমি গোলাপ-মার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'না, উনি থাকুন।' তারপরে বলিলাম, 'মা, আমার ইহকালের পরকালের সব ভারই তো আপনি নিয়েচেন। এখন নির্জনে, পবিত্রভাবে, আপনাকে ও ঠাকুরকে চিন্তা করে জীবনের বাকী দিন কয়টি কাটাব—এই সাধ করে আপনার অনুমতি নিতে এসেচি।' শুনিয়াই গোলাপ-মা বলিলেন, 'মা, ছেলেটির অনুরাগ হয়েচে, তুমি ওকে অনুমতি দাও। অনুমতি না হলে তো ও যেতে পারবে না। অনুমতি না দিলে সংসারে থাকতে না পেরে যদি ও আত্মহত্যা করে, তুমি তার পাতকী হবে।' মা বলিলেন, 'সে যে একেবারে কচি মেয়ে, কি ক'রে দিন কাটাবে !' অমনি গোলাপ-মা বলিলেন, 'মরুক গে ছুঁড়ী।' মা বলিলেন, 'তবে বাঙ্গালা-দেশ ছেড়ে যেয়ো না। মেয়ে যদি চিঠিপত্র লেখে তার উত্তর দিয়ো ; যদি দেখবার জন্যে খুবই ব্যাকুল হয়, কাছে গিয়ে দেখা দিয়ো।

"ইহার পরে অন্নপূর্ণার মা পুনরায় স্ত্রীকে লইয়া মার কাছে উপস্থিত হইলে মা বলিয়াছিলেন, 'আমি কি ক'রে নিষেধ ক'রব মা, ওর ভগবানের জন্যে ঠিক ঠিক অনুরাগ হ'য়েচে। ও তো ঠিকই ব'লেচে, ইহকালের পরকালের ভার তো আমিই নিয়েচি। তুমি তো আমার কাছেই থাকতে পার—তা তোমার শ্বশুর-বাড়ীর আর বাপের বাড়ীর ওরা রাখবে কি ?"

শ্রীশ্রীমার সংস্পর্শে আসিয়া যাঁহাদের স্বামী সংসারত্যাগী হইয়াছেন এমন কোন কোন স্ত্রীলোককে মা নিজের কাছেই স্থান দিয়া উচ্চতর সৌভাগ্যের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। কেহ কেহ স্বেচ্ছায় উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কোন ত্যাগী সন্তানকে মা বলিয়াছিলেন, 'কদিন আগে তোমার পরিবার এখানে এসেছিল ; তা তুমি কি ক'রবে, তুমি তো ব্যবস্থা ক'রে দিয়েচ। আমি এখানে থাকতে ব'ল্লুম, তা শুনলে না ; তার

কপালে এখানে থাকা নাই ঃ বলে, আমার অমুক আছে। এখানে খাওয়া-দাওয়া ক'রে চলে গেল!'

উপরে বর্ণিত তপানন্দ-মহারাজের ও হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎকালীন মানসিক অবস্থা তুলনায় বিচার করিয়া দেখিলে আর একটি বিষয়ও প্রতিভাত হয় যে, দুইজনের ভাবের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ রহিয়াছে বলিয়াই শ্রীশ্রীমা দুইজনকে দুইরূপ বিধান দিতেছেন। একজনের মন সংসার হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; অন্যজন বিরূপ অবস্থার মধ্যে পড়িয়া, যাহাতে মন উঠিয়া যায় তজ্জন্য প্রার্থী। কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ে নহে, আহারাদি সর্ববিষয়েই মা এইরূপ 'যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন' নীতি অনুসরণ করিয়া ব্যবস্থা করিতেন—'যার যা পেটে সয়।' ইহাতে যে তিনি একজন অপেক্ষা অপরকে অধিক স্নেহ করিতেন তাহা বুঝায় না। ব্যক্তিবিশেষে ব্যবহারের তারতম্যকে মাব পক্ষপাতিত্ব জ্ঞান করিয়া কেহ কেহ যে সময়ে সময়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং অচিরেই তাহাদের সেই ভ্রম দূর হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্বামী ধ্রুবানন্দ বলেন: মামাদের জমিজমা ভাগ করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা হইতে পূজনীয় শরৎ-মহারাজ স্বামী ভূমানন্দকে সঙ্গে লইয়া আসেন। স্বামী কেশবানন্দ এই সকল কার্যে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও কোয়ালপাড়া হইতে আনয়ন করা হয়। রাত্রে শরৎ-মহারাজ প্রভৃতির জন্য লুচি হইত, কিন্তু কেশবানন্দ-স্বামীকে মা গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে প্রচলিত রীতি অনুসারে দুপুরবেলার জলে-ভিজানো ভাত খাইতে দিতেন। দুইএক দিন এরূপ হওয়ার পর, মা কলিকাতার লোকদিগকে অধিক খাতিরযত্ন করিতেছেন মনে করিয়া কেশবানন্দ-স্বামীর মনে দুঃখ হয়, কিন্তু কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করেন নাই। সেইদিন রাত্রে খাওয়ার সময় দেখা গেল, তাঁহার জন্যও লুচির ব্যবস্থা হইয়াছে। দুইএক দিন লুচি খাইয়াই তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার পেটে লুচি একেবারেই হজম হইতেছে না; অগত্যা মাকে বলিয়া, পুনরায় ভিজা ভাতেরই ব্যবস্থা করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি-লেখক পরমভক্ত শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন মহাশয় এক

সময়ে অনুরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তল্লিখিত অভিমানজ্ঞাপক কোন পত্রের শ্রীশ্রীমা যে উত্তর দেন তাহা এইরূপ ঃ

শ্রীশ্রীকালী সহায়

চিরজীবেষু—

…তোমার পত্র একখানি পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। মাথাব অসুখ আমাব ভাল হইয়াছে, এখন কিছু যন্ত্রণা নাই। জয়বামবাটী আসিবাব কথা লিখিয়াছ, কিন্তু এসম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র জানি নাই। আমাব দেহে যতদিন প্রাণ থাকিবেক তাবৎকাল পযন্ত আসাযাওয়া কবিবে। আমাব আপনাব পব কেহই নয়, সকলই সমান। কলিকাতাব লোক কিসে আপনাব হইল, আব তুমি বা কিসে পব হইলে? আমাব তো মনেব মধ্যে কিছুই তুই-তুই নাই। যখন ভগবানেব শবণাগত হইয়াছ তখনই আপনাব। তুমি মনে দুঃখ করিও না, যখন তোমাব ইচ্ছা হইবে তখনই তুমি আসিবে। তোমাব পত্র শুনিয়া আশ্চর্য [বোধ] হইল। তুমি মনের ভিতব কিছু ময়লা রাখিও না। ইতি—

পুনশ্চ—তুমি আমাব আশীর্বাদ জানিবে। তোমার ঠিকানা বেশ স্মবণ নাই। আমি শ্রীশ্রী৺গুরুদেবেব কৃপায় ভাল আছি। তুমি আমাকে মাঝে মাঝে পত্র লিখিও। ইতি—তাং ২৮ জ্যৈষ্ঠ, সোমবাব [১৩০২]।

এই পত্রখানি লিখিবার প্রায় একবৎসব পূর্বে, ১৩০১ সালের ১২ই আষাঢ় শ্রীশ্রীমা অক্ষয়বাবুকে আব এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'আমি তোমাকে মনেব সহিত ভালবাসি।' অক্ষয়বাবু স্বভাবতঃ অভিমানী ছিলেন এবং ভাবপ্রবণতাব প্রাবল্যে অনেক সময়েই যে নিষ্কাবণ অভিমান করিয়া বসিতেন সে সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা শুনিয়াছি। তাঁহার লিখিত 'শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ-পুঁথি' নামক শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ-সিক্ত অমরগ্রন্থের স্থানে স্থানে এই অভিমান স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। একস্থানে মাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিতেছেন ঃ

দেখি অসংসারিগণে অতিশয় টান।
গৃহীরা কি বানে ভাসা পরের সন্তান?

তুমি ত করেছ গৃহী দিয়া মায়াঠুলি।
ঘুরাতেছ ঘানি-গাছে খাওয়ায়ে বিচালি ॥
ছুটে ছুটে মরি খেটে, পেটে নাহি ভাত।
তাহার উপরে মা তোমার কশাঘাত ॥
কি বিচার মা তোমার বুঝিবারে নারি।
কোন ছেলে কোলে, কেহ ভূমে গড়াগড়ি ॥
মায়ের নিকটে হেন শোভা নাহি পায়।
এরূপ কোথায় করে কোন্ দেশী মায় ?
অ-মাতার ব্যবহার দেখে কত সই।
কবে দিনু মুখুজ্যের পাকাধানে মই ?

শ্রীশ্রীমার জীবনালোচনায়—আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারি—সংসারত্যাগী অপেক্ষা সংসারী ভক্তদিগের প্রতি তাঁহার 'টান' কিছুমাত্র কম তো ছিলই না ; বরং তুলনা করিয়া দেখিলে সংসারের শত হাঙ্গামায় ব্যতিব্যস্ত, শোকতাপগ্রস্ত গৃহীদের উপর তাঁহার অনুকম্পা যে সমধিক পরিমাণে ছিল একথা স্বীকার করিতেই হইবে। মার কোন সেবক আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, অনেক সময়ে সাধুদের অপেক্ষা গৃহী ভক্তদিগকে মা অধিক ভালবাসিতেছেন দেখিয়া তাহার মনে ঈর্ষা জন্মিয়াছে। গৃহী ভক্তদের মধ্যে কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি যে, কলিকাতায় অথবা কোয়ালপাড়া-মঠে, সাধুদের সাক্ষাতে, মার আদরযত্ন-লাভে তাহারা সঙ্কুচিত হইতেন। জনৈক গৃহী ভক্তকে মা বলিয়াছিলেন, 'ক'লকাতায় তোমাদের সঙ্গে কথা বলার সুবিধে আমার হয় না, তোমাদেরও হয় না ; কোয়াল-পাড়াতেও না। যখন ইচ্ছে এখানে আসবে।' [উ]

বিভিন্ন স্থান হইতে সাধুরা জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে ৺বিজয়ার প্রণাম জানাইয়াছেন। একজন একতাড়া চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া প্রণাম করিতেছে আর বলিতেছে, 'মা, এই কাশীর অদ্বৈতাশ্রমের সাধুদের প্রণাম নিন, এই মঠের সাধুদের প্রণাম নিন, এই মাদ্রাজ মঠের সাধুদের···।' বিভূতিবাবু প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, 'যত বৌ ঝি ছেলেমেয়ে, যে যেখানে আছে, তোমার প্রণামের সঙ্গে তাদের সকলের প্রণাম হোক।'

শ্রীশ্রীমা 'যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন' ব্যবস্থা কেবল মানুষের জন্যই নহে, পশুপক্ষীদিগের জন্যও যথাসম্ভব করিতেন এবং তাহাদের প্রতিও তাঁহার ভালবাসার অভাব ছিল না। তাঁহার পালিতা কন্যা রাধারাণী একটি বিড়াল পুষিয়াছিল। বিড়াল স্বভাবতঃই মাছ ও দুধ খাইতে ভালবাসে; তাহার জন্য রোজ একপোয়া দুধের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। বিড়ালটি মার পায়ের কাছে শুইয়া থাকিত। একদিন মা বলিলেন, 'বেরালটাকে আমি লাঠি দিয়ে মারচি, তবু ভয় ক'চ্চে না; জ্ঞান বেরালটাকে জোরে আছাড় দিয়েছিল!'—বলিতে বলিতে তাঁহার মুখে বেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিল। [বি]

বিড়ালের স্বভাব কিন্তু বড় ভাল নয়, সুবিধা পাইলেই চুরি করিয়া খায়। নলিনবাবু একদিন বলিলেন, 'মা, বেরাল তো পরের ঘরে চুরি করেই খাবে?' মা বলিলেন, 'চুরি করা তো ওদের ধর্মই বাবা। কে আর ওদের আদর করে খেতে দেবে? ওদের স্বভাবই হ'ল' তাই।'

কলিকাতার বাড়ীতে গণেন্দ্রনাথের বিছানায় বিড়াল কয়েকটি বাচ্চা প্রসব করে। শ্রীশ্রীমা ও গোলাপ-মা দুইজনে মিলিয়া তাড়াতাড়ি সাবান দিয়া বিছানার চাদর ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া রাখেন এবং যাহাতে গণেন্দ্রনাথ দেখিয়া বুঝিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থাও করেন। তথাপি যদি তিনি কোনরূপে বুঝিতে পারিয়া বিড়ালটাকে বিদায় করিয়া দেন, সেই ভয়ে তিনি আসিতেই মা বলিলেন, 'বেরালটি এখানেই থাকে, এখানেই খায়, প্রসব হ'তে যাবে কোথায়? ওকে আর কিছু বোলো না।'

শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে একটি পোষা টিয়া-পাখী ছিল। আদর করিয়া মা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'গঙ্গারাম'। নিত্য বহুকণ্ঠে মা-ডাক শুনিতে শুনিতে সে ঐ নাম শিখিয়া ফেলিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে, বিশেষ করিয়া পূজার সময়, 'মা—ওমা—' বলিয়া ডাকিত। পাখীর দীর্ঘ মা-বুলিটি অত্যন্ত মধুর শুনাইত। পূজা শেষ করিয়া উঠিয়া মা জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কি বাবা গঙ্গারাম, কি ব'লচ?' তারপরে প্রসাদী ফলমিষ্টি ও মিছরির পানা আনিয়া তাহাকে সকলের আগে খাইতে দিতেন।

১৩২৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগঃ একদিন বিকালে এক

নাগা-সাধু হাতী চড়িয়া জয়রামবাটীতে উপস্থিত। একটি ছোট হাতী, কেহ সাধুকে দিয়াছে। শ্রীশ্রীমা বাটিতে করিয়া কিছু চাউল হাতীকে খাইতে দিলেন ও তাহার মাথায় সিন্দুর পরাইয়া দিলেন। [স]

স্বামী অরূপানন্দের কাছে শুনিয়াছি, অতি শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি সেই স্নেহরসাস্বাদে চিরবঞ্চিত ছিলেন। যখন খেলাধূলার অন্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অন্যান্য ছেলেরা নিজ নিজ গর্ভধারিণীকে 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতে থাকিত, তখন তিনি নিজের জীবনে এক অপূরণীয় অভাব অনুভব করিতেন। তারপরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীমার কাছে আসিয়া তাঁহার সেই অভাব দূর হইল। শুধু দূর হইল বলিলে ঠিক হয় না, তিনি নিজের হৃদয়পাত্র কানায় কানায় পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি সকলেরই মা?' মা বলিলেন, 'হ্যাঁ।' 'এই সব ইতর জীবজন্তুরও?' 'হ্যাঁ, ওদেরও।'

সিন্ধুনাথ পাণ্ডা লিখিতেছেন: শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় নিজের বাড়ীতে ঘরে বসিয়া আছেন—তাঁহার পাশে আমি ও আমার বন্ধু ডাক্তার কাঞ্জিলাল এবং সম্মুখে দুইজন পাশ্চাত্য ভক্ত—একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক।[৯] আর গিরিশবাবু দরজার চৌকাঠের প্রায় উপরেই বসিয়াছেন, মার সম্মুখে বসেন নাই। পাশ্চাত্য ভক্ত দুইটি ইংরাজীতে কথা কহিতেছেন, আর গিরিশবাবু দোভাষীর কাজ করিতেছেন।[১০] স্ত্রী-ভক্তটি বলিলেন, 'মা, আমি আপনার মেয়ে?' মা বলিলেন, 'হ্যাঁ, তুমি আমার মেয়ে।' পুরুষ-ভক্তটি বলিলেন, 'আপনি যে জগন্মাতা তা কি করে বুঝব?' মা উত্তর

---

[৯] ডাঃ স্থালক ও মিস্ গ্রে। উভয়েই শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য।

[১০] অন্য ভাষাভাষীর কথা শ্রীশ্রীমাকে সকল সময়েই অনুবাদ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইত না। তিনি অনায়াসে তাহারা কি বলিতে চাহিতেছে তাহা বুঝিয়া লইতে এবং নিজের বক্তব্য বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যেই তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম ছিলেন। কোয়ালপাড়া মঠে শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার মার সঙ্গে ইংরাজীতে কথা কহিতেন ও স্বামী মহেশ্বরানন্দ দোভাষীর কাজ করিতেন। কিন্তু একএক সময়ে অনুবাদ শুনিবার পূর্বেই মা আয়েঙ্গারের কথার উত্তর দিয়া বসিতেন! শ্যামাচরণ চক্রবর্তী স্বামী ধ্যানানন্দের কাছে শুনিয়াছেন,—মাদ্রাজে একটী স্ত্রীলোককে দীক্ষা দিয়া মা তাহাকে সঙ্গে করিয়া খাইতে

দিলেন, 'এখানে যখন এসেচ তখন বুঝতে পারবে।' এইভাবে কথাবার্তা চলিয়াছে ; আমি বসিয়া বসিয়া মাকে দেখিতেছি, মার স্নেহপূর্ণ কথাবার্তা শুনিতেছি, একটা পারিবারিক আবেষ্টনীতে সকলে সন্ধ্যার পর মার কাছে বসিয়া যেন স্ফূর্তি করিতেছি !

শেষজীবনে মাতৃভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশে শ্রীশ্রীমার সমগ্র সত্তাটিই যখন তদ্ভাবভাবিত হইয়া উঠিত, তখন জগতের নরনারীগণের তো কথাই নাই, স্বীয় পতিকেও উহা নিজের বিষয়ীভূত করিয়া ফেলিত। রসবেত্তা পণ্ডিতগণ শান্তাদি ভাবচতুষ্টয়কে মধুরভাবের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মধুরভাবের অন্তর্নিহিত বাৎসল্যভাব তখন বিশেষরূপে বর্ধিত হইয়া ঠাকুরের সম্পর্কে তাঁহার মনোভাবকে অনুরঞ্জিত করিয়া ফেলিত, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। 'মা আপনি ঠাকুরকে কি ভাবে দেখতেন ?'—কাহারও এই প্রশ্নের উত্তরে মা অতীত প্রসঙ্গ চাপা দিয়া বলিয়াছিলেন, 'ছেলের মতন দেখি।' [ন]

একবিংশ অধ্যায়

গুরু

ব্রহ্ম বিষ্ণু-শিবত্বাদি জীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী।
জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীমার গুরুভাবটিকে তাঁহার মাতৃভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারা যায় না। গর্ভধারিণী মার নিকটে

বসেন। স্ত্রীলোকটি তামিল ভাষায় প্রশ্ন করিতে এবং মা বাঙ্গলা ভাষায় উত্তর দিতে থাকেন। এইরূপে দুইজনের মধ্যে প্রায় একঘণ্টা আলাপ হয়, অথচ পরস্পরের কথা বুঝিতে কাহারও কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই ! ভিন্নভাষাভাষীদিগকে দীক্ষাদানের সময়ে মা বাঙ্গলাতেই কথা কহিতেন এবং তাহারাও তৎকালে তাঁহার বক্তব্য অনায়াসে বুঝিতে পারিত। আমেরিকান মহিলা সিষ্টার দেবমাতা তাঁহার Days in Indian Monastery (ভারতীয় মঠে দিনগুলি) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন : আমাদের দুইজনের ভাষা বিভিন্ন ; কিন্তু তিনি [শ্রীশ্রীমা] অন্তরের অন্তস্তল হইতে যে গভীর শব্দহীন ভাষা প্রকাশ করিতেন তাহাতেই আমরা পরস্পরের ভাব বুঝিতে পারিতাম।

দীক্ষাগ্রহণ—মাকে গুরুত্বে বরণ অতি প্রশস্ত বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন। মাতৃত্বের সর্বোচ্চ মহিমা লোকসমক্ষে বিশেষভাবে প্রকটিত করিবার জন্যই কি সকল মায়ের সমষ্টিরূপা জগন্মাতার এই দক্ষিণা মূর্তিতে প্রকাশ ?

শ্রীশ্রীমার জ্ঞানদা গুরুমূর্তি সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন গোলাপ-মাকে বলিয়াছিলেন, 'ও সারদা—সরস্বতী ; জ্ঞান দিতে এসেচে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অমঙ্গল হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেচে।' মাকে অলঙ্কার গড়াইয়া দিতে অভিলাষী হইয়া ভাগিনেয় হৃদয়কেও ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'ওরে, ওর নাম সারদা—ও সরস্বতী; তাই সাজতে ভালবাসে।'

শ্রীশ্রীমার স্বরূপ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ; তবে স্বামিজীর উক্তিতে আর একটি বিশেষত্বও প্রকাশিত হইয়াছে। যে ঘটনায় স্বামিজীর মুখ হইতে এইরূপ উক্তি নির্গত হয়, তাহা প্রণিধানযোগ্য। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সেন বলেন : "আমার বাল্যকাল হইতে ধর্মের দিকে ঝোঁক। স্বামিজী যখন আমেরিকা হইতে দেশে আসিলেন, পড়াশুনা ছাঁড়িয়া দিয়া তিন বৎসর তাঁহার পিছনে পিছনে ঘুরিলাম এবং দীক্ষা, সন্ন্যাস ইত্যাদি যাহা কিছু ধর্মজীবনের পক্ষে প্রয়োজন, দিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলাম। অবশেষে স্বামিজী সম্মত হইলেন এবং একদিন আমাদের তিনচারি জনকে দীক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে মঠের ঠাকুর-ঘরে যাইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। একে একে অন্য সকলের দীক্ষা হইয়া গেল ; শেষে আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, 'ঠাকুর বল্লেন, আমি তোর গুরু নই। ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন, যিনি তোকে দীক্ষা দেবেন তিনি আমার চেয়েও বড়। তোর হতাশ হবার কারণ নেই, সময়ে সব হবে।' স্বামিজীর মুখে একথা শুনিয়া মর্মাহত হইলাম ; ভাবিলাম, স্বামিজী হইতে আবার বড় কে ? অনুপযুক্ত বলিয়া, অনুগ্রহ না করিয়া শুধু ফাঁকি দিয়া বিদায় করিলেন।

"ইহার কিছুকাল পরে রাত্রে স্বপ্ন দেখি যে, আমি ঠাকুরের কোলে বসিয়া আছি ; এক উজ্জ্বল দেবীমূর্তি সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, 'একটি মন্ত্র

নাও।’ আমি বলিলাম, ‘এখন ঠাকুরের কোলে বসে আছি; মন্ত্রতন্ত্রের কোনদিনই ধার ধারি না।’ তথাপি তিনি মন্ত্র নিতে জেদ করায় জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘তুমি কে?’ ‘আমি সরস্বতী’—এইমাত্র বলিয়াই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। মন্ত্র শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘এতে কি হবে?’ উত্তর দিলেন, ‘কবি হ’তে পারবি।’ কবির দলের উপর আমার কোনদিনই ভাল ধারণা ছিল না। সেই কবির দলের সর্দার হইতে হইবে মনে করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিলাম, ‘আমি কবি হতে চাই না।’ দেবীমূর্তি কহিলেন. ‘কবি’ মানে জানিস? ‘কবি’ মানে ‘জ্ঞানী’। এই কথা বলিয়া, জপ করিবার প্রণালী পর্যন্ত দেখাইয়া দিয়া, অন্ততঃ, ১০৮ বার জপ করিতে আদেশ করিলেন।

“অল্পদিন পরে মঠে স্বামিজীকে দর্শন করিতে যাই। তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, ‘ঠাকুর বলতেন, দেবস্বপ্ন সত্য। একে স্বপ্নসিদ্ধি বলে। এইটি জপ করলেই তোর সব হয়ে যাবে, আর কিছু করতে হবে না। সেই সময়ে ব্রজেন্দ্র নন্দী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি বলিলাম, ‘আমি স্বপ্ন কোন দিনই বিশ্বাস করি না; সে অমূলক চিন্তামাত্র। যদি কোন মন্ত্রের প্রয়োজন হয়, আপনি দিন।’ স্বামিজী কহিলেন, “এসব বুঝি ‘বোধোদয়’ বইয়ে ‘ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ’ পড়ে তোর ধারণা হয়েচে? তা নয়। ধারণা করে রাখ্, বাস্তবিক এটি সত্য। ঐ মন্ত্র জপ করতে থাক্; পরে সশরীরে সেই মন্ত্রদাত্রী মূর্তি দেখতে পাবি। তিনি বগলার অবতার, সরস্বতীমূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা।” আমি বলিলাম, ‘আপনার কথা আমি বুঝতে পারচি না।’ স্বামিজী বলিলেন, ‘সময়ে সব বুঝতে পারবি। যখন দেখতে পাবি, দেখবি, উপরে মহা শান্তভাব, কিন্তু ভিতরে সংহার-মূর্তি! সরস্বতী অতি শান্ত কি-না।’ আমি বলিলাম, ‘আমার এসকল বিশ্বাস হয় না।’ স্বামিজী বলিলেন, ‘বিশ্বাস করিস বা না করিস, জপ করে যা; কল্যাণ হবে।’ আমি কিন্তু একদিনও জপ করি নাই।

“ইতোমধ্যে স্বামিজীর গ্রন্থাবলী পাঠ এবং তাঁহাকে চিন্তা করিতাম। মধ্যে মধ্যে স্বপ্নে ঠাকুর ও স্বামিজীর দেখাও পাইতাম। এইরূপে প্রায় নয় বৎসর কাটিয়া গেল। ১৩১৮ সালে আমি ও ডাক্তার লালবিহারী সেন

৺পূজার সময়ে মঠে যাই। পূজা দেখিয়া, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রেরণায়, একবার ঠাকুরের দেশ ও শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার মানসে রওনা হই। ঘাটালের পথে, একদিন কামারপুকুরে থাকিয়া, শিবু-দাদার সঙ্গে জয়রামবাটী পৌঁছিলাম।

জয়রামবাটীতে আমরা চারিপাঁচ দিন ছিলাম। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পরে মা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'বাবা, কি নেবে?' আমি বলিলাম, 'তা তো বুঝতে পারি না।' মা বলিলেন, 'যা চাবে তাই পাবে; শক্তি নেবে?' আমি বলিলাম, 'শক্তি টক্তি তো কিছু বুঝি না। আমার কি আবশ্যক তাও জানি না। যদি কিছু দেওয়ার ইচ্ছা হয় তোমার, যাতে আমার ভাল হয় তাই দাও।' মা বলিলেন, 'আচ্ছা, কাল সকালে হবে, কিছু ফুল যোগাড় ক'রে রাখবে।'

"মার অনুমতি অনুসারে আমি ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি মন্ত্রপ্রার্থী হইলে মা বলিলেন, 'কাল ভাল দিন—লক্ষ্মীপূর্ণিমা, কাল হবে।' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এদিনে দীক্ষা হলে কি হয়?' মা বলিলেন, 'শীঘ্রি সিদ্ধি হয়।'

"দীক্ষার সময় মা তাঁহার ডান হাত আমার মস্তকে এবং বাম হাত চিবুকে রাখিয়া মন্ত্র দান করিলেন। মন্ত্র শ্রবণ করিবামাত্র স্বপ্নদৃষ্ট সমস্ত ঘটনা যুগপৎ মনে হইল ও মাথা ঘুরিতে লাগিল; ক্ষণেকের জন্য যেন বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলাম, কিন্তু আনন্দানুভূতি লুপ্ত হইল না। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন দেখিলাম, স্বপ্নদৃষ্ট দেবীমূর্তি ও মায়ের মূর্তি এক। 'মা, আমি অনেকদিন আগে স্বপ্নে একটি মন্ত্র পাই—'এইমাত্র বলিতেই মা উত্তর দিলেন, 'কেন, মিলচে না? ঠিক মিলেচে তো? মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখতে পাও না?'"

স্বামিজী বলিয়াছেন, শ্রীশ্রীমার উপরে মহা শান্তভাব, কিন্তু ভিতরে সংহার-মূর্তি। সংহার-মূর্তির সূচক কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। প্রবোধবাবু বলেন: কামারপুকুরে শিবু-দাদার অনুপস্থিতিতে ও রামলাল-দাদার অমতে, শিবু-দাদার স্ত্রী গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের যোগে, নিজের কন্যা পাঁচীকে সেইদিন রাত্রেই নিজেদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘরে বিবাহ দিতে

উদ্যত হন; এবং কন্যাকে অন্যত্র লুকাইয়া তালাবদ্ধ করিয়া রাখেন। রামলাল-দাদার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া আমি ও জ্ঞানানন্দ-মহারাজ কৌশলে মেয়েকে উদ্ধার করি এবং তাহাকে লইয়া সন্ধ্যার পূর্বে জয়রামবাটীতে উপস্থিত হই। মাকে এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও আগে জানানো সম্ভবপর হয় নাই; সেইজন্য আমাদের কৃতকর্ম সঙ্গত হইয়াছে কি-না সে বিষয়ে আমার মনে একটা খট্‌কা ছিল। রামলাল-দাদার সম্মতিক্রমে মেয়েকে আনা হইয়াছে কি-না, একথা মা সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ইহাতে তাঁহার মত আছে জানিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিলেন। এই ব্যাপারে লাহাবাবুরা অসন্তুষ্ট হইবেন, সুতরাং কামারপুকুরে জমি ক্রয় ও ঠাকুরের মন্দির-নির্মাণে সম্ভবতঃ বাধা পড়িবে, এই কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়া ফেলি, 'তা ওখানে মন্দির নাই বা হল; ঠাকুর তো ওখানে মঠ-মন্দিরের জন্যে বসে নাই—কত জায়গায় কত মঠমন্দির হয়েচে।' একথায় মা বিরক্ত হইয়া ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন, 'ওকি কথা বল গো? ঠাকুরের জন্মস্থান—পুণ্যস্থান—মহা-পীঠস্থান—তীর্থভূমি! ওকথা ব'লতে আছে?'[১] তারপরে আমি কথায় কথায় বলিলাম, 'ছোট বৌ [শিবু-দাদার স্ত্রী] ক্ষেপে গিয়ে, ঘরে না আগুন ধরিয়ে দেয়!' অমনি মা বলিলেন, 'তা হলে বে—শ হবে, তা হ'লে বে—শ হবে। ঠাকুর যেমনটি ভালবাসেন তেমনটি হবে। তিনি শ্মশা—ন ভালবাসেন, সব শ্মশা—ন হ'য়ে যাবে।' বলিয়াই মা হাসিতে আরম্ভ করিলেন, 'হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—'। সেই হাসিতে আমি ও জ্ঞান-দাদা দুই তিন সেকেণ্ড যোগ দিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার স্বর তীব্রতর ও গম্ভীরতর হইয়া চকিতে ত্রাসের সঞ্চার করিল এবং ২০।২৫ সেকেণ্ড ব্যাপী

---

১ কামারপুকুরে ঠাকুরের মন্দির-নির্মাণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বিভূতিবাবুকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা কামারপুকুরে মন্দির ক'রবে একচূড়ো—যেমন [জয়রামবাটীর] যাত্রাসিদ্ধির মন্দির। ঠাকুরের মন্দিরে রঘুবীরকে রেখো না—রঘুবীরের ঘরেই রঘুবীর থাকবেন। উনি [শ্বশুর মহাশয়] নিজের মাথায় ক'রে মাটি এনে ঘরের মেঝেতে শীতলার আসনটি ক'রেছিলেন। আমার ঘর যেমন আছে, তেমনি থাকবে।' ৺রঘুবীরের ঘর এবং ঠাকুর ও মা যে ঘরে বাস করতেন সেই ঘর পূর্বাবস্থায় রাখিবার ইচ্ছা মা স্বামী জ্ঞানানন্দের কাছেও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ক্রমবর্ধমান ঐ অট্টহাস্যে সকলেই অভিভূত ও স্তব্ধ হইয়া পড়িলাম। পরক্ষণেই মা আপনা হইতে প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং কোমল মাতৃকণ্ঠে অন্য কথা পাড়িয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া দিলেন।

মহাযুদ্ধের সময় জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা একজনকে ডাকাইয়া যুদ্ধের সংবাদ পড়িয়া শুনাইতে আদেশ করিলেন। মিনিট দশ পড়ার পর, বহু-লোকক্ষয়ের সংবাদ শুনিবামাত্র মার ভাবান্তর হইল। প্রথমে মৃদু গলায় 'হোঃ-হোঃ' শব্দে আরম্ভ করিয়া পরে উচ্চৈঃস্বরে 'হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—' অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই মিনিট ব্যাপী সেই বিকট অট্টহাস্যে সমস্ত বাড়ীখানি যেন কাঁপিয়া উঠিল। গোলাপ-মা, কিংবা যোগীন-মা কাছে বসিয়া শুনিতেছিলেন; গলবস্ত্র হইয়া জোড়হাতে 'সম্বর সম্বর' বলিয়া কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; মাও ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। [ন]

ঠাকুরের তিরোভাবের কিছুকাল পরে তাঁহার গৃহী ভক্ত হরীশচন্দ্র কামারপুকুরে যাইয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। ইতঃপূর্বে জোর করিয়া ত্যাগের পথে থাকিবাব চেষ্টা করায় পরিবার তাঁহাকে দৈবক্রিয়া-বলে পাগল করিয়া দিয়াছিল। হরীশের দুরবস্থায় করুণা-পরবশ হইয়া শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে যথেষ্ট আদরযত্ন করিতেন। পাগল বেয়াদবি করিয়া কখন কখন মাকে বলিত, 'তুমি আমার প্রকৃতি' এবং খাওয়ার পর তাঁহার জন্য পাতে প্রসাদও রাখিয়া দিত। তাহার অশিষ্টাচারের কথা মা পত্র লিখিয়া কলিকাতায় জানাইয়াছিলেন এবং সেই সংবাদ পাইয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ কামারপুকুরে রওনা হইয়াছিলেন। একদিন যেমন মা পাশের বাড়ী হইতে নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন, পাগল অমনি তাঁহার পশ্চাতে ছুটিল। তখন বাড়ীতে অন্য কেহ উপস্থিত নাই। কি করিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া মা ধানের মরাইয়ের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়াছেন: 'সাতবার ঘুরে আর আমি পাল্লুম না। তখন নিজ মূর্তি মনে এসে প'ড়ল। আমি নিজ মূর্তি [বগলা-মূর্তি][২] ধ'রে দাঁড়াল্লুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু

[২] জয়রামবাটীতে একদিন বিকালবেলা (৩রা মাঘ, ১৩২৬) শ্রীশ্রীমা কেমন এক বিশেষ ভাবে ভাবিত হইয়া, শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে একান্তে ডাকিয়া আনিয়া, দণ্ডায়মানা

দিয়ে জিব টেনে ধ'রে গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁ-হেঁ ক'রে হাঁফাতে লাগল'। আমার হাতের আঙ্গুল লাল হ'য়ে গেছল।' [গ] নিরঞ্জন-মহারাজ আসিতেছেন শুনিয়াই হরীশ মার খাওয়ার ভয়ে বৃন্দাবনে পলাইয়া যান। মার হাতের চড় খাইয়াই কি তিনি ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন? শেষ বয়সে আমরা যখন দেখিয়াছি, তখন তিনি শিষ্ট, শান্ত; আমাদের সঙ্গে ঠাকুরের কথা আলাপ করিয়াছিলেন।

স্বামিজীর কথিত শ্রীশ্রীমার মহা-শান্তভাবের পরিচয় স্বতন্ত্ররূপে দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সমগ্র জীবনই ঐ ভাবের সমুজ্জ্বল আলেখ্য। সমীপস্থিত সকলেই অত্যন্ত বিরূপ অবস্থার মধ্যেও তাঁহার স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত মূর্তি দেখিয়া ধন্য হইয়াছে। ঐ প্রশান্ত ভাবের আতিশয্যবশতঃ তিনি কদাচিৎ কাহারও উপর রুষ্ট হইলেও সঙ্গে সঙ্গেই গলিয়া জল হইতেন। প্রবোধবাবু বলেনঃ পাগলী-মামী যখন তখন মাকে গালাগালি করিতেন। একদিন দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার পর কালী-মামার বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিয়া প্রায় তিনটার সময় মা বিশ্রাম করিয়া উঠিয়াছেন কি-না দেখিতে গেলাম। মার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া শুনি তিনি বলিতেছেন, 'বাপরে বাপ, আমাকে খেয়ে ফেল্লে। খেয়ে উঠে এখন পর্যন্ত মুখে একটু পানও দিতে পেলুম নি! বোধ হয়, তারকনাথের পূজোয় যে ফুল দিয়েছিলুম, তাতে কাঁটা ছিল; সেই কাঁটাই রাধির মা হ'য়ে এখন আমাকে কষ্ট দিচ্চে। আবার বলে কি-না, আমি ওকে আর ওর রাধিকে মেরে ফেলবার চেষ্টা ক'চ্চি। (উচ্চ ও তীব্র স্বরে) আরে, আমি যদি তোদিকে মারব ব'লে মনে করি, তা হ'লে কোন্ দেবতা রক্ষে

বরাভয়া মূর্তিতে তৎকৃত পূজা গ্রহণ করেন। পূজার জন্য কিরূপ ফুল সংগ্রহ করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছিলেন, 'সাদা ফুল, হল্‌দে ফুল দুইই আনতে বল: সাদা ফুল ঠাকুর ভালবাসেন, হল্‌দে ফুল আমি ভালবাসি।' পূজার সময় তিনি সাদা ফুল তাঁহার দক্ষিণ পায়ে ও হল্‌দে ফুল তাঁহার বাম পায়ে দিতে নির্দেশ করেন। 'হল্‌দে ফুল আমি ভালবাসি' এই কথায় মা স্বীয় বগলা-স্বরূপেরই পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। পীতপুষ্প বগলাপূজার আবশ্যিক উপকরণ।

ক'ত্তে পারে ? (আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় হাসিতে হাসিতে) আমি কি তা পারি গা ? ঘরেরই বৌ তো !'

* * * *

শ্রীশ্রীমা স্বীয় গুরুশক্তির অভয় অঙ্কে যাঁহাদিগকে স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলকেই মন্ত্রদীক্ষা দানে কৃতার্থ করেন ; ক্বচিৎ কাহারও ভার কেবলমাত্র সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাতে বা অভয় আশ্বাসবাণী দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায় এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে উপগুরুরূপেও শিক্ষা দেন। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ পূর্ব হইতেই ভিন্ন গুরুর নিকট দীক্ষিত ছিলেন এবং পরে মার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার ও ধর্মপথে তাঁহার কাছে বিশেষ সাহায্য পাইবার আশায় আগমন করিয়াছিলেন। মা তাঁহাদের ব্যক্তিগত ভাব ও প্রয়োজন বুঝিয়া তদুপযোগী উপদেশাদি দান করিয়াছেন এবং তাঁহারাও নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

ভিন্ন গুরুর নিকটে পূর্বেই দীক্ষাপ্রাপ্ত কেহ কেহ কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, পুনর্বার দীক্ষা দিবার জন্য শ্রীশ্রীমাকে কাতর হইয়া ধরিয়াছেন ; আর তিনিও তাঁহাদের বিশ্বাসভক্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদেরই পূর্বলব্ধ মন্ত্র শুনাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপে মন্ত্রশ্রবণ করাইবার কালে তিনি কখন জিজ্ঞাসা করিয়া সেই মন্ত্রটি আগে জানিয়া লন নাই ; সর্বজ্ঞ গুরুশক্তির সহায়ে আপনা হইতেই উহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের বিশ্বাসভক্তি আরও সুদৃঢ় করিয়াছেন।

রাধারাণীর স্বামী শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দীক্ষাপ্রার্থী হইলে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'তোমাকে মেয়ে দিয়েচি। তোমাকে মন্ত্র দিলে কুলগুরু চটে যাবেন ; কুলগুরু চটলে আমার মেয়েরই তো অমঙ্গল হবে, বাবা! তুমি আমাকে জ্ঞানগুরু কর।' এইভাবে জ্ঞানগুরু করায় যে দোষ নাই তাহা বুঝাইবার জন্য মা তাঁহাকে অবধূতের চব্বিশ গুরুর কথাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু মন্মথবাবু নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহার কাছেই দীক্ষাগ্রহণের জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিতে থাকিলে মা পরিশেষে তাঁহাকে মন্ত্রদান করেন। মন্মথবাবুর দীক্ষার পর মা বলিয়াছিলেন, 'রাধুর কোষ্ঠী জ্যোতিষীকে

দেখান হ'য়েছিল ; বৈধব্য-যোগ আছে। মন্মথকে মন্ত্র দিলুম—ভগবানের নামে বিধাতার কলম কাটা যায়।' [বি][৩]

শ্রীঅন্নদাচরণ সেনগুপ্ত বলেন : "১৩২০ সালে, বড়দিনের ছুটিতে, বরিশাল হইতে পুলিনবিহারী দাশগুপ্তের সঙ্গে কলিকাতা যাই। আমরা ঠিক করিয়াছিলাম, মনের বাসনা আর কাহারও কাছে ব্যক্ত করিব না, বরাবর শ্রীশ্রীমার কাছে যাইয়া নিবেদন করিব। শুনিয়াছিলাম, মাকে দর্শন করিতে হইলে আগে পূজনীয় শরৎ-মহারাজের আদেশ লইতে হয়। আমরা প্রথমদিন বিকালে শরৎ-মহারাজের গম্ভীরমূর্তি দেখিয়াই ভয় খাইয়া কিছু না বলিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

"ঠাকুরের যে-সব কথা পড়িয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র গিরিশ-বাবুর বকলমা নেওয়ার ঘটনাটি আমার মনের মত হইয়াছিল ও প্রাণে গাঁথিয়া গিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, মার কাছে আমার কেবল ঐ একটি জিনিষই চাহিবার আছে : তাঁহাকে বলিব, 'মা, আপনি আমার বকলমা গ্রহণ করুন।' পাছে কাজের সময় ভুলিয়া যাই, সেইজন্য কথাটি বারবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়া লইয়াছিলাম।

"পরদিন সকালে আমি ও পুলিনবাবু ফল কিনিতে গেলাম। আমার মনে হইল, মাকে কেবল একটি আপেল দিতে হইবে ; অন্য কোন ফলই দিবার প্রয়োজন নাই। কেন ঐরূপ মনে হইল, বলিতে পারি না। পুলিন-বাবু নানাপ্রকার ফল কিনিলেন।

"গঙ্গাস্নান করিয়া মার বাড়ীতে গেলাম ও কোন কথা না কহিয়া শরৎ-মহারাজকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া মাকে দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জনৈক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে উপরে যাইয়া দেখি, মা আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখ দেখিতে না পাইয়া, আমরা কি করিব ঠিক করিতে না পারিয়া পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? প্রণাম করে নিন।' আমি মার পাদপদ্মের উপর আপেলটি রাখিয়া প্রণাম

---

৩ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'অবতার কপালমোচন।'

করিয়া মনে মনে বলিলাম, 'মা, আপনি আমার বকলমা গ্রহণ করুন।' মাথা তুলিয়া উপরের দিকে চাহিবামাত্র দেখি, মার আবক্ষ ঘোমটা মাথার উপরে উঠিয়াছে ও সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছেন; তাঁহার মুখে এক অপূর্ব, স্নেহমাখা, মৃদুমন্দ হাসি! সেই সস্মিত মুখেই আমার প্রার্থনার উত্তর পাইলাম; মুখ ফুটিয়া আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন বোধ হইল না। মাকে স্থূলচক্ষে আমার এই প্রথম ও শেষ দেখা।

"অনেকদিন পরে একবার মনে হইয়াছিল, মা আমাকে এখনও মনে রাখিয়াছেন কি-না কে জানে। ইহার কয়েকদিন পরেই কলিকাতার জনৈক আত্মীয়ার কাছে শুনিলাম, মা তাঁহাকে 'বরিশালের অন্নদা'র কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।"

একবার এক মস্তবড় পণ্ডিত শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিলে রামচন্দ্র মজুমদার তাঁহাকে উপরে লইয়া যান। পণ্ডিত প্রণাম করিয়াই মার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া ও দুইহাতে পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে ও বলিতে থাকেন, 'আপনি আমার মাথায় পা দিয়ে বলুন যে আমার চৈতন্য হোক।' বোম্বাই চাদরে আপাদমস্তক আবৃতা মা ঘামিয়া উঠিলেন, কিন্তু পণ্ডিত নাছোড়বান্দা। গোলাপ-মা বকিতে লাগিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। রামবাবু কহিলেন, 'যখন মাকে দর্শন ও প্রণাম করলেন তখন আপনার মনোরথ নিশ্চয় পূর্ণ হবে, আপনি মার পা ছেড়ে দিন; দেখচেন না, মার কষ্ট হচ্চে!' তখন মাও বলিলেন, 'আচ্ছা হবে।'

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন ও মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিতেন। সাধুদের কেহ কেহ তাঁহাকে মার কাছে মন্ত্র লইতে বলিলে তিনি ভাবিতেন, আমার দীক্ষা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই তো ইষ্টদর্শন করিতেছি। তাঁহার মনোভাবে প্রসন্না হইয়া অন্তর্যামিনী একদিন বলিয়াছিলেন, 'বাবা, এই তোমার শেষজন্ম।' কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হরিপদ মাঝিকে মা তাহার ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শুনাইতে বলিলেন। মার আদেশ পালন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তাঁহাকে অশেষ মহিমান্বিত শ্রীদুর্গারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

যাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং মন্ত্রদীক্ষা দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মোটামুটি চারি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। তন্মধ্যে সুকৃতিশালী একদল মার কাছে আগমনের পূর্বেই দেব-স্বপ্নে বা ধ্যান-জাগ্রত অবস্থায় তাঁহার ও ঠাকুরের মধ্যে একতরের কিংবা উভয়েরই দর্শন পাইয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের কেহ কেহ অসম্পূর্ণ মন্ত্র কিংবা কোন উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। ক্বচিৎ কেহ সম্পূর্ণ মন্ত্রও পাইয়াছেন, দেখা যায়। দ্বিতীয় দল আর্ত; ইঁহারা রোগে মরণাপন্ন হইয়া, বা অন্যপ্রকার কষ্টকর অবস্থায় পড়িয়া শুভসংস্কারবশতঃ সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন। তৃতীয় দলের মধ্যে অল্পসংখ্যক মাত্র বাল্যকাল হইতে স্বভাবতঃ বৈরাগ্যবান ও জিজ্ঞাসু; অবশিষ্ট সকলে ঠাকুরের ভক্তদের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের প্রেরণায় বা অন্যপ্রকারে মার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে দীক্ষাগ্রহণ বিশেষ শুভকর হইবে মনে করিয়া আসিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভক্তদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। চতুর্থদল প্রথমতঃ বিশেষ কোন উদ্দেশ্য না রাখিয়া, কিংবা যদৃচ্ছাক্রমে বেড়াইতে বেড়াইতে, সৌভাগ্য-বশতঃ মার সংস্পর্শে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমার মন্ত্রদীক্ষিত শিষ্যদের মোটামুটি যে চারিটি বিভাগ কথিত হইল, ঐসকল বিভাগের কোনটিকেই একেবারে স্বতন্ত্র বলিতে পারা যায় না। কারণ, অনেক ভক্তেরই ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী একাধিক বিভাগে যাইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া ইঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর মুমুক্ষু। কতিপয় দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেই আমাদের বক্তব্য পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক আনুষঙ্গিক বিষয়ও জানিতে পারা যাইবে। অবতীর্ণ জগদ্‌গুরু-শক্তি যখন লোকোদ্ধার-কার্যে প্রবৃত্ত হন, তখন মানুষের কল্পনাতীত বিচিত্র উপায়ে দূরদূরান্তরের ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া পূর্ণকাম করেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের সেই নিগূঢ় ইতিহাসের আংশিক উপাদানও এই সকল আখ্যায়িকা হইতে সংগৃহীত হইতে পারে।

সুরেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের মন্ত্রদীক্ষার কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বরিশালের প্রেমানন্দ দাশগুপ্ত মহাশয়ের শ্রীশ্রীমার কাছে গমনের কথা এইভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন: প্রেমানন্দবাবু নিদ্রিতাবস্থায় রাত্রি

দুইটা হইতে তিনটার মধ্যে স্বপ্ন দেখেন, কোন মানবীরূপিণী দেবী বলিতেছেন, 'তুই এখনো ব'সে আছিস? তোর যে বয়েস হ'য়েচে। এখন শুভ সময়। আমি কত কষ্ট ক'রে সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে এসেচি—আয়, আমার সঙ্গে চলে আয়!' স্বপ্ন ভাঙ্গিবামাত্র তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, মা তাঁহাকে আহ্বান করিযাছেন। ইতঃপূর্বে মাকে দর্শন কবা দূরে থাকুক, তাঁহার ছবি পর্যন্ত তিনি দেখেন নাই; মার কোন ছবি বাহির না হওয়ায় দেখিবার সম্ভাবনাও ছিল না। অনতিবিলম্বে তিনি জয়রামবাটী অভিমুখে রওনা হইলেন। তথায় পৌছিয়া যখন মার বাড়ীর সদর দরজায় উপস্থিত হইলেন, দেখেন মা স্নানের জন্য বাহির হইতেছেন। স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি সম্মুখে দেখিয়া তিনি অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মা কিন্তু কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না; স্নেহমধুর কণ্ঠে চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত কহিলেন, 'বাবা এসেচ? আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'চ্ছিলুম। যাও এখুনি স্নান ক'রে এই ঘরে এস; আমিও স্নান ক'রে আসি—পরে ডেকে নেব।'

গৌরী-মা রাঁচিতে ভক্তদের কাছে বলিয়াছেন: কলিকাতার পথে শ্রীশ্রীমা বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, এমন সময় এক পশ্চিমা কুলি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিল; এবং 'তু মেরী জানকী, তুঝে ম্যায় নে কিত্‌নে দিনোঁসে খোঁজা থা, ইত্‌নে রোজ তু কাঁহা থী?'—এই বলিয়া অজস্র ক্রন্দন করিতে লাগিল। মা তাহাকে শান্ত করিয়া একটি ফুল সংগ্রহ করিতে বলিলেন। সে ফুল আনিয়া মার পাদপদ্মে অর্পণ করিল এবং মা ইষ্টমন্ত্র দান করিয়া তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। কুলি-বেশী এই ভক্তটি পূর্বে নিশ্চয়ই স্বপ্নে বা অন্য কোন অবস্থায় মাকে শ্রীসীতারূপে দর্শন করিয়াছিল; নতুবা দীর্ঘকাল তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবে কেন? দেখিবামাত্রই বা চিনিতে পারিবে কেন?

স্বামী তন্ময়ানন্দ লিখিতেছেন: "যখন আমি গৃহস্থাশ্রমে ছিলাম, রাত্রে স্বপ্ন দেখি,—ঘরবাড়ী কিছুই নাই, আমি যেন ময়দানে শুইয়া আছি; এক জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'কই, যাবি তো আয় না!' তিনবার ঐ ডাক শুনিয়া আমি 'যাই যাই' বলিতে বলিতে শয্যা হইতে

লাফাইয়া উঠিয়া দরজার নিকট আসিলাম, কিন্তু কপাটের অর্গল মোচন করিতে পারিলাম না। কারণ, একজন আমার পেছনদিকে ধরিয়াছিল; সে নীচে মাদুরের উপর শুইয়াছিল। দরজা খুলিতে না পারিয়া ঘুমের ঘোরে তাহারই উপর ঢুলিয়া পড়িলাম। চেঁচামেচি শুনিয়া পিতাঠাকুর দরজার নিকট আসিয়া ডাকিতে থাকিলে আমার চৈতন্য হইল। স্ত্রীলোকেরা বলিল, 'নিশিতে ডাকে, তাই বুঝি হবে।' আমি বলিলাম, 'নিশি নহে; একজন সন্ন্যাসীকে স্বপ্নে দেখলুম, তিনিই আমাকে যাবার জন্যে ডেকেছিলেন। কেন বাধা দিলে?'

"পরে ঐসকল কথা ভুলিয়া যাই। এক বৎসর পরে পিতা দেহত্যাগ করেন। শ্রাদ্ধাদির পরে আমার পেটে সামান্য বেদনার সূত্রপাত হয়। অনেকে বলিল, 'একমাস খাওয়াদাওয়ার ঠিক না থাকায় বেদনা হয়েচে; ও এমনি সেরে যাবে।' কিন্তু সারা তো দূরের কথা, ক্রমশঃ বেশী হইতে লাগিল, চিকিৎসা নিষ্ফল হইল। শেষে একদিন অসহ্য বেদনা আরম্ভ হইলে বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিলাম। তখন গভীর রাত্রি—অন্ধকার। আমি বাড়ীর নিকটস্থ করবীফুলের গাছের তলায় যাইয়া, ঐ ফুলের বীজ দুইচারিটি সংগ্রহ করিবার জন্য হাতড়াইতে লাগিলাম। ঐসময় শুনিতে পাইলাম, কেহ যেন আমাকে বলিতেছেন, 'মরবি কেন? সাধু হয়ে যা। একবার তোকে ডেকেছিলুম, তখন এলি নি; তাইতো এ রোগ হয়েচে! তুই বাণেশ্বর যা, সেখানে থেকে ওষুধ এনে খেলে ভাল হয়ে যাবি।' পরদিন বাণেশ্বর যাত্রা করিলাম।

"বাড়ী হইতে কিছুদূর যাওয়ার পর দুইজন সাধুর সহিত দেখা হইল। তাঁহাদের নিকট ভাল হইলে সাধু হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহারা বলিলেন, 'তুমি নিশ্চয় ভাল হবে। বড়ডোঙ্গলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যালয় আছে, সেখানে আমাদের একজন সাধু থাকেন, ভাল হয়ে তাঁর কাছে যাবে।' বড়ডোঙ্গলের আশ্রমেই প্রথম ঠাকুরের ছবি দর্শন করিলাম এবং ঐ মূর্তিই যে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন, দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম।

"ক্রমে দীক্ষার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইল। শ্রীশ্রীমার কথা শুনিয়া এবং তিনি কলিকাতায় আছেন জানিয়া কলিকাতা রওনা হইলাম। ...

দীক্ষার পর আমি ব্রহ্মচর্য নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মা কহিলেন, 'এখন কিছুদিন এই ভাবেই থাক, রোজ ধ্যানজপ কোরো।'

"স্বামী ধ্রুবানন্দজীর পরামর্শে একটি পাঠশালা খুলিয়া পড়াইতে লাগিলাম। মা দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটী যাই। আমি ভাবিতেছিলাম, মা আমাকে চিনিতে পারিবেন কি-না, কে জানে! কিন্তু প্রণাম করিবামাত্র মা বলিয়া উঠিলেন, 'কি গো, ভাল আছ তো?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ মা; আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি। ডহরকুণ্ডে একটি বিদ্যালয় খুলে ছেলেদের পড়াই।' মা বলিলেন, 'বেশ বেশ; এসব কাজ ঠাকুরের মনে ক'রে ক'রবে—নিষ্কামভাবে। নিজের শরীরের উপর একটু নজর রাখবে, তোমার শূলবেদনা আছে কি-না।' আমি বলিলাম, 'মা, আমাকে এবার ব্রহ্মচর্য দিতে হবে।' মা বলিলেন, 'কাল আসবে কাপড়-কৌপীন নিয়ে আর মাথা কামিয়ে; একটা চৈতন রাখবে।' ব্রহ্মচর্য দিয়া মা আমাকে গায়ত্রী শিখাইয়া দিলেন এবং ইষ্ট-মন্ত্রের পূর্বে ঐ গায়ত্রী অন্ততঃ দশবার জপ করিতে আদেশ করিলেন।

"একবার আমি জয়রামবাটী যাইয়া বিল্বপত্র ও জবাদি ফুল দিয়া মাকে পূজা করিলাম। তারপরে প্রণাম করিয়া তাঁহার পা-দুইখানি আমার মস্তকে স্থাপন করিতেই মা বলিলেন, 'ওগো, মাথার উপর পা রাখতে নাই; ওখানে ঠাকুর আছেন।' আমি বলিলাম, 'মা, ওখানে যে ঠাকুর আছেন তা আমি জানি না। ঠাকুরকে কখন দেখিও নাই। আমি আমার ঠাকুরকে সামনেই দেখচি—আপনিই আমার ঠাকুর-দেবতা।' মা বলিলেন, 'নাগো, সাক্ষাৎ ভগবান ওখানে সহস্রদল পদ্মে ব'সে আছেন।' আমি বলিলাম, 'মা, ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান, তবে আপনি কে?' মা বলিলেন, 'আমি আর কে, আমিও ভগবতী।'[৪] ঐ কথা শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ হইতে

---

[৪] সহজ অবস্থায় শ্রীশ্রীমার মুখে স্বীয় ভগবৎস্বরূপ এইরূপে হঠাৎ কখন কখন ব্যক্ত হইয়া পড়িত। ১। প্রবোধবাবু বলেন: জগদম্বা-আশ্রমের বাহিরের দিকে পুরুষদের বসিবার জন্য একখানি ঘর ছিল। কেদার-দাদা সেই ঘরে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন; অদূরে বটতলায় ঢাক পিটাইয়া ষষ্ঠী-পূজা দিতে লোকজন আসিয়াছে। কথাবার্তার

লাগিল ঃ বলিলাম, 'তবে আপনি ঠাকুরকে দেখিয়ে দিন।' মা বলিলেন, 'তা কি হয় বাবা, খুব জপধ্যান কর—দেখতে পাবে। তুমি স্বপ্নে যা দেখেচ তা মিছে নয়, সত্যি। দেবস্বপ্ন মিছে হয় না, বিশেষ ভোরবেলার—তারপরে আর ঘুম হয় না।' আমি বলিলাম, 'মা, তা হবে না, আপনি আমাকে ভুলাচ্চেন।' মা বলিলেন, 'ছাখ, ঠাকুর নরেনকে স্পর্শ ক'রেছিলেন, তাতে নরেন চেঁচিয়ে উঠেছিল। ঠাকুর ব'লেছিলেন, ওরকম আধার আর কারো নাই।' তখন আমি আর কি বলিব, বলিলাম, 'মা, আপনার যা ইচ্ছে, তাই করুন।'

"আর একবার যখন জয়রামবাটী যাই, মা কুশল জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, 'এখন বেশ ভালই আছি, বেদনা আর হয় না। মা, এই বেদনা আমার বন্ধুর কাজ করেচে—এ বেদনা না হলে তো আপনার দর্শন পেতুম না!' মা বলিলেন, 'তুমি আর্ত ভক্ত, কিন্তু তোমার জ্ঞানের ভাবও আছে—তুমি ছেলেবেলায় শিবপূজো ক'ত্তে ভালবাসতে।' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ মা, আপনি কি ক'রে জানলেন?' মা বলিলেন, 'তোমাকে দেখেই জেনেচি।' "

শ্রীমতী নিরুপমা রায় বলেন ঃ আমার ছোট জা হেমপ্রভা কলিকাতায় শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্রগ্রহণ করেন ও আমাকে সেইকথা পত্রে লিখিয়া

অসুবিধা হওয়ায় কেদার-দাদা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আঃ, থাম্ না রে বাপু।' অমনি মা বলিয়া উঠিলেন, 'ওরে কেদার, সবই যে আমি। তুমি বিরক্ত হ'চ্চ কেন?'

২। স্বামী ঋতানন্দ বলেনঃ পুরাতন বাড়ীতে একদিন শ্রীশ্রীমা নিজের ঘরের বারান্দা ঝাঁট দিতেছিলেন, এমন সময় বাহিরে ভিখারী হাঁকিল, 'মা, ভিক্ষে পাই গো।' ভিখারীর কণ্ঠ শুনিয়া মা আপন মনে 'আর পাচ্চি নে, অনন্ত হাতে কাজ ক'রেও শেষ ক'ত্তে পাচ্চি না।'—বলিয়াই থামিয়া গেলেন। অদূরে বসিয়া আমি জলখাবার খাইতেছিলাম, আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, 'ছাখ তো! আমার দু'হাত আমার আবার অনন্ত হাত বলচি কি?' হাসিতে হাসিতে মা আবার ঝাঁট দিতে লাগিলেন।

৩। সিংহবাহিনীর মাড়োতে বসিয়া শ্রীশ্রীমা একদিন রামায়ণ-গান শুনিয়াছিলেন; পরদিন সকালে বিভূতিবাবুর মুখে 'আহা, কেমন সুন্দর রামায়ণ শুনলুম!—একথা শুনিয়াই গম্ভীরভাবে কহিলেন, 'এবার অনেক বড়।'

জানান। আমি তখন পিতার কর্মস্থল নবীনগরে ছিলাম। আমারও দীক্ষা নেওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং স্বামীকে তাহা লিখিয়া জানাই। আমার বয়স তখন আঠার উনিশ বছর হইবে। স্বামী লোক পাঠাইয়া আমাকে কলিকাতায় আনাইলেন ও উভয়ে একসঙ্গে মাকে দর্শন করিতে গেলাম। দুইতিন বার দর্শনের পর দীক্ষার প্রস্তাব করিতেই মা সম্মত হইলেন। স্বামীর মনে সংশয় ছিল, স্ত্রীলোকের কাছে মন্ত্র নেওয়া উচিত হইবে কি-না, এবং সেইজন্য আমাকে অনুমতি দিয়াও নিজেব দীক্ষাগ্রহণ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিতেছিলেন না। দীক্ষার আগেব দিন শেষরাত্রে তিনি এক দিব্য দর্শনে উল্লসিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে থাকেন,—আমার আর দ্বিধা নাই। ঠাকুব স্বয়ং—সিংহাসনে আসীন, জ্যোতির্ময় মূর্তি, সেই জ্যোতিতে ঘর ভরিয়া গিয়াছে—উপর হইতে নামিয়া আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওরে, ওব কাছে মন্ত্র নিতে তোর মনে দ্বিধা, যেখানে নিলে পুনর্জন্ম হবে না? যা যা, কোনো সংশয় রাখিস নি।' আমাদের দীক্ষা হইয়া যাওয়ার পর মা আমার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার তো বাবা, অনেকদিন সময় হ'য়েচে, এতদিন মন্ত্র নাও নি কেন? তোমার মনে যে বড় দ্বিধা ছিল!' তিনি মার পাদপদ্মে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, 'মা, আমি আপনাকে চিনতে পারি নি!'

সুরেনবাবু বলেন: "শ্রীশ্রীমার নিকটে যাওয়ার কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত আমি তাঁহার কথা কিছুই জানিতাম না। মাঝে মাঝে স্বপ্নে ঠাকুরকে দেখিতাম এবং তাঁহার সঙ্গে একটি নারীমূর্তিও দেখিয়া ভাবিতাম, হয়তো ঠাকুরের ভক্ত কোন স্ত্রীলোক হইবেন। স্বপ্নে যখন ঠাকুরের সহিত কথাবার্তা হইত তখন ঐ নারীমূর্তি দাঁড়াইয়া হাসিতেন। পরে যখন মার কথা শুনিলাম, তিনি কোথায় আছেন জানিয়া লইয়া, প্রাণের সকল কথা ব্যক্ত করিয়া একখানা বিস্তৃত পত্র লিখিলাম। কিন্তু লিখিয়াই মনে হইল, মা তো সাক্ষাৎ জগদম্বা, যাহা লিখিলাম তাহা তো তিনি জানিতেই পারিতেছেন! পত্র আর ডাকে না দিয়া বিছানার নীচে ফেলিয়া রাখিলাম। দুইএক দিনের মধ্যেই আমার এক বন্ধু শ্রীদুর্গেশচন্দ্র দাস—তিনি পূর্বে মাকে জয়রামবাটীতে দর্শন করিয়াছিলেন—স্বপ্ন দেখেন, মা তাঁহাকে বলিতেছেন, 'ছাখ বাবা,

আমার একটি ভক্ত শিলং থেকে পত্র লিখেচে, প'ড়ে ছাখ।' চিঠি পড়া হইয়া গেলে মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আমি এখুনি তার কাছে যাব, তুমি আমাকে নিয়ে চল।'

"দেবস্বপ্ন অন্যকে বলিতে নাই মনে করিয়া বন্ধুটি দুইতিন দিন চুপ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল, মা যে চিঠিখানি তাঁহাকে পড়াইয়াছেন, উহা খুব সম্ভবতঃ আমার লেখা। সেজন্য তিনি যেন বাধ্য হইয়াই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আমার কাছে ব্যক্ত করিলেন। আমি তখন বিছানার তলা হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া দিলে তিনি পড়িয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'এই চিঠিখানিই যে আমি পড়েচি!' পরে যখন মাকে দর্শন করিবার জন্য উড়িষ্যার কোঠারে যাই, আমার দর্শনাদির কথা শুনিয়া তিনি বলিযাছিলেন, 'ঠিক দেখেচ।'"

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী বলেন: "শিলঙে ইন্দুবাবু, শ্রীশবাবু, সুরেনবাবু প্রভৃতি ভক্তেরা পরম শ্রদ্ধার সহিত শ্রীশ্রীমার কথা আলাপ করিতেন। তাঁহাদের আলাপ শুনিয়া একএক সময়ে বলিতাম, 'তোমাদের মা তো আমার কি?' পরমহংসদেবের স্ত্রী বলিয়া ভক্তেরা তাঁহাকে বাড়াইতেছেন বলিয়াই মনে হইত।

"আপিসের কাজে শ্রীহট্ট গিয়াছি; রাত্রে, জাগ্রত কি ঘুমন্ত অবস্থায় ঠিক বলিতে পারি না, এক জীবন্ত দর্শন আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি যেন এক পাকাবাড়ীতে একখানি বঁটি দিয়া নিজের গলা কাটিতে যাইতেছি, আর এক মাতৃমূর্তি আমার হাতে ধরিয়া আমাকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিতেছেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার অল্পদিন পরেই ৺পূজার সময় কলিকাতা যাই। মার বাড়ীতে যাইয়া জানিতে পারিলাম, পূজা উপলক্ষ্যে তিনি মঠে আছেন। মঠে যাইবার জন্য বরাহনগর হইতে যখন নৌকায় গঙ্গা পার হইতেছি, স্বপ্নদৃষ্ট পাকাবাড়ীটি ঠিক সম্মুখে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম—উহা মঠে সংলগ্ন উত্তর পাশের বাগানবাড়ী। ইতঃপূর্বে দুইএক বার মঠে যাইয়া থাকিলেও ঐ বাড়ী কখন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারিলাম না। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই বাড়ীর মধ্যেই শ্রীশ্রীমাকে এই প্রথম স্থূলচক্ষে দর্শন ও প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিবা-

মাত্র মনে হইল, মা যেন আমার অন্তরে থাকিয়া বলিতেছেন, 'তোমার সকল দুঃখ দূর হইয়া গেল।' "

শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার বলেন ঃ শ্রীশ্রীমার দর্শন লাভের পূর্বে স্বপ্ন দেখি, কালীঘাটের মা-কালী আমাকে চারিখানি হাত দিয়া তুলিয়া ধরিলেন, আমি যেন ছোট ছেলেটি। ঐ দেবীমূর্তি নারীমূর্তিতে পরিবর্তিত হইয়া বলিলেন, 'তোমার ভয় কি ? আমি তো রয়েচি।' তারপরে একটি মন্ত্র দিয়া বলিলেন, 'এটি জপ ক'ল্লেই তোমার সব হ'য়ে যাবে, আর কিছু ক'ত্তে হবে না।' এই ঘটনার পর মাসখানেকের মধ্যে মাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটী যাই। বড়মামার বাড়ীতে মা তখন তরকারী কুটিতেছিলেন। স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি সম্মুখে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছি ; মা বটিখানা কাত করিয়া রাখিয়া ঘরের ভিতর গেলেন ও আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলেন। আমি আবিষ্টের মত যাইতেই প্রশ্ন করিলেন, 'হ্যাগা, আমায় কি ক'রে চিনলে ?' উত্তর দিলাম, 'আমি কি চিনতে পেরেচি ? যতটুকু চিনিয়েচ তত-টুকুই চিনেচি।' মা খিল খিল করিয়া হাসিয়া আমার মাথা হইতে হাঁটু পর্যন্ত সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিলেন ; দিতেই আমি যেন প্রকৃতিস্থ হইলাম ও প্রণাম করিলাম। দীক্ষাদানের পূর্বে মা আমার সবশরীরে ছোট ছোট কাঁসার ঘটি হইতে তীর্থজল লইয়া ছিটাইয়া দিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন এবং আমার বুকে পিঠে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিলেন, 'এখন ভাব, তোমার জন্ম-জন্মান্তরীণ সব পাপ ভস্ম হ'য়ে গেল— তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তাত্মা।'

শ্রীগুরুনাথ নাথ লিখিতেছেন ঃ "১৩১২ সালের বৈশাখ মাস—অর্থো-পার্জনে অক্ষমতার জন্য বাবা ও মার গালাগাল খাইয়া ৺বনদুর্গার বাড়ীতে বসিয়া দিনরাত 'মা, মা' বলিয়া রোদন ও চাকুরিপ্রার্থনা করিতাম। বনদুর্গার বাড়ী বিক্রমপুর কাঁঠালতলীতে ; ঘোর জঙ্গল—বড় বড় বট ও অশ্বত্থগাছে অন্ধকারময় স্থান। একদিন জোড়হাতে বসিয়া আছি, বেলা প্রায় এগারটার সময় তন্দ্রা ও অর্ধধ্যানাবস্থায় দেখিলাম, এক সন্ন্যাসিনী— বামহাতে ত্রিশূল, গেরুয়া রঙ্গের সরু-লালপেড়ে কাপড় পরা—আমার মাথা হইতে পিঠ পর্যন্ত হাত বুলাইয়া বলিতেছেন, 'তোর চাকরির যোগাড়

হ'চ্চে ; আর কাঁদিস নি।' এইরূপে তিনবার গায়ে হাত-বুলানো অনুভব করিলাম ও কথা শুনিলাম ; কিন্তু প্রকৃতিস্থ হইয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

"ঐ বৎসর আশ্বিন মাসে ঢাকায় 'বোর্ড-অব্-রেভিনিউ' আপিসে একটি ছোটখাট কাজ পাই ; পরে বদলি হইয়া বাঁচি আসি। ১৩১৩ সালের আশ্বিন মাসে ৺পূজা দেখিতে মঠে যাই এবং কলিকাতায় শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করি। ৺বনদুর্গার বাড়ীতে যে সন্ন্যাসিনী-মূর্তি দেখিয়াছিলাম, মার মুখে পূর্বপরিচিত তাঁহারই মুখ দেখিয়া ও মার কণ্ঠে তাঁহারই গলার স্বর শুনিতে পাইয়া আমি মনে মনে চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম এবং পা-দুইখানি দুইহাতে ধারণ করিয়া, পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলাম। মা একটু চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, কোন কথা কহিলেন না।

"বাঁচি ফিরিলাম, কিন্তু মন সবদাই মাকে দেখিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কার্তিক মাসে একখানা রিটার্ণ টিকেট পাওয়া গেল—নষ্ট হইয়া যাইতেছিল বলিয়া একজন অযাচিতভাবে আনিয়া দিলেন। আমি কতকগুলি জবা ও গোলাপ-ফুলের কুঁড়ি ভিজা নেকড়ায় বাঁধিয়া লইয়া কলিকাতা রওনা হইলাম। মার বাড়ীতে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরেই মা আমাকে ডাকাইয়া নিলেন। আমি চৌকাঠে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলাম ও মাকে দেখিতে লাগিলাম। আমার চক্ষু দিয়া তখন জল পড়িতেছে। মা আপনা হইতেই বলিলেন, 'বাবা, আমি তো কোন যুগীকে মন্ত্র দিই নি ; তোমাদের তো কুলগুরু আছেন—যাও, নীচে যাও।' আমি চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে এবং 'আমি যুগী—নীচ জাতি' ইহা ভাবিতে ভাবিতে সিঁড়ি দিয়া শক্তিশূন্যের ন্যায় অতি ধীরে নামিতে লাগিলাম। সিঁড়ির অধেক না নামিতেই একজন ব্রহ্মচারী আমাকে আবার ডাকিলেন। এইবারও দরজার কাছে যাইয়া নম্রভাবে জোড়হাতে মার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। মা বলিলেন, 'এস বাবা, এখানে এস—এই আসনে ব'স।' আমি প্রণাম করিয়া বসিতেই মা বলিলেন, 'তোমরা কৃষ্ণমন্ত্রী।' ইতঃপূর্বে আমার কখন কখন মনে হইত, আমরা তো বৈষ্ণব—কৃষ্ণমন্ত্রী ; যদি মা আমাকে দীক্ষা দেন, তাহা হইলে কোন মন্ত্র দিবেন কে জানে !

"ইহার ঠিক দুই বৎসর পরে ঢাকা হইতে একটি কন্যা ও পরিবার সহ মাকে দর্শন করিতে যাই। মা তাহাদিগকে পূর্বপরিচিত লোকের মত গ্রহণ করিয়া, স্ত্রীকে ডাকিয়া নিয়া দীক্ষা দিলেন। পরদিন যখন প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিব, মা বলিলেন, 'সব সময় মনে রেখো, ঠাকুর আর আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি।' "

শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী বলেন: অন্তরে তখন সদ্‌গুরু-লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র। ১৩১৯ সালের শ্রীপঞ্চমীর দিন রাত্রি-শেষে—তখনও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই, এদিকে কাকের ডাকও শুনিতে পাইতেছি—ঠাকুর আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন এবং অগ্নির অক্ষরে লেখা একটি নাম দেখাইয়া বলিলেন, 'তুমি এটি জপ ক'রবে, সময়ে বীজ পাবে।' ইহার প্রায় দেড় বৎসর পরে কলিকাতার বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার অভয়পদে আশ্রয় দেন। ঐ সময়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই তিনি যে মন্ত্র দিলেন তাহা ঐ নামটিই বীজসংযুক্ত করা!

শ্রীমহিমচন্দ্র দত্ত বলেন: মিহিরচন্দ্র বড়াল স্বামী সারদানন্দের দূর সম্পর্কে ভাই ছিলেন। তিনি বই দেখিয়া পছন্দ করিয়া একটি মন্ত্র জপ করিতেন। কিছুকাল জপ করার পর স্বপ্ন দেখেন, এক নারীমূর্তি বলিতেছেন, 'তুমি ও-মন্ত্র জপ কোরো না, এই মন্ত্র জপ ক'রবে।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি মন্ত্রটিও বলিয়া দেন। কিন্তু মিহিরবাবু স্বপ্ন অলীক জ্ঞানে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া নিজের পছন্দ করা মন্ত্রটিই জপ করিতেন। একবার তিনি খেয়ালবশে 'পরমহংসদেবের স্ত্রী'কে দর্শন করিতে যান ও স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হন। অতঃপর তাঁহার শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা গ্রহণের অভিলাষ জন্মে। মা তাঁহাকে যে মন্ত্র দিলেন তাহা আগেকার স্বপ্নলব্ধ বস্তু।

স্বামী প্রাণাত্মানন্দ লিখিতেছেন: আমি কোয়ালপাড়ায় শ্রীশ্রীমার কৃপা লাভ করি। সেদিন দোল-পূর্ণিমা। আসনে বসিয়া মার সঙ্গে আমার নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয়: 'তোমার কোন্ মন্ত্র চাই?' 'আমি কিছুই জানি না; আপনি যা আমার উপযুক্ত হয়, দিন।' 'তা হয় না; তোমার যা ইচ্ছে বল।' 'আপনার যা ইচ্ছে তাই দিন।' 'আর কারো কাছে দীক্ষা নিয়েচ কি? কুলগুরু? স্বপ্নে?' 'মাসখানেক আগে ভোরবেলায় স্বপ্নে

একটি মন্ত্র পাই।' মা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া ক্ষণেকের জন্য যেন ধ্যানস্থ হইলেন। তারপরে আমাকে দীক্ষা দিয়া বলিলেন, 'স্বপ্নের মন্ত্রটি এখন বল।' আমি বলিলাম, 'আপনি যা দিলেন, তাই।' মা বলিলেন, 'তবুও বল।' আমি মন্ত্র বলিলাম।*

স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ বলেন : ১৩২০ সালের শেষভাগে আমি মঠে যোগদান করি। পর বৎসর অক্ষয়তৃতীয়ার দিন শ্রীশ্রীমার কাছে আমার দীক্ষা হয়। ললিত [স্বামী কমলেশ্বরানন্দ] প্রভৃতি কয়েকজন সেদিন দীক্ষা নিতে যাইতেছিল, বাবুরাম-মহারাজ বলিলেন, 'তুই যা, এদের সঙ্গে বলি হয়ে আয়গে যা।'

"দীক্ষা নেওয়ার তুইতিন মাসের মধ্যে স্বপ্ন দেখি, মা বলিতেছেন, 'তোমাকে বিয়ে ক'ত্তে হবে, আর মাদ্রাজ অঞ্চলে ব্রাহ্মণবংশে আর একবার তোমার জন্ম হবে।' নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্বপ্ন-কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। কারণ, এই তুইটি জিনিষই—বিবাহ এবং পুনর্জন্ম—সাধু-জীবনের পক্ষে অবাঞ্ছনীয়। কোন সাধু বলিলেন, 'স্বপ্নেও এঁরা যা বলেন, তা মিথ্যা নয়।' বিষণ্ণচিত্তে মার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, 'মা, স্বপ্নে আপনারা যা বলেন, তা কি সত্য?' মা কহিলেন, হ্যাঁ বাবা।' 'তবে আমাকে এই তুটি কথা বলেচেন'—বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলাম। মা আমার কান্না দেখিয়া চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমা খাইলেন ও বলিলেন, 'না, তোমার বিয়ে হবে না, আর তোমার জন্মও হবে না—এই তোমার শেষ জন্ম।' পরে আর একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'মা, আপনার কাছে যারা দীক্ষা নেয়, তাদের কি শেষ জন্ম?' সেই সময়ে সঙ্ঘের মধ্যে কেবল মা এবং ব্রহ্মানন্দ-মহারাজই দীক্ষা দিতেন। মা বলিলেন, 'হ্যাঁ বাবা; আমার আর রাখালের কাছ থেকে যারা দীক্ষা নিয়েচে, তাদের অনেকেরই শেষ জন্ম। কারো কারো জন্ম হবে—সেও, ঠাকুরের সঙ্গে তারা আসবে।'

"কৃষ্ণলাল-মহারাজ আমাকে বিশেষ স্নেহযত্ন করিতেন এবং যাহাতে

---

* শ্রীশ্রীমা কাহাকেও কাহাকেও স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্রও দিয়াছেন এবং উভয় মন্ত্রই জপ করিতে বলিয়াছেন।

সকলের সঙ্গে মিশিয়া আমার অনিষ্ট না হয়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতেন। মঠে কাহারও কাহারও সঙ্গে মিশিতে তিনি আমাকে নিষেধ করিলেও আমি তাঁহার কথা উপেক্ষা করিয়া চলিতাম। সমবয়স্কদের সঙ্গে মিশিয়া, সামান্য কারণে চটিয়া গিয়া কখন কখন হাতাহাতি করিয়াও বসিতাম। একদিন আমরা কয়েকজন মাকে প্রণাম করিয়া যখন নীচে নামিতেছি কৃষ্ণলাল-মহারাজ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মা তোমাকে ডাকচেন।' মাকে আমার আচরণের কথা বলিয়া দিয়াছেন মনে করিয়া সঙ্কুচিতভাবে উপরে গেলাম। আমাকে দেখিয়াই 'এই ছেলেটির কথা ব'লছিলে কেষ্টলাল? এর তো খুব বড় আধার—এর শেষ জন্মের আধার'—এই বলিয়া মা তাঁহার করস্থিত মালা আমার মাথার উপর জপ করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন, 'রাগ তো চণ্ডাল—হ্যাঁ বাবা, অত রাগ ক'ত্তে আছে?'[১] আমি বলিলাম, 'মা, আমি যাদের সঙ্গে মিশি তারা তো আপনারই শিষ্য—আমার গুরুভাই।' মা বলিলেন, 'হ'ল'ই বা গুরুভাই, সবার সঙ্গে কি মেশা চলে? সকলের প্রকৃতি এক নয়। তুমি অমুকের সঙ্গে মিশো না।' মার কথা আমি রাখিতে পারি নাই; তাহার ফলে অনেক কষ্ট পাইয়াছি।

"মা কলিকাতায় আছেন, আমি মহারাজের কাছে বলরাম-ভবনে রহিয়াছি, কিন্তু একদিনও মাকে দর্শন করিতে যাই না। এইভাবে দুইতিন বৎসরও মাকে না দেখিয়া কাটিয়াছে। মার কাছে মন্ত্র পাইলেও, জীবনে কোন উন্নতি বোধ করিতে না পারায় অভিমানবশতঃ আমি যাইতাম না। কোন কোন সাধু আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং বিশেষ গোপনীয় কারণ থাকিলে মাকে তাহা জানাইতে পীড়াপীড়ি করেন। তাঁহাদের কথায় আমি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া মাকে মনের কথা জানাই এবং

---

[১] পড়াশুনা করিবার জন্য ব্রহ্মচারী নেপালেশ্বরকে (পরে স্বামী নিত্যানন্দ) স্বামী প্রেমানন্দ কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারিজীর কাছে অনেক বন্ধুবান্ধব আসা-যাওয়া করিত। সেইজন্য তথাকার অধ্যক্ষ একদিন তাঁহাকে গালি-গালাজ করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখেন, শ্রীশ্রীমা তাঁহার মাথায় করে মন্ত্রজপ করিতেছেন! মা তখন স্থূল শরীরে বিদ্যমানা।

যখন মন্ত্র নিয়াও কিছু করিতে পারিতেছি না তখন মন্ত্রটিও ফেরৎ নিতে প্রার্থনা করি। চিঠি শুনিয়া মা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে বলিলেন, 'ছাখ বাবা, সূর্য থাকে আকাশে, আর জল থাকে নীচেতে : জলকে কি ডেকে ব'লতে হয়, ওগো সূর্য, তুমি আমাকে উপরে তুলে নাও ? সূর্য আপনার স্বভাব থেকে জলকে বাষ্প ক'রে উপরে তুলে নেয়। তোমাকে কিছু ক'ত্তে হবে না।' "

শ্যামাচরণ চক্রবর্তী বলেন : "চাকুরি উপলক্ষ্যে রেঙ্গুনে অবস্থানকালে কয়েকমাস যাবৎ প্রতিদিন তিনবার—প্রত্যেকবার একঘণ্টা করিয়া প্রাণায়াম করিতাম। স্বামিজীর রাজযোগ পড়িয়া ধারণা হইয়াছিল, প্রাণায়াম দ্বারাই অভীষ্ট লাভ হইতে পারে। উহার ফলে শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায় এবং কানের কাছে একপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক 'সোঁ'—'শব্দ হইতে থাকে। চেষ্টা করিয়াও সেই শব্দ রোধ করিতে পারিতাম না। দীর্ঘকালের জন্য ছুটি নিয়া দেশে আসিতে বাধ্য হইলাম এবং একটু সুস্থ বোধ করিতেই মঠে গেলাম। মঠে বাবুরাম-মহারাজের কাছে শ্রীশ্রীমার সন্ধান পাইয়া জয়রামবাটী রওনা হইলাম। জয়রামবাটীর মৃত্তিকা স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই যন্ত্রণাদায়ক শব্দ বন্ধ হইয়া গেল।[৭]

"মার কাছে যোগসাধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেই তিনি বলিলেন, 'তোমার শরীরে কি রেখেচ, আর মনেই বা কি আছে যে যোগ ক'রবে ?' আমি বলিলাম, 'তবে কি আমার কোন উপায় নাই ?' মা বলিলেন, 'কি ক'ত্তে হবে, তা আমি ব'লে দেব।' তারপরে মা আমাকে দীক্ষা দিয়া তুইবেলা নির্দিষ্ট-সংখ্যক জপ করিতে বলিলেন। আমি ত্রিসন্ধ্যা জপের প্রস্তাব করিলে বলিলেন, 'তোমাদের চাকরি আছে, সংসার আছে, তুবেলা জপই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট।' 'রাস্তায় ঘাটে কি করব ?' 'স্মরণ ক'রলেই

---

[৭] সুরমা রায় একসময়ে পেটের ব্যথায় খুব কষ্ট পাইতেছিলেন। ডাক্তাররা বলিত, পেটে টিউমার হইয়াছে। তিনচারি বৎসর নিষ্ফল চিকিৎসার পর তিনি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য রওনা হইলেন, পথিমধ্যে সেই ব্যথা নিঃশেষে সারিয়া গেল।

হবে।' 'মা, আপনি যে মন্ত্র দিলেন, তা তো জপ করবই ; আর কিছু করবার দরকার হবে না ?' 'এতেই সব হবে।'

"আমার ধারণা ছিল যে, দীক্ষা নেওয়ার পর পূজা-অর্চনা করিতে হয়। তাই মাকে বলিলাম, 'মা, আমি তো পূজা সম্বন্ধে কিছুই জানি না, আমাকে পূজা শিখিয়ে দিন।' মা বলিলেন, 'যাঁর পূজা ক'রবে, তাঁর মূর্তির সামনে বা তাঁর উদ্দেশ্যে উপকরণ রেখে প্রাণাম ক'রবে ; তাতেই পূজা সিদ্ধ হবে।' এই সহজ বিধি আমার মনঃপূত হইল না ; মঠে ফিরিয়া, বাবুরাম-মহারাজকে ঠাকুরের পূজার বিধি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'ঠাকুরের ফটোর সামনে পূজার উপকরণ রেখে প্রণাম করবে।'

"সেইবারই জয়রামবাটীতে মা আমাকে বলিলেন, 'রথ সামনে, পুরীতে জগন্নাথ দর্শন ক'রে যাও।' আমি অপটু শরীরে নূতন জায়গায় ভিড়ের মধ্যে যাইতে অমত করায় কহিলেন, 'রথে জগন্নাথ দেখবে না ? আমি ব'লচি, যাও।' তথাপি খাওয়া-থাকার অসুবিধা হইবে বলিয়া আপত্তি করায় বলিলেন, 'আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব।' মা নিজে ৺পুরীর 'শশী নিকেতনে'র ম্যানেজারের নামে পত্র লিখাইলেন। 'শশী নিকেতনে' তিল ধারণের স্থান না থাকিলেও, ম্যানেজার মার পত্র পাইয়াই ব্যস্তসমস্ত হইয়া অন্যত্র আমার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পুরীতে বাবুরাম-মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল ; তিনি আমাকে ৺জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে আদেশ করিলেন। রথের দিন ঘাটে ঘাটে পরপর অনেকগুলি পাহারা ; সেই সকল অতিক্রম করিয়া বাহিরের লোকের ভিতরে প্রবেশ করিবার কোনই উপায় নাই। অথচ আশ্চর্যরকমে বিনা বাধায় মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিয়া আসিলাম।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ লিখিতেছেন ঃ ১৩২১ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা তিনচারি জন ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা রওনা হইলাম। ইচ্ছা—মাসখানেক বেলুড়-মঠে থাকিব। প্রেমানন্দ-স্বামিজী ইতঃপূর্বে ময়মনসিংহে গিয়াছিলেন ; তাঁহার ভালবাসায় এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, মঠে আসিয়া কিছুদিন সাধুসঙ্গ করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। আমরা মঠে আসিতেই

তিনি হাসিমুখে বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে সব বালক-ভক্ত পূর্ববঙ্গ থেকে মঠে এসে উপস্থিত!'

"পাঁচসাত দিন হয় মঠে আছি; সন্ধ্যার প্রাক্কালে গঙ্গাতীরে তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য বসিয়াছি। সেই সময়ে তিনি ধীরানন্দ-স্বামিজীকে কহিলেন, 'কেষ্টলাল, এই অক্ষয়তৃতীয়া উপলক্ষ্যে এদের মাকে দর্শন করিয়ে দাও।' আমরা নিজেদের অত্যন্ত অনুগৃহীত মনে করিলাম।

'কৃষ্ণলাল-মহারাজের সঙ্গে অতি প্রত্যূষে কলিকাতা রওনা হইলাম। মার বাড়ীতে অত্যন্ত লোকের ভিড় থাকায় সারদানন্দ-মহারাজের পদধূলি গ্রহণ করিয়াই কালীঘাট চলিয়া গেলাম। তথায় কলুষনাশিনী গঙ্গায় অবগাহন করিয়া মনে হইল, যেন জীবনের সমস্ত পাপ কাটিয়া গেল। কালীঘাটে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শনাদি করিয়া, কৃষ্ণলাল-মহারাজের উপদেশানু-সারে নাটমন্দিরে বসিয়া মাকে ধ্যান করিলাম। তারপরে বাগবাজারে ফিরিয়া দেখি, স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তে মার বাড়ী ভর্তি।

"জনৈক সাধু আসিয়া বলিলেন, 'তোমরা একএক জন করে আসবে।' তিনি একজনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন; তারপরে আমার ডাক পড়িল। আমি ঘরে ঢুকিতেই শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 'এস বাবা।' আমি শ্রীপাদপদ্মে মাথা রাখিয়া, লম্বমান হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি সস্নেহে বলিলেন, 'হ'য়েচে বাবা।' তারপরে আমাকে একখানা আসন দেখাইয়া বলিলেন, 'এখানে ব'স।' আমি বসিলাম, পাশেই আর একখানা আসনে নিজে বসিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে, আমি যাহা ভাবি নাই—ভাবিতে পারি নাই—তাঁহার অপার করুণা-বারি-সিক্ত করিয়া আমাকে দীক্ষা দিলেন। জানি না, কোন্ সুকৃতি-বলে তাঁহার এই কৃপা লাভ করিলাম! কিরূপে মন্ত্রজপ করিতে হইবে দেখাইয়া দিয়া, মা ঠিক হইয়াছে কি-না পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

"বিকালবেলা আবার মাকে দর্শন করিতে গেলাম। শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইবামাত্র স্নেহময়ী আমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। আমি বলিলাম, 'মা দীক্ষা তো নিয়েচি, কিন্তু কর্তব্য কাজ করতে পারব কি?' মা বলিলেন, 'খুব পারবে; কেন পারবে না?' 'এখন পাঠ্যাবস্থায় আছি, মেসে থাকি—ধ্যানজপ করবার নানা প্রতিবন্ধক আছে;

সময়মত করতে না পারলে পাপ হবে না?' 'না; পাপ আবার কিসের? স্নান ক'রে ঠাকুরকে প্রত্যহ প্রণাম ক'রবে, আর প্রত্যেক কাজে তাঁকে স্মরণ ক'রবে। এতেই জপধ্যানের কাজ হবে। আর যখন সময় পাবে, একমনে তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রবে।' 'সন্ধ্যাহ্নিক যাঁরা করেন সবাইকে দেখি, স্নান করে পবিত্রভাবে করেন। আমার দ্বারা তো তা সম্ভব হবে না।' 'খুব ভোরে আর রাত্রে ঘুমবার আগে যা পার তাই কোরো। ধ্যানজপ করা তাঁকে লাভ ক'রবার জন্যে; তাঁর কৃপা পেয়েচ ব'লেই এখানে এসেচ।' অনির্বচনীয় আনন্দ লইয়া মঠে ফিরিলাম।"

শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তগণের যে শ্রেণীবিভাগ আমরা নির্দেশ করিয়াছিলাম, উপর্যুক্ত উদাহরণগুলিতে তাহা মোটামুটি প্রদর্শিত হইল। তাঁহার দীক্ষাদান-কার্য অতি সরল, তাহাতে অনুষ্ঠান-বাহুল্য ছিল না। পূর্বাহ্নে ঠাকুরের নিত্যপূজা সমাপ্ত করিয়া—কদাচিৎ পূজা করিবার পূর্বেও—তিনি দীক্ষার্থীকে আহ্বান করিতেন এবং ঠাকুরের ছবির সম্মুখে, নিজের পার্শ্বস্থিত বা সম্মুখস্থ আসনে তাহাকে বসিতে দিয়া আচমন করাইয়াই মন্ত্রদান করিতেন। ক্বচিৎ দুইএক জনের দীক্ষার সময় তিনি কিছু কিছু আনুষ্ঠানিক ব্যাপারও করিয়াছেন, শুনা যায়। গৌরীকান্ত বিশ্বাসকে দীক্ষাদান-কালে তিনি ঘট-স্থাপন করিয়া অর্চনাদি করিয়াছিলেন। প্রয়োজন হইলে তিনি ব্যক্তিবিশেষকে যখন তখন, যে-কোন অবস্থায় এবং অতি বিচিত্র উপায়েও যে মন্ত্রদান করিতেন, তাহা কুলীবেশী পশ্চিমা ভক্তের ঘটনায় দেখা গিয়াছে, নিম্নোক্ত ঘটনাগুলিতেও দেখা যাইবে।

শ্রীমতী প্রমীলা বসুকে শ্রীশ্রীমা কোয়ালপাড়ায় সন্ধ্যার পর মন্ত্রদান করিয়াছিলেন।

একবার জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা ছাঁচতলায় দাঁড়াইয়া স্বামী বরদানন্দ প্রমুখ ভক্তগণের প্রণাম গ্রহণ করিতেছিলেন। সর্বশেষে নবাগত একটি লোক প্রণাম করিতে আসিয়া মার পা-দুইখানি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল এবং মুখে কোন কথা না বলিয়া ও জিজ্ঞাসার কোন উত্তর না দিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল। তাহার মনোভাব বুঝিয়া মা অন্য সকলকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং সেই ছাঁচতলায় দাঁড়াইয়াই তাহাকে মন্ত্র দিলেন।

এক বৎসর জগদ্ধাত্রীপূজার সময় রাঁচি হইতে একটি ছেলে শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা নিতে যায়। মা পূজার কার্যে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, ছেলেটিকে মার সঙ্গে দেখা করিতেই দেওয়া হয় নাই। শেষদিন একবার মাত্র মাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে দিয়াই তাহাকে বিদায় করা হইবে, কিন্তু দীক্ষার কোনরূপ সুযোগ দেওয়া হইবে না—এইরূপ মতলবও করা হইয়াছিল। ভোরবেলা বিদায়ের সময় ভক্তেরা মার শয়ন-ঘরেই তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেন। মা তখন শয্যা ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার শরীর তত ভাল ছিল না। সকলে একে একে প্রণাম করিবার পর সর্বশেষে ছেলেটি প্রণাম করিল এবং মার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া এমন কাঁদিতে আরম্ভ করিল যে, চক্ষের জলে তাঁহার পা ভিজিয়া গেল। মা তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, 'কাঁদচ কেন বাবা? কি চাও—মন্ত্র নেবে? (অন্যান্যের প্রতি) তোমরা একটু বাইরে যাও, আমি একে মন্ত্র দেব।' মা দরজা বন্ধ করিয়া সেই অবস্থায় তাহাকে দীক্ষা দিলেন। [ত]

সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় বলেন: "হ্যারিসন-রোডের মেসে অবস্থান-কালে একদিন ভোররাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, একটি লালরঙের জ্যোতির রেখা মার বাড়ী হইতে কালীঘাট পর্যন্ত গিয়াছে। দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, মা বোধ হয় কালীঘাট গিয়াছেন। ঘটনা সত্য কি-না, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য গঙ্গায় স্নান করিয়া বরাবর বাগবাজারে চলিয়া গেলাম। যাইয়া শুনি, মা সেখানে নাই, কালীঘাট গিয়াছেন! সেইদিন বিকালবেলা মাকে প্রণাম করিতে আবার বাগবাজারে গেলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি সকালে এসেছিলে?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ।' কিন্তু যে জ্যোতির রেখা দেখিয়াছিলাম, তাহা সত্য কি-না জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তখন আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

"অন্য একদিন যাইয়া ঐকথা উত্থাপন করিতেই মা বলিলেন, 'ছেলেমানুষ, ওসব খবরে কাজ কি?' আমি জানিবার জন্য জেদ করায় বলিলেন, 'না হয় সত্যিই দেখেচ, তাতে কি হবে?' এই সময় আমার মনে কেমন ভাবান্তর উপস্থিত হইল: বলিলাম, 'মা, তুমি লোকজনকে কি দীক্ষা দাও? কি দীক্ষা দাও, আমাকে বল তো!' ইতঃপূর্বে আমি মাকে কখন 'তুমি'

সম্বোধন করি নাই। আমার প্রশ্নের উত্তরে মা 'এই দীক্ষা দিই' বলিয়াই আমার ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।"

জয়রামবাটী হইতে শ্রীশ্রীমা যখন শেষবার কলিকাতায় আসেন পথে বিষ্ণুপুরে শ্রীসুরেশ্বর সেনের বাড়ীতে এক কলু তাঁহার কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করে। মা তাহাকে ফিরাইয়া দেন এবং কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী যামিনী দেবীকে বলেন, 'ছাখ মা, একজন কলু এসেছিল দীক্ষা নিতে; কলুকে তো কখন দীক্ষা দিই নি।' যামিনী কহিলেন, 'আপনি তো জগতের মা, আমি কি ক'রে জানি মা, আমি কি ক'রে ব'লব মা, আপনি কি ক'রবেন?' মা আহারাদির পর বিকালবেলা সেই কলুকে ডাকাইয়া আনিয়া দীক্ষা দিলেন।

শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা লইবার মানসে আসিয়া ক্বচিৎ কেহ যে ফিরিয়া যায় নাই, এমন নহে। তবে তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, নগণ্য; এবং অনেকস্থলেই মা তাহাদিগকে দীক্ষা দিতে স্বয়ং অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রায়বর্ম্মণ বলেন: পিংনায় গঙ্গাধর সাহা (বড়) নামে একটি ছেলে আমার কাছে আসিত ও ঠাকুরের প্রসঙ্গ শুনিত। কিছুদিন পরে গঙ্গাধর সাহা (ছোট) নামে তাহার এক বন্ধুও আসিতে থাকে। যেবার আমার গর্ভধারিণী ও পরিবারকে মার কাছে লইয়া যাই, ঐ দুই বন্ধুকেও কলিকাতায় যাওয়ার জন্য টেলিগ্রাম করি এবং কলিকাতায় গেলে মার কাছে তাহাদের দীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেই। প্রথমে বড় গঙ্গাধরের দীক্ষা হইয়া গেলে মা ছোটটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু সে ইত্যবসরে সরিয়া পড়িয়াছে। মা দীক্ষা দিবার জন্য আসনে বসিয়াই ছিলেন এবং সে চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'হতভাগার কপালে নাই!' পলাইয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ছেলেটী পরে বলে যে, তাহার মনের মধ্যে কেমন একটা ভয় উপস্থিত হইয়াছিল।

দীক্ষাদান ব্যাপারে শ্রীশ্রীমার এক অপূর্ব স্বাতন্ত্র্যময়ী মূর্তি ক্বচিৎ কখন প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। তাঁহার কাছে মন্ত্র লইবার জন্য কেহ হয়তো ঠাকুরের কোনও বিশিষ্ট সন্তানের সুপারিশ লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু যে কারণেই হউক, মা তাহাকে দীক্ষা দিতে চাহেন নাই, কিংবা সঙ্কল্পে অটুট থাকিয়া সেও আর মার কাছে অগ্রসর হইতে পারে নাই। অথচ মা তাঁহার

দীনতম ভক্তসন্তানের প্রার্থনায় আপাতদৃষ্টিতে অতি অযোগ্য লোককেও শ্রীপদে আশ্রয় দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমা যখন কাহাকেও শ্রীপদে আশ্রয় দিবেন বলিয়া স্থির করিতেন, কার্যকালে যে-কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেও তাহাতে দৃক্‌পাত করিতেন না। শ্রীকর্ণাটকুমাব চৌধুবী ও তাঁহাব স্ত্রীব দীক্ষাব সময় ইহা বিশেষভাবে দেখা গিয়াছিল। কর্ণাটবাবু বলেন: "ছেলেবেলা হইতে বৈষ্ণবভাবেব উপর ঝোঁক থাকায় বৈষ্ণব সন্ন্যাসীব কাছে মন্ত্র গ্রহণ করি। আমার দুই ভগিনী শ্রীশ্রীমাব মন্ত্রশিষ্য হওয়ায় তাঁহাব কথাও শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ বা শক্তি সম্বন্ধে আমাব কিছুমাত্র ধারণা ছিল না। ১৩২১ সালেব মাঘমাসে বৃন্দাবন যাওয়াব উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসি এবং গঙ্গাস্নান করিয়া মাকে প্রণাম করিতে যাই। মা পূজা কবিতে বসিয়াছিলেন, আমি বারান্দায় থাকিয়া প্রণাম কবিতেই আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, 'পা ছুঁয়ে প্রণাম কব।' আমি আদেশ পালন করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে একটা অননুভূতপূর্ব অভয় ও আনন্দেব ভাব আসিয়া চিত্ত অধিকার করিল। আমি করজোড়ে আশীর্বাদ ভিক্ষা কবিলে মা কহিলেন, 'গোবিন্দ কৃপা ক'রবেন।'

"বৃন্দাবন হইতে ফিরিবাব পথেও শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়া তাঁহারই নির্দিষ্ট দিনে বাড়ী আসি। আমার প্রথমা স্ত্রীব মৃত্যু হইল, এবং পুনরায় বিবাহেব স্বল্পকাল পবেই দ্বিতীয়া স্ত্রীও সম্ভবতঃ ভূতাবিষ্ট হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়িল। তাহাকে সুস্থ কবিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে একদিন দেহপ্রবিষ্ট ভূত তাহাকে লইয়া কলিকাতায় মার কাছে যাইতে আদেশ করিল।

"এই ঘটনাব পূর্ব হইতেই মনে হইতেছিল, যে পথ নিজে বাছিয়া সস্ত্রীক শ্রীভগবানেব দিকে অগ্রসব হইবাব চেষ্টা করিতেছিলাম তাহা যেন ঠিক হয় নাই। ক্রমশঃ এই ভাব দৃঢ়মূল হইতেছিল, কিন্তু শ্রীশ্রীমা সম্ভবতঃ পুনবায় মন্ত্র নেওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না ভাবিয়া মনটা উতলা ও নিবাশ হইয়া পড়ে।

"কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমার কাছে যাতায়াত করিতে লাগিলাম কিন্তু সাহস করিয়া তাঁহাকে মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারিলাম না। একদিন পূজনীয় শরৎ-মহারাজের কাছে সমুদয় ব্যক্ত করিয়া তাঁহার

আনুকূল্য ভিক্ষা করিলাম। মহারাজ আশ্বাস দিলেন, তথাপি ধৈর্য রাখিতে না পারিয়া ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথকে আমাদের কথা মাকে নিবেদন করিতে অনুরোধ করিলাম। তাঁহাকে আরও বলিলাম যে, মা ইচ্ছা করিলে শরৎ-মহারাজের কাছে আমাদের বিষয় সব জানিতে পারিবেন। গণেন্দ্রনাথ মার নিকট হইতে আসিয়া কহিলেন, 'মা বল্লেন, শরতের কাছে কেন শুনতে যাব?' অবশেষে আমাদের দীক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইতে পরিবারকে বলিয়া দিলাম।

"পরিবার শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষার কথা তুলিতেই গোলাপ-মা তর্জন করিয়া কহিলেন, 'মন্ত্র ভুলে গেছ নাকি? না গুরুত্যাগ ক'রে এসেচ?' মা কিন্তু শান্তভাবে দীক্ষার দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন ও দুইজনকেই গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিতে কহিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্বদিন রাত্রেই স্ত্রীর ভীষণ জ্বর হইল; ভূতাবিষ্ট হওয়ার পর হইতেই মাঝে মাঝে এইরূপ হইত। তথাপি মার আদেশানুসারে উভয়ে স্নান করিয়া আসিলাম। আমার দীক্ষার পর যখন স্ত্রীর পালা আসিল, গোলাপ-মা চীৎকার করিয়া, 'একে গুরুত্যাগ ক'রে এসেচে, তাতে আবার প্রবল জ্বর, কিছুতেই এর দীক্ষা হবে না'—এই কথা বলিয়া উপস্থিত সুধীরা দেবীকে 'জ্বরের কাঠি' লাগাইয়া দেখিতে আদেশ করিলেন। সুধীরা কাঠিটি বগলে দিয়াই তুলিয়া লইয়া বলিলেন, 'ও কিছু নয়, স্নান ক'রে শরীরটা সামান্য গরম হয়েচে মাত্র।' তথাপি গোলাপ-মা বাধা দিতে থাকায় মা জোরে গুরুগম্ভীর-স্বরে কহিলেন, 'সুধীরা, নিয়ে এস।' তখন মার মুখের ভাব অন্যরূপ হইয়াছে এবং ঘরের বায়ুমণ্ডল কি-একটা আবেশে জমজম করিতেছে! কাহারও আর বাঙ্-নিষ্পত্তি করিবার সাহস হইল না; নির্বিঘ্নে স্ত্রীর দীক্ষা হইয়া গেল।"

শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণবশতঃ শ্রীশ্রীমা দীক্ষাদানে প্রথমতঃ অসম্মত হইলেও, যাহারা তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছে, অথবা মুখে কিছু না বলিয়াও অন্তরের অন্তস্তলে বা অশ্রুজলে আকুলতা নিবেদন করিয়াছে, তাহারা কোনকালে তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হয় নাই। প্রকৃত ব্যাকুল ব্যক্তির প্রতি মা বিমুখ হইয়াছেন এমন একটি ঘটনাও আমরা জানি না। প্রাণের আবেগ বর্ধিত করিয়া ভক্তকে অধিকতর কৃতার্থ করিবার জন্য,

কোন বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য, কিংবা ভক্তের অনুরাগ-মাধুর্য বাহিরে প্রকটিত করিয়া স্বয়ং উহা আস্বাদন করিবার জন্য মা যে কাহাকেও কাহাকেও প্রথম প্রস্তাবে দীক্ষাদানে অসম্মত হইতেন, কোন কোন ঘটনায় ইহার আভাস পাওয়া যায়।

নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বলেন: কৃষ্ণলাল-মহারাজের আদেশে দুই বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ১৩২৬ সালের পৌষসংক্রান্তির দিন জয়রামবাটী পৌঁছিলাম। জনৈক সাধু ইহাদের অভিপ্রায় শ্রীশ্রীমাকে জানাইলে তিনি শরীর অসুস্থ বলিয়া দীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন না। ইহারা কাঁদিতে লাগিল। তখন আমি নিজে একবার বলিয়া দেখিব মনে করিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইতেই মা বলিলেন, 'বাবা, কিছু ব'লবে?' আমি বলিলাম, 'হ্যা মা, এরা দীক্ষা নিতে এসেচে, তুমি দেবে না বলাতে বাইরের ঘরে বসে ভয়ানক কাঁদচে।' '(স্নেহমাখা স্বরে) ছাখ, আমার শরীরটা এখন ভাল নয়, এখন তো দীক্ষা হবে না।' 'কিন্তু মা, বড় কাঁদচে যে ওরা? তুমি না দিলে দেবে কে?' '(একটু থামিয়া) তুমিও ব'লচ?' 'হ্যা, নিশ্চয়ই ব'লচি।' 'কিন্তু এদের দেহ যে অশুদ্ধ? এদের এখানে তিন রাত্রি বাস ক'ত্তে বল। এখানে তিন রাত্রি বাস ক'ল্লে দেহ শুদ্ধ হ'য়ে যাবে—এটা শিবের পুরী কি-না!'

শ্রীবসন্তকুমার সরকার লিখিতেছেন: "শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে আমার দীক্ষা হইয়া যাওয়ার পর তাঁহার আদেশে নীচের তলায় নামিয়া গেলাম। তারপর আমার স্ত্রী দীক্ষা প্রার্থনা করিলে মা বলিলেন, 'বেলুড়-মঠে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আছে, তাদের কাছে মন্ত্র নাওগে।' সে বলিল, 'মা, আমি বাড়ী থেকে, তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় পাব—এই আশা নিয়ে, ধারকর্জ করেও অতি কষ্টে এখানে এসেচি। এখন তুমি আশ্রয় না দিলে, আমি কোন্ মুখে, প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফিরে যাব? আমি আর কারো কাছে দীক্ষা নেব না।' তাহার দৃঢ়তায় মা যেন বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'আর বাঙ্গাল নয়, আর বাঙ্গাল নয়, বাঙ্গালরা বড়ই নাছোড়বান্দা। ঠাকুর আগে চ'লে গিয়ে সব আমার উপর ফেলে গেছেন।' মার কথায় ও ভাবে তাহার মনে শেলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণের আবেগে ও দুঃখে ভূমিতে পড়িয়া গান ধরিল,—'যে হয় পাষাণের মেয়ে

তাঁর হৃদে কি দয়া থাকে, দয়াহীনা না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে ?'

"মা ঠাকুর-পূজা করিবাব জন্য আসনে বসিয়াছিলেন মাত্র, আর করা হইল না ; ভাবে বিভোর হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন এবং শেষ হইতে না হইতে বলিলেন, 'আব একটি গান গা মা, আর একটি গান গা—তোব গান বড়ই মিষ্টি ; তুই আমাব পাগলী মেয়ে, তোর অনেক ভাল চিহ্ন আছে।' এইরূপে কয়েকটি গান শুনিবাব পব মা বলিলেন, 'উঠে ব'স্ মা ; তোর গানে যে আমি পূজো ক'ত্তে পারি নি ! আদেশ কর্ মা, আমি পূজো ক'ত্তে বসি, তুই একটু বিশ্রাম কর।' পূজান্তে সে পুনবায় ধরিয়া বসিলে মা দীক্ষার জন্য দিন নির্ধারিত কবিয়া দিলেন এবং প্রসাদী পান আনিয়া নিজ হাতে তাহাব মুখে গুঁজিয়া দিতে দিতে কহিলেন, 'তোর মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, পান ভালবাসিস যে, এই প্রসাদী পান খা।' "

যে-সকল ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে দর্শন অথবা তাঁহার কাছে দীক্ষাগ্রহণ করিবাব জন্য আসিতেন, পূর্ব হইতে কিছু না জানাইয়া বাখিলেও মা তাঁহাদের কথা অনেক সময়ে তাঁহাবা আসিয়া পৌঁছিবাব পূবেই জানিতে পারিতেন। শ্রীমাখনলাল দত্ত যেদিন জয়রামবাটীতে আসিয়া পৌঁছেন, মা সেইদিন সকালবেলা কেদারের মাকে বলিয়াছিলেন, 'আজ একটি ছেলে কষ্ট ক'রে মন্ত্র নিতে আসচে।' শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সন্ধ্যায় জয়রামবাটীতে পৌঁছিয়া শুনিলেন, মা পূর্বেই বলিয়া বাখিয়াছেন. 'আজ একটি ঠাকুরেব ভক্ত আসতে পাবে ; তোমরা কিছু বেশী রুটি ক'রে রাখবে।' এমন ঘটনা এক আধ দিন নয়, প্রায়ই হইত। আবাব কখন কখন ভক্ত-সন্তানকে দেখিবার পূর্বেই তিনি তাহার সম্বন্ধে মন্তব্যও করিয়াছেন, দেখা যায়।

পূর্বোক্ত মহেন্দ্রবাবু বলেন : স্বামী অরূপানন্দেব মুখে আমার দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা জানিয়া, আমাকে না দেখিয়াই শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'মন্ত্র নেবার ইচ্ছে তো ভালই। কিন্তু এই ইচ্ছেটা কি ধর্মলাভের জন্যে, না কুলগুরুর পাওনা নষ্ট ক'রবাব জন্যে ? না ক'ল্লে দিতে পারি।' আমার দীক্ষার একমাস পরে স্ত্রী ধরিয়া বসিল, মার কাছে সেও মন্ত্র লইবে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনমাসের সন্তান কোলে, কোনরকমে

তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলাম। সে দীক্ষার জন্য আসিয়াছে শুনিয়া তাহাকে দেখিবার পূর্বেই মা বলিলেন, 'চারদিন পরে হবে।' বাসায় যাইয়া দেখা গেল, তাহার চারদিনের ভিতর দীক্ষার বিঘ্ন ঘটিয়াছে!

মুখে কিছু প্রকাশ না করিলেও সমীপবর্তী ভক্ত-সন্তানের মনের কথা জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীমা কথায় অথবা কার্যে তাহার উত্তর দিতেন। ইহার নিদর্শন পাঠক পূর্বে পাইয়া থাকিলেও এখানে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। মহেন্দ্রবাবু বলেন: স্ত্রীর দীক্ষার দিন আমি নীচে বসিয়া ভাবিতেছি, যে প্রসাদ পাইলাম তাহা মায়েরই প্রসাদ, কিংবা সাধুরাই খাইয়া দিয়া গেল, বুঝিলাম না। একটু পরেই উপরে মাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি, তিনি একটি সন্দেশ যেন আমাকে দেখাইয়াই খাইতেছেন! আমি প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র উহা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'খাও।'

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার লিখিতেছেন: একদিন বিকালে কিছু মিষ্টি ও মাটির ভাঁড়ে কিছু গব্যঘৃত লইয়া মার বাড়ীতে গেলাম। একজন ব্রহ্ম-চারীর হাতে জিনিষগুলি দিতেই তিনি উপরে লইয়া গেলেন; কিন্তু জিনিষ-গুলি মার কাছে দেওয়া হইল কি-না, সে বিষয়ে মনে একটা খট্‌কা লাগিল। সেদিন দর্শনার্থী বহুলোকের সঙ্গে প্রণাম করিয়া আসিলাম। পরদিন সকালে আবার মাকে দর্শন করিতে গিয়াছি; প্রণাম করিয়া উঠিতেই দেখি, তাঁহার পায়ের সন্নিকটে খাটের নীচে সেই ঘৃতভাণ্ডটি রক্ষিত। মা ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘি তুমিই এনেছিলে?'

সুরেনবাবু বলেন: একদিন মা আসনে বসিয়া আছেন, আর আমি তাঁহার সম্মুখস্থ অপর একটি আসনে বসিয়া কথা কহিতেছি; হঠাৎ মনে হইল, পুঁথিতে আছে যে মার 'পদতল রাঙা', কিন্তু একদিনও তো তাঁহার পদতল দেখিতে পাইলাম না। যেমন মনে হওয়া, অমনি মা তাঁহার পা-দুইখানি সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন! যুগপৎ আনন্দিত ও লজ্জিত হইলাম।

জনৈক দশনামী সন্ন্যাসী, চট্টগ্রামের লোক, একসময়ে আপন মনে ভাবিতেন: ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রাপ্তি মানবজীবনের কাম্য—শাস্ত্রে বলে। আমার চারিবর্গই লাভ হইয়া গিয়াছে, না কোনটি

এখনও বাকী আছে? কে বলিয়া দিবে! এইরূপ ভাবনায় যখন তাঁহার চিত্ত বিকল, একদিন কলিকাতায় পরমহংসদেবের স্ত্রীকে দর্শন করিতে আসিলেন। পরমহংসদেবের ভক্তেরা তাহাকে জগদম্বা বলেন, একথা সত্য কি-না, জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর পাইলেই বুঝিতে পারিবেন এরূপ ভাবনাও তাঁহার মনে ছিল। শ্রীশ্রীমা তখন অসুস্থ ছিলেন বলিয়া সকলকে দেখা করিতে দেওয়া হইত না। সাধুটি ব্যাকুলভাবে জানাইলেন যে, তিনি দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে জীবনে আর কখনও আসা হয়তো সম্ভব হইবে না, দূর হইতে একটিবার দর্শনের সুযোগ পাইলেই কৃতার্থ হইবেন, কথাটি কহিবেন না। সাধুকে উপরে লইয়া যাওয়া হইলে মা সেবককে বলিলেন, 'ছেলেটিকে ভিতরে ডাক।' তিনি মাকে প্রণাম করিয়া নীচে চলিয়া গেলে মা কহিলেন, 'ছেলেটিকে তিনটি ফল দিয়ে এস।' তিনটি আমফল হাতে করিয়া সাধু ভাবিতে লাগিলেন, একি ব্যাপার! আমার কি তাহা হইলে ত্রিবর্গ লাভ হইয়া গিয়াছে? কোন্‌টিই বা লাভ করিতে বাকি? বাকিটিও এই জন্মেই পাইব কি? এমন সময় মার আদেশে সেবক তাঁহাকে আর একটি ফল আনিয়া দিলেন। তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, মোক্ষফলটিই এখনও তাঁহার লাভ হয় নাই, সেইটিও পাইবেন. কিন্তু বিলম্বে।[৮]

কোন ব্যাপারে শ্রীশ্রীমার মুখ হইতে যদি কোন কথা বাহির হইয়া পড়িত, তাহা আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইলেও কার্যে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। স্বামী মহাদেবানন্দ বলেন: একদিন কোয়ালপাড়া হইতে তরকারীর ঝুড়ি মাথায় লইয়া জয়রামবাটী গিয়াছি, তরকারী রাখিয়া ও জলখাবার খাইয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেই মা বলিলেন, 'এখন যেযো না, খেয়েদেয়ে বিকেলে যাবে।' আমি থাকিতে সম্মত না হওয়ায় যেন ভয় দেখাইয়া বলিলেন, 'যেযো না, এখুনি বৃষ্টি আসবে।' মা ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন, আমাকে দেখাইবেন যে আকাশে মেঘ করিয়াছে। কিন্তু

---

[৮] স্বামী জপানন্দের কাছে ঘটনাটি বলিয়া সাধুটি তাঁহার নাম প্রকাশ না করিতে অনুরোধ জানান।

আকাশে তখন মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। আমি প্রণাম করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসিলাম। আমোদর পার হইয়া মাঠের খানিকটা আসিয়াছি আর মুষলধারে বৃষ্টি! দৌড়াইতে দৌড়াইতে দেশড়ায় এক ডোমের কুটীরে আশ্রয় লইলাম; কাপড়চোপড় একেবারে ভিজিয়া গেল।

সুরেনবাবু বলেন: হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত চট্টগ্রামে কাজ করিত। জয়রামবাটীতে দীক্ষা দেওয়ার পর মা তাহাকে করজপ করিবার পদ্ধতি দেখাইয়া দিলেন; কিন্তু কয়েকবার দেখিয়াও হেম তাহা শিখিতে পারিল না। মা বলিলেন, 'তুমি সুরেনের কাছে শিখে নেবে।' সে বলিল, 'কোথায় সুরেন থাকে রাঁচিতে, আর কোথায় আমি থাকি চাটগাঁয়! এ কেমন করে সম্ভব হবে?' মা বলিলেন 'তা হ'য়ে যাবে।' হেম জয়রামবাটী হইতে চাটগাঁয় ফিরিতেছে, আর আমি যাইতেছি রাঁচি হইতে ঢাকায়, গোয়ালন্দ ষ্টীমারে পরস্পর সাক্ষাৎ!

শ্রীশচন্দ্র ঘটক বলেন: একবার রাঁচি হইতে নিশিকান্ত মজুমদার আমাদের সঙ্গে জয়রামবাটী গিয়াছিল। সে আপিসে ছুটি নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু বিভাগীয় কর্তা নারাজ থাকায় ছুটি মঞ্জুর হয় নাই। এই কথা মার কানে পৌঁছিলে তিনি নিশিকে তখনই ফিরিয়া যাইতে বলেন, কিন্তু নিশি ধরিয়া বসিল, সে আমাদের সঙ্গে ফিরিবে। অগত্যা মা অভয় দিয়া কহিলেন, 'তাই হোক।' রাঁচিতে ফিরিয়া আসার পর ঐ বিভাগীয় কর্তা নিশির বিরুদ্ধে বড় সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিল। কিন্তু সাহেব কোন হুকুম না দিয়াই কাগজখানা ফেরত দিলেন। এইভাবে বারত্রয় ফেরাফিরির পর চতুর্থবারে সাহেব লিখিলেন, 'বিনা বেতনে অনুপস্থিত সময়ের বিদায় মঞ্জুর হইল।' এই হুকুম-লিখিত কাগজখানাও হারাইয়া গেল। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানি, ইহার মধ্যে নিশির কোনরূপ চেষ্টাচরিত্র নাই। ফল এই দাঁড়াইল যে, তাহাকে শাস্তিদানের কোনরূপ চেষ্টা আর করা হইল না!

শ্রীশ্রীমার কাছে ভক্ত-সন্তান মনের বাসনা ব্যক্ত করিতে সহজেই অগ্রসর হইত, কিন্তু মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কথায় বা কার্যে লঘুতা প্রকাশ করিতে পারিত না। চন্দ্রমোহন দত্ত লিখিতেছেন: বৈশাখের শেষাশেষি একদিন বেলা প্রায় দশটার সময় বাহিরের রোয়াকে বসিয়া আছি, খুব গরম

পড়িয়াছে। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দ গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেছিলেন, শুদ্ধানন্দজী কহিলেন, 'চন্দ্র, তুমি মার কাছে সর্বদা যাও আর প্রসাদ খাও; আমি একটি কথা বলি, এই কথাটি মাকে বলতে পার?' 'কেন পারব না?' 'তুমি মাকে গিয়ে বল,—মা, আমি মুক্তি চাই।' 'আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি এখনই বলে আসচি।' উপরে যাইয়া দেখি, মা ঠাকুর-পূজায় বসিয়াছেন। আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু শরীর কাঁপিতে আরম্ভ করিল। একটু পরেই মা আমার দিকে চাহিলেন। তাঁহার এই রকম চাহনি আমি আর কখনো দেখি নাই, মুখের ভাব দেখিয়া আমার বুক তুরু তুরু করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চন্দ্র, কি চাও?' আমার গলা কে যেন চাপিয়া ধরিল, মুক্তির কথা বলিতে পারিলাম না। মা আবার বলিলেন, 'চন্দ্র কি চাও?' আমি বলিলাম, 'প্রসাদ চাই।' মা হাত দিয়া তক্তাপোষের নীচে ঢাকা প্রসাদ দেখাইয়া দিলেন, এবং আর আমার দিকে না চাহিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টাকাল আমার শরীরের কাঁপুনি বন্ধ হইল না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

গুরু

(পূর্বানুবৃত্তি)

যাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীমা দীক্ষাদান করিতেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও কুল-পরম্পরাগত সংস্কার—শ্রীভগবানের কোন্ রূপের কে উপাসক—দেখিয়া তবে মন্ত্র দিতেন। ব্যক্তিগত সংস্কার প্রায়শঃ কুলপরম্পরাগত সংস্কারের অনুযায়ী হইয়া থাকে। জন্মজন্ম ধরিয়া শ্রীভগবানের যে রূপের যে উপাসনা করিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই রূপের ভজনাই স্বাভাবিক এবং উহাতেই তাহার দ্রুত উন্নতি হইয়া ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন হইয়া থাকে। শিষ্যের ইষ্টরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াই যে মা তাহার সংস্কার নিরূপণ করিতেন, নিম্নোক্ত ঘটনাগুলিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমার কাছে শক্তিমন্ত্র প্রার্থনা করিলে মা বলিলেন, 'তোমার ভিতরে তো বাবা, রামকে দেখছি। তোমাদের বংশে কি সকলে রাম-মন্ত্রের উপাসক? রাম আর শক্তি তো ভিন্ন নয়; তবে আর রাম-মন্ত্র নিতে আপত্তি কি?' সত্য সত্যই উহারা বংশানুক্রমে রাম-মন্ত্রের উপাসক। [ত]

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রাহ্মণ-সন্তান বোধ হচ্চে, তোমার কোন্ মূর্তি ভাল লাগে?' তিনি বলিলেন, 'শিবের কোলে কালী বসে আছেন, এইটি আমার খুব ভাল লাগে।' 'শক্তি কি বাবা, কখন শিব ছাড়া থাকেন? তোমার শক্তি-মন্ত্র'—এই বলিয়া মা মন্ত্রোচ্চারণ করিবামাত্র ভিতর দিয়া যেন তড়িৎ-প্রবাহ চলিয়া গেল এরূপ তাঁহার বোধ হইল এবং সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা আনন্দ ও নেশার ঘোর তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

শ্রীসারদাকিঙ্কর রায়ের পূর্বপুরুষ শাক্ত। তিনি কিন্তু বাল্যকাল হইতে বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিশিয়া বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। পরে যখন মার কাছে মন্ত্র নিতে গেলেন, মা তাঁহাকে শক্তি-মন্ত্র দিলেন। ইহাতে মনে একটু খট্‌কা লাগিলেও তিনি বাহিরে কিছু প্রকাশ করিলেন না। বিকালে আবার মার কাছে যাইতেই মা বলিলেন, 'আমি তোমাকে ঠিকই দিয়েচি।'

এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীশ্রীমা ক্বচিৎ কাহাকেও আগে বিষ্ণুমন্ত্র দিয়া কিছুদিন জপ করাইয়া, পরে শক্তিমন্ত্রও দিয়াছেন এবং বিভিন্ন সময়ে দুইটি মন্ত্রই জপ করিতে বলিয়াছেন, দেখা যায়।

ব্যক্তিগত ইষ্টরূপ দেখিতে পাইলেও শ্রীশ্রীমা 'তোমার কোন্ মূর্তি ভাল লাগে?'—ইত্যাকার প্রশ্ন মন্ত্রদানের অব্যবহিত পূর্বে অনেককেই করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই শিষ্যের উত্তর তাঁহার ব্যক্তিগত দর্শনের অনুরূপ হইয়াছে এবং তিনিও আর কিছু না বলিয়াই মন্ত্রদান করিয়াছেন। শিষ্যের উত্তর বা ধারণা তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষের বিরোধী হইলে তিনি যে তাহার ভুল বুঝাইয়া দিতেন, প্রাগুক্ত ঘটনাগুলিই ইহার প্রমাণ। মার প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন শিষ্য-সন্তান 'আমি কিছু জানি না', 'আমার পক্ষে যা ভাল

হয় তাই দিন' ইত্যাদি কথা বলিয়া নীরব হইত। আর সকলকেই তিনি ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিতেন না।

কাহারও কাহারও ইষ্ট-নিরূপণ করিতে যে শ্রীশ্রীমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইত, একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। যাহাদের জন্মান্তরীণ কোন নির্দিষ্ট সংস্কার তেমন প্রবল নাই, বা কর্মদোষে কোনরূপ প্রতিবন্ধক জন্মিয়াছে, তাঁহাদের বেলায়ই ঐরূপ হইত বলিয়া মনে হয়। ঐসকল স্থলে অল্পকাল আত্মস্থ থাকিয়াই মা তাহাদের ইষ্টরূপ দেখিয়া লইতেন।

ইষ্টমন্ত্ররূপে শ্রীশ্রীমা কাহাকেও কাহাকেও ঠাকুরের নামের মন্ত্র দিয়াছেন; কাহাকেও বা ঐ মন্ত্র দিয়া গুরুমন্ত্ররূপে ইষ্টমন্ত্রের পূর্বে জপ করিতে বলিয়াছেন। শ্রীতারকনাথ রায় চৌধুরীকে মা লিখিয়াছিলেন, 'ঠাকুরের নাম ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলকেই দেওয়া যাইতে পারে।...আর এক কথা, মন্ত্র দিতে হইলে নিজের ইষ্টমন্ত্র কদাচ কাহাকেও দিবে না।'[১]

শ্রীশ্রীমা যেমন ঠাকুরের নাম সকলকেই দেওয়া যাইতে পারে বলিয়াছেন, তেমনি তাঁহাতে সকল দেবদেবীরই পূজার বিধান দিয়াছেন; আবার সাধকের ব্যক্তিগত ভাবানুযায়ী ঠাকুরের উপর যে-কোন ভাবারোপেও তাঁহার সম্মতি রহিয়াছে দেখা যায়। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ ঠাকুরকে স্বীয় পতি জ্ঞান করিয়া মধুরভাবে ভজনা করিতেন; সেই কথা মাকে নিবেদন করিলে মা উত্তর দেন, 'বেশ তো বাবা, তাতে কিছু দোষ নাই; ঠাকুরের সব ভাবই ছিল।'[২]

শ্রীশ্রীমা তাঁহার প্রদত্ত ইষ্টমন্ত্রেই সকল দেবতাকে পূজা করা চলিবে,

---

[১] স্বামী জগদানন্দের কাছে শুনিয়াছি, মাদ্রাজের একটি বিধবা মেয়ে শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্র পাইয়াই বলেন, 'এখন থেকে আমি মন্ত্র দেব; আমাদের সব শিষ্যেরা আসে, কি দিতে হয় এতদিন জানতাম না।' তাহাতে মা বলেন, 'না না, নিজেরটি দিয়ো না; আমি তোমাকে আর একটি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেটি দেবে।' স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দকে বহুমন্ত্র বলিয়া দিয়া মা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তুমি মন্ত্র দেবে?' আর তিনি সবিনয়ে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলে বলিয়াছিলেন, 'দিলেই বা, দোষ কি?'

[২] কমলেশ্বরানন্দজী স্বামী ত্র্যম্বকানন্দকে ইহা বলিয়াছিলেন।

বলিয়াছেন। আহারের সময় ঠাকুরকে অন্ন নিবেদন করিবার মন্ত্র জানিতে চাহিলে স্বামী তন্ময়ানন্দকে মা বলিয়াছিলেন, 'যে মন্ত্র দিয়েচি, ঐ মন্ত্র। এ মন্ত্রে সকল দেবদেবীর পূজাও হবে।' তন্ময়ানন্দজী জিজ্ঞাসা করেন, 'মন্ত্র না নিলে কি পূজো করা চলে না?' মা উত্তর দেন, 'মন্ত্র না নিলে কি পূজো ক'রবে? সে তো ছেলেখেলা!'

মন্ত্রদানের পর শ্রীশ্রীমা অনেককেই ঠাকুরের ছবি দেখাইয়া বলিয়াছেন, 'এই তোমার গুরু।' স্বামী সাধনানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, আপনি তো বল্লেন, ঠাকুরই গুরু; তবে আপনি কি?' মা উত্তর দিলেন, 'বাবা আমি কিছুই না, ঠাকুরই গুরু, ঠাকুরই ইষ্ট '

শ্রীশ্রীমার ঐরূপ কথায় সকল ভক্তই সন্তুষ্ট হইতেন না। একজনকে ঠাকুরের শ্রীমূর্তি দেখাইয়া মা যেমন বলিলেন, 'এই তোমার গুরু', তিনি বলিলেন, 'হ্যাঁ মা, উনি তো জগদ্গুরু।' আবার তাহাকে দক্ষিণেশ্বরের ৺ভবতারিণী-মূর্তি দেখাইয়া মা যেমন বলিলেন, 'এই তোমার ইষ্ট', অমনি তিনি বলিলেন, 'মা, সাক্ষাতে থাকতে অসাক্ষাতে যাব কেন?' [অর্থাৎ আমার ইষ্ট আমি সাক্ষাতেই দেখিতেছি, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আবার অন্যরূপের ধ্যানচিন্তা করিতে যাইব কেন?] তাহার আন্তরিক ভাব দেখিয়া মা স্মিতহাস্যে বলিলেন, 'আচ্ছা বাবা, তাই হবে।' 'তাই' শব্দটি মা জোর দিয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন। [উ]

কিন্তু, তাঁহার শ্রীপদে আশ্রয় লইয়া কোন ভক্তের তথাকথিত নিষ্ঠা—ঠাকুরকে বাদ দিয়া কথায় কথায় মার নাম করা—উৎকট আকার ধারণ করিতেছে দেখিলে, শ্রীশ্রীমা অপূর্বভাবে শিক্ষা দিয়া তাহা বিদূরিত করিতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে নিজের অভিন্নত্ব তাহার হৃদয়ে গাঢ়মুদ্রিত করিয়া দিতেন। স্বামী প্রাণাত্মানন্দ লিখিতেছেন: "কোয়ালপাড়ায় আমি দীক্ষান্তে প্রণাম করিয়া উঠিতেই মা বলিলেন, 'আজ খুব ভাল দিন—দোলপূর্ণিমা, গৌরাঙ্গ-প্রভুর জন্মদিন: এই আবীর লও, ঠাকুরকে দাও।' আমি আদেশ পালন করিলাম।

"কলিকাতায় মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি; জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন আছ?' আমি বলিলাম, 'আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি।' মা বলিলেন,

'তোমাদের ঐ বড় একটা দোষ। সব কথায় আমাকে যোগ দাও কেন? ঠাকুরের নাম ব'লতে পার না? যা কিছু দেখচ সবই ঠাকুরের।'

"আর একদিন মাকে দর্শন করিতে গিয়াছি, বলিলেন, 'এত দেরী ক'রে এলে কেন? আমি এখন কাপড় কাচতে যাচ্চি।' আমি বলিলাম, 'অনেকক্ষণ এসেচি, কিন্তু বড়ই কড়া হুকুম। মা, ইচ্ছে করে, প্রত্যহ একবার আপনাকে দর্শন ও প্রণাম করি, কিন্তু এখানকার কড়া হুকুমের জন্যে ভয় করে।' মা আমার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, 'বাবা ঠাকুরের ইচ্ছেই বলবতী। তোমার যেটুকু দরকার তিনি তাই দিচ্ছেন। এর জন্যে মনে দুঃখ না ক'রে আনন্দ কোরো।'

"মার অসুখ চলিয়াছে। দোল-পূর্ণিমার দিন তাঁহার পাদপদ্মে আবীর দেওয়ার সাধ করিয়া গেলাম, কিন্তু কিছুতেই দর্শনের অনুমতি পাইলাম না। আমার দুঃখ দেখিয়া গুরুভ্রাতা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তি দিলেন,—'মাকে দর্শন করব' না বলে, 'ঠাকুরকে দর্শন করব' বলুন; তা হলে মার দর্শনও হবে। সত্যসত্যই ঐরূপ হইল। আমি মাকে প্রণাম করিয়া আবীর পায়ে দিব কি-না চিন্তা করিতেছি, এমন সময় মা বলিলেন, 'আবীর এনে থাকলে আগে ঠাকুরকে দাও, তারপর আমাকে দাও।' তাঁহার আদেশ পালন করিয়া বলিলাম, 'মা, খুব আশা করে এসেছিলুম আপনার পায়ে আবীর দেব বলে, কিন্তু দর্শনের অনুমতি না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিলুম।' মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন ক'রে এলে?' তারপরে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, 'তোমাকে ব'লেচি যে যা কিছু সবই ঠাকুরের। তা ভুল কর ব'লেই তো বাধা পাও।' আমি বলিলাম, 'আজ আপনার পায়ে আবীর দিতে না পারলে মনে খুব কষ্ট হত।' মা বলিলেন, 'এভাবে কখন মনে কষ্ট ক'রবে না; ঠিক জানবে, মনের সঙ্গে সবই ঠাকুর গ্রহণ করেন।' 'ঠাকুর তো করেন, কিন্তু—।' 'আবার ভেদ ভাব কেন?'"

নলিনবাবু কথায় কথায় শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, 'আমরা তো ঠাকুরকে দেখি নি, আমরা আপনাকেই জানি।' মা বলিলেন, 'না বাবা, ঠাকুরকেও ডাকবে; আর যা কিছু খাবে, তাঁকে নিবেদন ক'রে খাবে। তাতে রক্ত পরিষ্কার হবে, মন পবিত্র হবে, দেহ নির্মল হবে।' নবদ্বীপচন্দ্র

রায়বর্মণকে মা বলিয়াছিলেন, 'যে ঠাকুর, সেই মা—এই জেনে জপধ্যান কোরো।'

ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে এমন কেহ কেহ ছিলেন যাঁহারা তাঁহাতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করিলেও শ্রীশ্রীমাকে মনুষ্যমাত্র জ্ঞান করিতেন, এবং ঐরূপ করিতেন বলিয়াই ঠাকুর হইতে তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতেন। পরে মার কৃপায় কাহারও কাহারও সেই ভাব যে বিনষ্ট হইয়াছে, নিম্নোক্ত ঘটনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একদিন নলিনবাবু ও শ্যামবাজারের অদ্বৈতচরণ দাস কলিকাতায় মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন: মা ঠাকুরের প্রসাদ ঠোঙায় রাখিয়া, নিজের জিহ্বায় ঠেকাইয়া তাহাদের হাতে এক এক ঠোঙা দিলেন, উপস্থিত আর একটি ভক্তকেও দিলেন। ভক্তটি ঠোঙা হাতে করিয়া বলিল, 'মা, আমি যে ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া [অন্যের প্রসাদ] খাই না।' মা বলিলেন, 'তবে খেয়ো না।' ভক্তটির কথায় তাঁহারা অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেছিলেন, দেখিলেন, মার উত্তর শুনিয়া সেও গম্ভীর ও চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু খানিক পরেই উৎফুল্ল হইয়া বলিল, 'মা, এবার বুঝতে পেরেচি, ঠাকুর যা, আপনিও তা—অভেদ।' মা বলিলেন, 'তবে খাও।'

ঠাকুরে ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়াও যাহারা শ্রীশ্রীমাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখিবে, তাহাদের যথার্থ কল্যাণ যে ব্যাহত হইবে, স্বামী প্রেমানন্দের উক্তি হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায়। মঠে একদিন সন্ধ্যাবেলা স্বামী মহেশ্বরানন্দ প্রমুখ ভক্তদের নিকটে মার কথা বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'যে শালারা ঠাকুর আর মাকে দুই-দুই ভাববে, তাদের কিছু হবে না—কিছু হবে না—কিছু হবে না: টাকার এপিট আর ওপিট।'

* * * *

অধিকারি-ভেদে শ্রীশ্রীমার শিক্ষাদান এক অদ্ভুত ব্যাপার। ব্যক্তি-বিশেষের জন্মজন্মান্তরাগত সংস্কার, বর্তমান মানসিক পরিণতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া উপদেশ-দানে তিনি যে ঠাকুরের মতই সমর্থ ছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

একদিন নলিনবাবু শ্রীশ্রীমার কাছে বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন

আসিয়া বলিল, 'মা, কোন কাজকর্ম না করে জীবনটা বৃথা কাটানো ভাল লাগচে না।' মা বলিলেন, 'হ্যাঁ বাবা, তা বই কি ; কিছু না ক'ল্লে শরীর-মন পবিত্র হবে কিসে ? দশের সেবা কর।' এই ভক্তটি চলিয়া যাইতেই আর একজন আসিয়া বলিল, 'মা, আর গু-মূত ঘাটতে পারি না।' মা বলিলেন, 'হ্যাঁ বাবা, তা বই কি ; ওসবে কি আছে ? ও সব ক'রে কি হবে ? জপধ্যান কর, ঈশ্বরে ভক্তি হোক।'

কোয়ালপাড়া-মঠে স্বামী তন্ময়ানন্দের প্রধান কাজ ছিল হাঁড়ি মাজা। বর্ষার সময় হাঁড়ি মাজিতে মাজিতে তাঁহার হাতে পায়ে হাজা ধরিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। তিনি জয়রামবাটীতে যাইয়া শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, 'মা, আমি আর হাঁড়ি মাজতে পারচি না।' মা বলিলেন, 'ঢেঁকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুলতলায় বাস ! তোমার এত কষ্ট সহ্য হবে না। তুমি উহরকুণ্ড যাও—যতগুলি পার ছেলে পড়াবে আর ধ্যানজপ ক'রবে।'

একদিন শ্রীশ্রীমা ঐশ্বরিক প্রসঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি গ্রাম্যলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। মা উপস্থিত প্রসঙ্গ পাল্‌টাইয়া দিয়া এমনভাবে বৈষয়িক কথা কহিতে লাগিলেন, যেন ঐসকল কথাই এতক্ষণ ধরিয়া চলিতেছিল ! [সু]

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার জ্বর : দুইজন সাধু তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন এমন সময়ে জনৈক গৃহস্থ ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা বলিতেছিলেন, 'ঠাকুর নরেন, শরৎ এদিকে নিয়ে তান্ত্রিক চক্র ক'ত্তেন।' হঠাৎ থামিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কে এখানে আছে ?' অন্যের নাম শুনিয়া তিনি আর সেই প্রসঙ্গ করিলেন না। [প্র]

শ্রীভগবানের কাছে সকাম প্রার্থনা করা উচিত কি-না, তদুত্তরে বহু ভক্তকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, 'মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি—কি চাইতে কি চাইবে ! তবে ভক্তি ও নির্বাসনা চাইতে হয়।' আবার, তাঁহার উপর একান্তভাবে নির্ভরকারী কোন ভক্ত-সন্তানকে বলিয়াছেন, 'তোমার যখন যা দরকার আমার কাছে চাইবে।' আর 'চাওয়া কি ভাল ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে জোরের সহিত বলিয়াছেন, 'আমার কাছে চাইবে না ?—আমি মা।' [আ]

ধর্ম ও সাধকজীবন সম্পর্কিত কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে শ্রীশ্রীমার শিক্ষা ও উপদেশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৈলাসকামিনী রায়কে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'এই কাঁচা শরীর দিয়েই পাকা শরীর লাভ ক'র্ত্তে হয়; সেইজন্য এই শরীরটাকে যত্ন করা চাই।'

স্বামী অব্যয়ানন্দকে শ্রীশ্রীমা লিখিয়াছিলেন, 'ব্যাধি ও তপস্যা একই জিনিষ—তপস্যার মত ব্যাধিতেও কর্মক্ষয় হয়।'

স্বামী কৈবল্যানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, 'মনেতে নানারকম ভালমন্দ চিন্তা উঠে, এর কি হবে?' মা উত্তর দেন, 'ওর জন্যে তুমি ভেবো না। কলিতে মনের পাপ পাপ নয়, যদি কাজে না করে। আর আর যুগে মনের সঙ্কল্পেই পাপপুণ্য হ'ত'। কলিযুগে সৎ-চিন্তা মনে হ'লে তার উত্তম ফল হবে।'

মন সকল সময়ে জপধ্যানে বসিতে চায় না, কখন বেশ ভাল থাকে, কখন আবার খারাপ হয়। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া মা বলিলেন, 'কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ যেমন আছে, মনেরও সেরকম অবস্থা হয়—কখন ভাল, কখন মন্দ। এ প্রকৃতির নিয়ম। মনের যেমন অবস্থাই হোক না কেন, সকালসন্ধ্যায় ব'সতে ছাড়বে না। মন ভাল অবস্থায় থাকলেও সকল সময় বেশ ব'সতে চায় না, আবার চঞ্চল অবস্থার মধ্যেও কখন কখন বেশ ব'সে যায়। কোন্ মুহূর্তে যে হবে তা ব'লবার যো নাই।' [ন]

শ্রীগোপালকিঙ্কর সেনকে মন্ত্র দিয়া মা বলিলেন, 'এতদিন মানুষ ছিলি, এখন মানহুঁস হলি। তুই ডাকিস তাঁকে—বেশী জপ কর আর না কর্।'

স্বামী প্রাণাত্মানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তীর্থভ্রমণের ইচ্ছে হয়, তীর্থভ্রমণ কি ভাল?' মা বলিলেন, 'তীর্থভ্রমণ খুব ভাল, ওতে মন পবিত্র হয়। তবে দীক্ষা নিয়ে তীর্থদর্শনে যাওয়া ভাল।'

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় স্বপ্নে একটি নাম পাইয়া জপ করিতেন, সেই কথা উত্থাপন করিলে মা বলিলেন, 'বীজ ছাড়া কি মন্ত্র হয় গা?' [মা তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন।]

তারকনাথ রায় চৌধুরীকে মা পত্রে জানাইয়াছিলেন,—'বকলমা' মানে, মনে মনে ভগবানকে সমস্ত ভার অর্পণ করা। বকলমা দেওয়ার পরেও ইষ্টমন্ত্র জপ, কিংবা দিনান্তেও ভগবানকে একবার স্মরণ করিতে হয়।

কোয়ালপাড়ায় শ্রীশ্রীমা যখন রাধুকে লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে একদিন শ্রীমতী নন্দরাণী দত্তকে ঠাকুর-পূজা করিতে বলেন। নন্দরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, আমাকে পূজো ক'ত্তে ব'লচেন, আমি পূজোর মন্ত্র জানি না—কি ক'রে ক'রব?' মা বলিলেন, 'ঠাকুরের গা মুছায়ে চরণে ফুল, তুলসী ও চন্দন দেবে। তারপর যা খাবার ক'রেচ, ঠাকুর খাও ব'লে ধ'রে দেবে। তারপর ইষ্টমন্ত্র জপ ক'রবে।'

'ঠাকুরকে কতজনে কতভাবে দেখতে পায়, শুনি; আমার ভাগ্যে কি তা হবে না?'—এই প্রশ্নের উত্তরে নিশিকান্ত মজুমদারকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: কেন হবে না? নিশ্চয়ই হবে। স্থানটি যদি পবিত্র হয়, মনটি যদি শুদ্ধ থাকে, তা হ'লে তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। কোয়ালপাড়ায় একদিন যখন ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে ঘরে (জগদম্বা-আশ্রমে) গেলাম, দেখি ঠাকুর মেজেতে শুয়ে আছেন। ব'ল্লুম, সে কিগো, তুমি এমন ক'রে শুয়ে কেন? ঠাকুর ব'ল্লেন, আমার বড় ভাল লাগে। এই কথা বলিয়াই মা অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন।

উমেশবাবুর সঙ্গে শ্রীশ্রীমার বিভিন্ন সময়ে নিম্নোক্তরূপ কথাবার্তা হয়: 'ঠাকুর বলেচেন, তাঁর কাছে যে যাবে তারই মুক্তি হবে। আপনার কাছে যারা আসে, তাদের কি হবে?' '(সহাস্যে) তাদেরও তাই হবে।' 'অনেকে তো নির্বাণ-মুক্তি চায় না, তাদের কি হবে?' 'শোন নাই, নিত্য-কৃষ্ণ—নিত্যভক্ত? সেভাবে তারা থাকবে। তোমাদের ভয় কি, তোমাদের জন্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ-লোক তৈরি ক'রেচেন।' 'ধ্যান করার সময় গুরুমূর্তি ও ইষ্টমূর্তি দুইটিই আসতে চায়, অথচ দুটি মূর্তি ধারণা করা কষ্টকর। এর কি করা যায়?' 'প্রথম প্রথম এরকম হ'লেও, পরে দেখবে একটি মূর্তিই আসবে। যে মূর্তিটি আসে, তাকেই ধ'রে থাকবে।' 'আমার বাসার ভৃত্য যামিনী তো আপনার কৃপা পেয়েচে, এখন তার সেবা কি ক'রে নেওয়া যায়?' 'সখ্যভাবে তার সেবা নেবে।'

একদিন মা কথায় কথায় বলিলেন, 'লোকে ভগবান ভগবান করে, এই যে খুঁটিটি দেখচ, এর ভিতর ভগবান আরোপ ক'ত্তে পাল্লেও ভগবান লাভ হ'তে পারে।' [উ]

স্বামী বরদানন্দ কালীঘাটের প্রসাদী সিন্দূরের ফোঁটা কপালে দিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলেন। দেহের বর্ণ, গৈরিক ও সিন্দূরের ফোঁটা মিলিয়া দেখিতে খুব বাহার হইয়াছিল। মা তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'ঠাকুর ব'লতেন, ধর্মের আঁচড়টি পর্যন্ত যেন বাইবে না থাকে।'

স্বামী তন্ময়ানন্দ লিখিতেছেন : একবার শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের প্রসাদী জিলিপী খাইতে দিয়াছেন। আমি খাইতে ইতস্ততঃ করিতেছি—একাদশীর দিন, তাহা ছাড়া ময়রার ও ছুতারের তৈরি জিনিষ খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। মা আমার হাত হইতে একখানা জিলিপী লইয়া উহার কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া আবাব আমাব হাতে দিলেন ও বলিলেন, 'এবাব আর ময়রার জিনিষ নাই, এখন খাও। যে জিনিষ ঠাকুবকে নিবেদন কবা হয়, সে জিনিষ যেমনই হোক, আব তা থাকে না—প্রসাদ হ'য়ে যায়। কিন্তু প্রসাদ হ'লেও, লোভ ক'বে কখন খাবে না।' তারপবে মার সঙ্গে আমার নিম্নোক্তরূপ কথাবার্তা হয় : 'মা, ধ্যানজপ করার সময় ঐসকল চিন্তা আসে কেন?' 'আসবে বই কি। সহজে কি কেউ ছেড়ে দিতে চায়? সবাই নিজের দিকে টানে।' 'আপনি কিছু ক'বে দিন যেন একেবারে ভুলে যাই।' '(আমার মাথায় হাত দিয়া) এখন থেকে আর ও বিষয়ে চিন্তা আসবে না—এমন কি তার ছবি পর্যন্ত নয়।' 'মা, আমার সাকার-ধ্যান হয় না।' 'তাতে কি? একটা ভাবলেই হ'ল'। তবে (একটি মূর্তি দেখাইয়া) এই রূপ ভাববে। খুব জপ ক'রবে। যদি লাখ লাখ ক'ত্তে পাব, দেখবে, আমি যা ব'লেচি সব মিলে যাবে। বোজ এক অধ্যায় গীতা প'ড়বে—মনে মনে সঙ্কল্প ক'রে যে, তাঁর প্রীতিব জন্যে প'ড়চি। যেদিন সময় হবে না, অন্ততঃ দুচার শ্লোক প'ড়ে নেবে। কোন একটা আসন ঠিক ক'রে নেবে যাতে বেশীক্ষণ ব'সতে পার, অন্ততঃ দুইতিন ঘণ্টা। অভ্যাস ক'ত্তে ক'ত্তে হ'য়ে যাবে। যখন দেখবে পা ঝিন্‌ঝিন্ ক'চ্চে তখন পা ব'দলে নেবে; পবে আব কষ্ট হবে না।' 'ধ্যানের সঙ্গে জপ করব, না পবে করব?' 'একসঙ্গে ক'ত্তে পার। না হয় পরে ক'রবে।' 'একবার এটা (এক রূপের ধ্যান), আর তারপর ওটা (অন্য রূপের নামজপ), বিরোধী হবে না?' '(হাসিতে হাসিতে) ক্ষ্যাপা ছেলে! ও দুইই তো এক। একজনের দুই রূপ—বিরোধী কেন হবে?'

"সন্ন্যাস-দানেব পর সম্মুখে বসাইয়া মা আমাকে নিম্নোক্ত উপদেশগুলি দিয়াছিলেন : 'তোমার বেদনার জন্যে কষ্ট হয়, তুমি বেশী খাটুনির কাজ কোরো না। বাসি, পচা জিনিষ খাবে না। যা খাবে, মনে মনে ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে খাবে। শরীবের উপকারী জায়গায় থাকবে। যদি কখন কোন আশ্রমে থাক, প্রথমেই ব'লে রাখবে,—আমি বেশী খাটতে পাবব না। ঐ জন্যে অনেক ঝগড়াঝাঁটি হয়। ঝগড়া, মন-কষাকষি ক'বে কখন আশ্রমে থাকবে না ; না পোষায়, আব কোন জায়গায় চ'লে যাবে—সেও ভাল। আশ্রম হ'ল' দ্বিতীয় সংসাব। আশ্রমে এসে নানা কাজে জড়িয়ে ছাড়তে পারে না। এমন মোহ এসে জোটে যে, তাকে অপব জায়গায় যেতে ব'ল্লে যেতে চায় না, গেলেও, ঘুবে ফিবে আবার এসে জোটে। সংসারে দুঃখ পেয়ে বৈরাগ্য আসে, তাই ছেড়ে পালায়। আর আশ্রমে থেকে থেকে ক্রমে বৈরাগ্য কমতে থাকে। আশ্রমে তো বেশী কষ্ট ক'ত্তে হয় না, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে ; উদ্দেশ্য ভুলে যায়—তাকে যে ভগবান লাভ ক'ত্তে হবে সেটা মনে হয় না। (সন্ন্যাসের পর বাড়ী যাওয়া উচিত কি-না, এই প্রশ্নের উত্তরে) সন্ন্যাসীব বাড়ী যাওয়া উচিত নয়। কেউ কেউ যায় বটে, তবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তোমাব তো কেউ নাই ; আর থাকলেই বা কি, নিজেদেব লোক দেখলে আগের কথা মনে পড়ে। ওসব ভুলে যেতে হবে, এমন কি নিজের শরীর পর্যন্ত, তবে তাঁব দর্শন হবে।' "

স্বামী অসিতানন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনাদের পাদপদ্মে বিশ্বাস কি করে হয় ?' শ্রীশ্রীমা উত্তর দেন, 'বিশ্বাস কি সোজা কথা বাবা ? বিশ্বাস শেষের কথা—বিশ্বাস হ'লেই তো হ'য়ে গেল !'

* * * *

ভক্তিশাস্ত্র একটি কথা বলেন যে, ভগবান দীনের বন্ধু এবং নিজে দীন না হইলে দীনবন্ধুকে কেহ চিনিতে পাবে না। এ দীনতা অন্তর সর্বপ্রকাব অভিমানে পূর্ণ রাখিয়া কেবলমাত্র বাহিরে দীনভাব প্রদর্শন করা নহে, অন্তরের অন্তস্তলে সত্য সত্যই আপনাকে দীনহীন বোধ করা। এই দীনতার প্রতিমূর্তি ছিলেন ভক্তচূড়ামণি দুর্গাচরণ নাগ ও বলরাম বসু। এইরূপ যথার্থ দীনহীন ভক্তের প্রতি শ্রীশ্রীমার করুণার অন্ত ছিল না।

যখনই কোন ভক্ত অন্তরে দীনভাব লইয়া তাঁহার সমীপবর্তী হইয়াছে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে অভীষ্টদানে কৃতার্থ করিয়াছেন।

অঘোরনাথ ঘোষ কথামৃতে পড়িয়াছিলেন, ঠাকুর ঘোর বিষয়ী লোকের হাওয়া সহ্য করিতে পারিতেন না এবং ঐরূপ লোক দেহস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে তাঁহার কষ্ট হইত। সেইজন্য শ্রীশ্রীমাকে যেদিন তিনি প্রথম দর্শন করেন, দূর হইতে প্রণাম করিলেন। মা বসিয়াছিলেন, তখনই উঠিয়া আসিয়া তাঁহার মাথায় হাত দিলেন।

স্বামী সিদ্ধানন্দ বলেন ঃ ভূপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক নামে এক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীমার কাছে আসি। পথে আসিতে আসিতে মনে হইতেছিল, মা যদি ইহাকে কৃপা করেন তো বেশ হয়। আমরা প্রণাম করিয়া উঠিবা-মাত্র মা বলিলেন, 'বাবা, এই ছেলেটির দীক্ষার কথা ব'লচ?' তখনও কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলি নাই। আমি বলিলাম, 'আপনি যদি একে কৃপা করেন, তা হলে খুব ভাল হয়।' মা দীক্ষার দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি এইরূপ অযাচিতভাবে কৃপা করিতে চাহিলেও, ভূপেন নিজের অবস্থা আলোচনা করিয়া, সে যে এরূপ কৃপা পাইতে পারে না এবং হয়তো কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া পাইবেও না, তাহাই আমাকে বারবার বলিতে লাগিল। আমি তাহাকে নানাকথা বলিয়া ভরসা দিলাম। বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহার দীক্ষা হইয়া গেল। সেদিন আরও কয়েকজন দীক্ষা নিয়াছিল; দীক্ষান্তে মা আমাকে বলিলেন, 'বাবা, তোমার এ ছেলেটির মন ভাল; তাই আমি একেই আগে দীক্ষা দিলুম।'

শ্রীরমণীমোহন চৌধুরী বলেন ঃ স্কুলে পাঠ্যাবস্থা হইতেই দীক্ষার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়। শিক্ষকদের মুখে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার কথা শুনিয়াছিলাম। মার কাছে মন্ত্র নেওয়ার ইচ্ছা হইত, কিন্তু আমার মত অযোগ্যের পক্ষে তাঁহার দর্শনলাভও অসম্ভব বিবেচনায় সে আশা ত্যাগ করিয়া বাবা গম্ভীরানাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণের সঙ্কল্প করি। কিছুদিন পরে সংবাদ আসিল, গম্ভীরানাথ দেহরক্ষা করিয়াছেন। মনটা বড়ই দমিয়া গেল। ব্যাকুল হইয়া অবিলম্বে মাকে একটিবার অন্ততঃ দর্শন করিবার জন্য ঢাকা হইতে জয়রামবাটী রওনা হইলাম। তথায় পৌঁছিয়া মার বাড়ীর

বাহিরের ঘরে প্রায় এক ঘণ্টা বসিয়া রহিলাম, কেহ আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিল না। অগত্যা ভিতরে যাইয়া জ্ঞানানন্দ-মহারাজকে প্রণাম করিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, 'তুমি কি মাকে কোন চিঠি লিখেছিলে?' 'আমি বলিলাম, 'না।' 'তোমার কি দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা আছে?' 'আমি কি সে কথা বলতে পারি?' 'যাও যাও শীগ্‌গির স্নান করে এস; মা সকাল থেকে বলছিলেন, আজ একটি ছেলে আসচে। মা পূজা শেষ করে আসনে বসে আছেন।'

ভক্তিশাস্ত্র আর একটি কথা বলেন যে, ভক্তের কৃপা হইলে ভগবানেরও কৃপা হয়। সে কৃপা প্রত্যক্ষ করা সচরাচর মানুষের ভাগ্যে ঘটে না। শ্রীশ্রীমার কাছে কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত নিত্য প্রমাণিত হইতে দেখিয়া তৎকৃপায় চক্ষুষ্মান লোকেরা ধন্য হইতেন। স্বামী জগদানন্দের মুখে শুনিয়াছি, মার কাছে উপস্থিত হইয়া কোন বিশিষ্ট ভক্তের উপদেশানুযায়ী আচরণ বা ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে, মা প্রসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ সমীপাগত ব্যক্তির মনস্কামনা পূর্ণ করিতেন। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতের ফলে, যে-সকল ভাগ্যবান পুরুষ মার বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়াছিলেন এবং একাধিকবার তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা যখন তখন যে-কোন লোককে সঙ্গে লইয়া আসিলে মা সেই ব্যক্তিকে কৃপা-বিতরণে ইতস্ততঃ করিতেন না। স্বামী তন্ময়ানন্দের সঙ্গে আগত তাঁহার কোন ছাত্রকে মা বলিয়াছিলেন, 'তবে কালই তোর দীক্ষা হবে রে, তোর পণ্ডিত-মশাই যখন ব'লচে।' তন্ময়ানন্দজী বলিলেন, 'সে কি মা, আপনার ইচ্ছে হয় তো দিন; আমার কথা আপনি কেন শুনবেন?' মা বলিলেন, 'না বাবা, কখন কখন শুনতে হয়—ছেলের আব্দার মাকে রাখতে হয়।' এই ছেলের আব্দার রক্ষা এবং স্বভাবসিদ্ধ করুণার জন্য মা নির্বিচারে শত শত লোককে শ্রীপদে আশ্রয় দিয়াছেন। অগণিত বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ ব্যতীত বহু মান্দ্রাজী ও অন্যান্য প্রদেশবাসী মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ—তাহা ছাড়া পাশ্চাত্য ভক্তগণও আছেন—তৎপদে আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।[৩]

---

[৩] শ্রীশ্রীমার বাঙ্গালী মন্ত্রশিষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে বাগ্‌দি পর্যন্ত সমাজের প্রায়

দীক্ষা-দান সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলিতেন, "মন্ত্রের ভিতর দিয় শক্তি যায়—গুরুর শক্তি শিষ্যে যায় ; শিষ্যেব পাপ গুরুতে আসে। তাই তো মন্ত্র দিলে পাপ নিয়ে শরীরে এত ব্যাধি হয়। শিষ্য পাপ ক'ল্লে গুরুরও লাগে। রাখাল তাই মন্ত্র দিতে চায় না ; বলে, 'মা, মন্ত্রেব নামে আমার গায়ে জ্বর আসে।' " [গ] বহু বৎসব ধরিয়া নির্বিচারে বহু লোককে মন্ত্রদান করার ফলে, তাহাদের পাপতাপ গ্রহণ করিয়া মা যে নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্মান্তিক সমগ্র বিবরণ, সহৃদয় পাঠক! আমরা প্রদান করিতে অসমর্থ জানিয়া ক্ষমা করিও। ইহা তো লৌকিক গুরুর শাস্ত্রবিধান রক্ষাব জন্য কেবল কর্ণে মন্ত্র-শ্রবণ কবানো নহে ; ইহা চৈতন্যরূপিণীর চেতন-মন্ত্র দানেব সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যে চৈতন্যসঞ্চাবণ—শিষ্যের বহু-জন্মের কর্ম-ভোগেব কতক নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া এবং ঐশী শক্তির বলে অবশিষ্ট সমুদয় ভোগকে প্রাবব্ধেব সংকীর্ণ কোঠায় সীমাবদ্ধ করিয়া প্রকৃত পক্ষে তাহাকে জীবন্মুক্তি-পদবীতে আরূঢ করানো। 'মা. আমাদের এত রোগভোগ হয় কেন?'—স্বামী বামানন্দের এই প্রশ্নেব উত্তরে মা বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের এই শেষ জন্ম ; তাই বাকী সব জন্মের কর্মফল এই জন্মেই ভোগ হ'য়ে যাচ্চে।'

'আমি জন্মজন্মান্তবে যা কিছু পাপ ক'রেচি, সব তোমাকে অর্পণ কবলুম'—বহু শিষ্যকে ঈদৃশ সম্প্রদান-বাক্য পাঠ করাইয়া শ্রীশ্রীমা তাহাদের পাপতাপ ববণ করিয়া নিয়াছেন। আর যাহাদিগকে তিনি ঐরূপ কবান নাই, তাহাদেব দুর্ভোগও যে নিজের শরীবে গ্রহণ কবেন নাই, এমন নহে। কোনরূপ প্রবল দুষ্কর্ম অথবা সঞ্চিত বহুপাপের জন্য যাহারা সাধনভজন ও উপলব্ধির পথে বিশেষ বাধা অনুভব কবিতেছে, তাহাদিগকে ঐরূপ সম্প্রদান-

সকল স্তরের লোকেরা আছেন। অনুসন্ধানে মার চাবিজন বাগ্‌দি শিষ্যের কথা জানিতে পারি। শ্রীভূষণচন্দ্র পুইল্যা তাঁহাব মাতুল শিবদাস দোলই ও মাতুলেব কাকা যতীন্দ্রনাথ দোলইয়ের সঙ্গে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া জয়রামবাটীতে উপস্থিত হন। মা প্রথমতঃ দীক্ষাদানে অসম্মত হইলে সরলবিশ্বাসী ভূষণ এই বলিয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন, 'তোমার তো এক বাগ্‌দি [ডাকাত] বাবা ছিল, বাগ্‌দি ছেলে তবে কেন হবে না?' শিবদাসের জমিদারী ছিল ও তিনি বাগ্‌দি-রাজা নামে খ্যাত ছিলেন।

বাক্য পাঠ করাইয়া তাহাদের মনের ভার লাঘব করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কাছে আসিয়া অনেকের চিকিৎসার অতীত উৎকট ব্যাধি যে একেবারে সারিয়া গিয়াছে, সে কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহারা একবার মাত্রও তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীপদ স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই দীর্ঘকাল ধরিয়া দেহ-মন নির্মল ও আনন্দ-পরিপূর্ণ বোধ করিয়াছে। শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র দত্তের* কাছে লেখক তাহার প্রথম বয়সে শুনিয়াছিল 'বছরে একবার মাকে দর্শন করে আসতে পারলেই হল—একবারমাত্র দর্শন করলেই দেখি. একটি বছর আনন্দে কেটে যায়।' আর এবিষয়ে লেখকের নিজের অভিজ্ঞতাও কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে। যদি পরকালের ভয়ে ভীত, নিদারুণ রোগ হইতে সদ্যোমুক্ত, দুর্বার অন্তঃ-সংগ্রামে আত্মরক্ষায় অসমর্থ, দিশাহারা যুবক মার শ্রীচরণে আশ্রয়লাভের ফলে মনের সাম্য ফিরিয়া না পাইত, স্বল্পকালের মধ্যেই যমের ভয়ের পরিবর্তে স্ফুট হইতে স্ফুটতর মুক্তাভিমান অন্তরের অন্তস্থলে অনুভব না করিত, জীবনের সঙ্কট-মুহূর্তসমূহে আপনাকে দেব-রক্ষিত বলিয়া বুঝিতে না পারিত, তাহা হইলে বহুপূর্বেই তাহার অস্তিত্ব ইহ-সংসার হইতে মুছিয়া যাইত, আর বাহ্য দৃষ্টিতে একান্ত অসহায় বিরূপ অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও দয়ারূপিণীর জগৎপাবনকাহিনী লোককে শুনাইবার দুঃসাহস করিতে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইত না।

শ্রীশ্রীমা একদিন বলিয়াছিলেন, 'কি ব'লব, এমন সব লোক আসে, যারা না ক'রেচে এমন কাজটি নাই। আমাকে এসে মা ব'লে ডাকে, আমি ভুলে যাই—যে যার যোগ্য নয়, তার চেয়ে বেশী এখান থেকে নিয়ে যায়। কেউ পায়ে হাত দিলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, আবার কেউ হাত দিলে যেন বোলতায় কামড়ায়। তা হোক, তোমরা শরৎকে একথা বোলো না।'

---

* শ্রীশ্রীমার এই হৃদয়বান সন্তান একদা লেখকের প্রতিবেশী। ইনিই প্রথম তাহাকে মার কথা শুনাইয়াছিলেন; এবং মার অন্যতম সুসন্তান শ্রীহট্টের শ্রীঅতুলচন্দ্র চৌধুরী তাহার মার কাছে আসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের সুযোগ পাইয়া আজ সে ধন্য হইল।

[সু] 'শরৎকে একথা বোলো না' বলার উদ্দেশ্য,—পাছে সারদানন্দ-মহারাজ মার বিশেষ কষ্ট হইতেছে জানিয়া বিচলিত হইয়া পড়েন এবং ভবিষ্যতে যাহাকে তাহাকে তাঁহার কাছে আসিতে না দেন। দুশ্চরিত্র পাপী-তাপী লোককে আশ্রয়দানের কথায় মা বলিতেন, 'ভাল ছেলের মা তো সকলেই হ'তে পারে, মন্দটিকে কে নেয়?' স্বামী কেশবানন্দ প্রমুখ মঠে আগত ভক্তগণকে প্রেমানন্দ-মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, 'যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারচি না, সব মার কাছে চালান দিচ্চি, মা সকলকেই কোলে তুলে নিচ্চেন। অনন্ত শক্তি—অপার করুণা! সকলকে আশ্রয় দিচ্চেন, সকলের দ্রব্য খাচ্চেন, আর সব হজম হযে যাচ্চে।' মহীশূর-রাজ্যের পূর্বতন কর্মচারী নারায়ণ আয়েঙ্গার একবার মার পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন। কারণ, ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তিনি বুঝিযাছিলেন যে ঐরূপ স্পর্শাদির ফলে মার শরীরে পাপ সঞ্চারিত হইয়া উঁহাকে পীড়িত করে। সেকথা শুনিয়া মা বলিলেন, 'আমরা পাপতাপ না নিলে আর নেবে কে? আমরাই পাপ নিয়ে হজম ক'র্ত্তে পারি—আমরা তো সেই জন্যেই এসেচি।'

শ্রীশ্রীমার কোন শিষ্যের নৈতিক অবনতি ঘটিলে মাষ্টার-মহাশয় ঐ ব্যক্তির মার কাছে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত বিবেচনা করেন। সেই কথা শুনিয়া মা সকরুণভাবে বলিযাছিলেন, 'আমার ছেলে যদি ধূলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধূলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।' [গ]

জনৈক স্ত্রীলোক একসময়ে মার কাছে আসিতেন বলিয়া সাধুরা ও অন্যান্য স্ত্রী-ভক্তেরা বিরক্ত হইতেন। একদিন বলরামবাবুর স্ত্রী গোলাপ-মাকে দিয়া জানান যে, ঐ স্ত্রীলোকটি এভাবে যাতায়াত করিলে মার কাছে তাঁহাদের আসা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে মা দৃঢ়তার সহিত বলিযা-ছিলেন, 'আমার কাছে যারা আশ্রয় নিয়েচে, তারা আসবে। একজন এলে যদি আর একজন না আসে, আমি তার কি ক'রব?' আগে ঐ স্ত্রীলোকটির হাতে কেহ কিছু খাইতেন না, কিন্তু মা তাহার হাতে খান এবং অন্য প্রকারে তাহার সেবাও গ্রহণ করেন দেখিয়া সকলেই খাইতে আরম্ভ করেন। [গ]

নিজে অসীম-শক্তিময়ী এবং সহনশীলতার প্রতিমূর্তি হইলেও, নরদেহ-

ধারিণী শ্রীশ্রীমা নিত্য বহুলোকের পাপ-জ্বালার সংসর্গে আসিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় শেষকালে একএক সময়ে যে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া না পড়িতেন এমন নহে। একদিন বলিয়াছিলেন, 'এ শরীর আর বয় না। একএক দিন ঠাকুরকে বলি—আর কেন? সেদিন একপাল এনে হাজির করবেন।' [সু] মাকে ঐরূপে বিচলিত হইতে দেখিয়া স্বামী অরূপানন্দ বলিয়াছিলেন, 'তুমি যে মন্ত্র দাও, সে তো ইচ্ছা করেই দাও।' তাহাতে মা উত্তর দেন, 'দয়ায় মন্ত্র দিই—ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়। কৃপায় মন্ত্র দিই, নইলে আমার কি লাভ? মন্ত্র দিলে তার পাপ নিতে হয়। ভাবি, শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক!' [গ]

একদিকে দয়ার আতিশয্যে প্রবল জীবোদ্ধার-বাসনা এবং অন্যদিকে, বহু তাপিতের জ্বালাগ্রহণ-জনিত অসহনীয় যাতনা—এই দুইয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব একদিনের ঘটনায়, শ্রীশ্রীমার কথার উচ্ছ্বাসে, যেভাবে বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা অতিশয় করুণ। স্বামী গৌরীশানন্দ বলেন: জয়রাম-বাটীতে একদিন রাত্রে ভীষণ জ্বরের অবস্থায়, পায়ের বাতও বাড়িয়াছে, মা বলিতে লাগিলেন, 'আজ আর কেউ [দীক্ষা নিতে] এল' না। ঠাকুর ব'লেছিলেন, কত কাজ ক'ত্তে হবে—বাকি আছে। একটি দিন বৃথা গেল!' পরদিন সকালে তিনজন লোক শ্রীব্রহ্মানন্দ-মহারাজের পত্র লইয়া দীক্ষার জন্য উপস্থিত। পত্রখানি পড়িয়া শুনাইতেই মা কাতরস্বরে কহিলেন, 'ছেলে বিদেশ থেকে মাকে কত ভাল ভাল জিনিষ পাঠায়, রাখাল আমাকে শেষকালে এই পাঠালে!'

শ্রীশ্রীমার দয়ার কাহিনী বলিয়া শেষ করিতে পারেন, এমন শক্তিমান কেহ সংসারে আছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আর মাতৃভাবে ভাবিতা, করুণায় গঠিতা, মানবীরূপিণী ঈশানীর দয়ার সমগ্র ধারণা করিতে জীব কোনকালে সমর্থ হইতেও পারে না। তথাপি জীবনে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার ও তদীয় শ্রীপদাশ্রিত সন্তানগণের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের যে ক্ষুদ্র ধারণাটুকু জন্মিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তিও যে নাই। মাকে কষ্ট দিয়া, মার কাছেই সহস্র অপরাধ করিয়া, সেই কষ্টদানের, সেই অপরাধের বিনিময়ে যাহারা কেবল তাহার অহেতুক স্নেহ ও করুণাই প্রাপ্ত হইয়াছে,

ক্ষমারূপিণীর দয়ার মর্ম তাহারাই কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছে ও পারিবে। অন্যের কথা কি, মার অপরিসীম দয়া দেখিয়া স্বয়ং ঠাকুরও তাঁহাকে 'দয়াময়ী' বলিয়া গিয়াছেন। আর ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরাম বসু তাঁহার নাম দিয়াছিলেন, 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী।'

* * * *

যিনি জগতের ইষ্ট, তিনি যখন গুরু-মূর্তিতে জীবোদ্ধার-কার্যে প্রবৃত্ত হন, তখন বহু জীব হেলায় খেলায় ভব-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া যায়। তাহাদের কাছে ঈশ্বরদর্শন, আত্মোপলব্ধি আর অসম্ভাবনীয় কল্পনার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। শ্রীগুরুর অভয়পদে আশ্রয় লইয়া জীবের 'আমি মুক্ত' ইত্যাকার অভিমান সহজেই হৃদয় অধিকার করিয়া বসে; কাহারও উহা তৎক্ষণাৎ, কাহারও বা অল্পাধিক বিলম্বে সমুদিত হয়। কাহারও বা সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের রূপদর্শনাদি হইয়া ভাবতন্ময়তা কিংবা আত্মোপলব্ধির আভাস আসিয়া উপস্থিত হয়। যাঁহার হাতে মুক্তির চাবি, তিনি যে যাহাকে তাহাকে শ্রীপদে আশ্রয় দিয়া বলিবেন, 'এই তোমাদের শেষ জন্ম', তাহাতে আর আশ্চর্য কি? অনেক কামনা-বাসনা রহিয়াছে, সুতরাং এই জন্মেই মুক্তি কি করিয়া হইবে একথা বলিয়া কেহ আপত্তি উত্থাপন করিলে মা উত্তর দিয়াছেন, 'তা হোক, শেষকালে [অন্তিম মুহূর্তে] তা থাকবে না।' শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী প্রমুখ অনেক ভক্তকে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও মা বলিয়াছেন, 'এই তোমাদের শেষ জন্ম'; আর তাহারা সবিনয়ে নিজেদের মানসিক দৈন্য প্রকাশ করিলে উত্তর দিয়াছেন, 'ঠাকুর যখন আশ্রয় দিয়াছেন, তখন আর ভাবনা কি!' নিশিকান্ত মজুমদারকে বলিয়াছিলেন, 'কত জন্ম জন্মান্তর ঘুরে ঘুরে এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে এসে পৌঁছে গেছ।' সুরেনবাবুকে বলিয়াছিলেন, 'মুনিঋষিরা জন্মজন্ম তপস্যা ক'রে যা পায় নাই, তোমরা এবার অনায়াসে তা পাবে।'

'তখন আর ভাবনা নাই,' 'ঘরের ছেলে ঘরে আসিয়াছে' এবং 'অনায়াসে সব পাইবে' জানিয়াই শ্রীশ্রীমা কোন কোন সাধুকে এবং বহু গৃহস্থ-ভক্তকে বলিয়াছেন, 'কিছু ক'ত্তে হবে না, যা ক'রবার আমিই ক'রব।' কিন্তু তিনি 'কিছু কোরো না'—এইরূপ নিষেধাত্মক উক্তি কখনো করেন নাই। যাহা

নিজের এবং জগতের অশেষ কল্যাণের নিদান, এমন শ্রীভগবানের নাম-চিন্তা করিতে তিনি কখন নিষেধ করিতে পারেন না। বরং কেহ এই মুহূর্তেই চরম অবস্থার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে বলিয়াছেন, 'আমার যা ক'রে দেবার এক সময়ে [দীক্ষাদানকালে] ক'রে দিয়েচি; যদি সদ্য শান্তি চাও, সাধন-ভজন কর, তা না হ'লে দেহান্তে হবে।' কাহারও কাহারও মানসিক গঠন এবং শারীরিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই যে মা 'কিছু ক'ত্তে হবে না' বা ঐরূপ কিছু বলিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। যাহাদিগকে তিনি ঐরূপ বলিয়াছেন, তাহারাও যে যথাশক্তি জপধ্যান বা স্মরণমনন করিয়া থাকেন, ইহা আমরা জানি। আর জগদ্গুরুর স্বেচ্ছায় এই বকলমা-গ্রহণ ভালবাসায় ও কৃতজ্ঞতায় অন্তর পরিপূর্ণ রাখিয়া তাহাদিগকে আপনা হইতে যে ইষ্টচিন্তা করাইয়া নিতেছে, সেই পরোক্ষ সাধনার মর্মই বা কয়জন বুঝে!

বিভিন্ন শিষ্যের শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া শ্রীশ্রীমা যে কত বিভিন্নপ্রকার বিধান দিতেন, নিম্নোক্ত উদাহরণগুলিতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। স্বামী প্রেমেশানন্দ এক সময়ে হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতার জন্য ইচ্ছানুরূপ সাধন-ভজন করিতে পারিতেন না। মাকে সে কথা নিবেদন করিলে মা উত্তর দেন, 'যদি মা ব'লেই বিশ্বাস থাকে, তবে আর ওসবের দরকার কি।' শচীবালা সরকার বলিয়াছিলেন, 'মা, সংসারে আমাদের অনেক কাজ করতে হয়; জপতপ করবার সময় নাই—কিছুই হয়ে উঠে না।' তাহাতে মা বলেন, 'আমাদের যা কিছু, তোমরাই তার মালিক: তোমাদের কিছুই ক'ত্তে হবে না।' শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত বলিয়াছিলেন, 'মা, কিছু তো করতে পারি না।' মা উত্তর দেন, 'তুমি কি ক'রবে? তুমি কি ক'ত্তে পার? তোমার জন্যে আমিই ক'চ্চি।' শ্রীগোকুলদাস দেকে মা বলিয়াছেন, 'ঠাকুরের উপর নির্ভর কর, তিনি সব ক'রে দেবেন।' শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকারকে বলিয়াছেন, 'যদি কিছু নাও কর, তিনি ক'রিয়ে নিতে ছাড়বেন না।' শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দত্ত বলেন: "দীক্ষার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা, কতবার জপ করব?' মা বলিলেন, 'তোমরা সংসারী, তোমরা বেশী জপ ক'ত্তে পারবে না, দ্বাদশবার জপ ক'ল্লেই তোমার হ'য়ে যাবে।' দীর্ঘকাল সান্নিপাতিক জ্বরে ভুগিয়া করে জপ করিবার প্রণালী

ভুলিয়া যাই। দাদা জয়রামবাটীতে ছিলেন, তাঁহাকে সে কথা লিখিয়া জানাইলাম। মা শুনিয়া বলিলেন, 'তাতে আর কি হবে?' 'তবে মা, মন্ত্রজপের কোন প্রয়োজন নাই?' 'ওসব মনের বিশ্বাসের জন্যে।'" শৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের হাতে বাত থাকায় তাঁহার দীক্ষার পর মা বলিলেন, 'তোমার তো বাবা করজপ হবে না, ২৫টা রুদ্রাক্ষ দিয়ে মালা ক'রে নিও, দিনে সেই মালা একবার ক'রে জপ ক'রবে আর ঠাকুরকে ভক্তি ক'রবে।' এই সকল ব্যক্তিগত বিধানের কথা ছাড়িয়া দিলে, সাধারণভাবে মা অধিকাংশ ভক্তকেই সকাল-সন্ধ্যায় অন্ততঃ ১০৮ বার করিয়া মন্ত্রজপ ও স্মরণমনন এবং অসমর্থপক্ষে কেবল স্মরণমনন বা প্রণামমাত্র করিতে বলিয়াছেন। আর যাহাদের অধিক করিবার শক্তি আছে বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহাদিগকে লক্ষ লক্ষ জপ করিতেও উৎসাহ দিয়াছেন। গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিলে প্রত্যবায় হয়; সেইজন্য মা ন্যূনপক্ষে যতটুকু করা সম্ভব তাহারই বিধান দিতেন। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্তকে মা করজপের প্রণালী দেখাইয়া দিয়া ১০৮ বার করিয়া জপ করিতে বলেন। রাজেনবাবু ইহা অতি সামান্য মনে করিয়া বলিলেন, 'মোটে ১০৮?' মা উত্তর দিলেন, 'হাঁ বাবা; আমার কাছে ওরকম বোলো না।'

দীক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীশ্রীমা শিষ্য-সন্তানের ইষ্ট-সাক্ষাৎকারের পথ মুক্ত করিয়া দিতেন, কিন্তু পূর্ণ ও অবাধ দর্শন প্রারব্ধক্ষয়ের অপেক্ষা রাখিত, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। নলিনবাবু একদিন মাকে বলেন 'এত সাধুসঙ্গ করচি, আপনার কাছেও আসচি, কিন্তু কিছুই উপলব্ধি করতে পারচি না কেন?' মা বলিলেন, 'মনে কর, তুমি খাটের উপর আমার এই ঘরে ঘুমিয়ে আছ, তোমাকে যদি ঘুমন্ত অবস্থায় খাটশুদ্ধ রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া যায়, তোমার ঘুম ভাঙ্গতেই কি মনে হবে?—মনে হবে, যেখানে ছিলুম, সেখানেই আছি। তারপরে যখন খেরে [সম্পূর্ণরূপে] ঘুম ভেঙ্গে যাবে, তখন দেখবে, কোথায় ছিলুম আর কোথায় এসেচি।'

কালীপদ রায় দীক্ষার পর শ্রীশ্রীমাকে বলেন, 'মা, আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না।' মা বলিলেন, 'এখন তো ছেলে হ'লে, আর কি।' সামান্য কথায় মা শিষ্যের মনে গুরুর সঙ্গে তাহার ভাব-সম্পর্ক

কিরূপ গভীরভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতেছেন, এখানে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

উমেশবাবুকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'তোমরা অত ভাব কেন? মনের বাসনা-কামনাগুলো মিটিয়ে ফেল; পরে তো ঠাকুরই আছেন।' উমেশবাবু তাঁহার নিজের কোষ্ঠীতে মৃত্যুকালীন যোগ বড়ই খারাপ বলিয়া উল্লেখ করিলে মা উত্তেজিতভাবে বলিলেন, 'রেখে দাও কোষ্ঠী।' তাহা ছাড়া, অনেক ভক্তকেই তিনি বলিয়াছেন, 'শেষে ঠাকুরকে আসতেই হবে তোমাদের নিতে।' সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি জীবের কাছে খুব বড় জিনিষ হইলেও ঐ মুক্তিদান ঈশ্বরের কাছে কঠিন কাজ নয়। একদিন ভক্তি ও মুক্তির প্রসঙ্গে মা তাঁহার ডান হাতখানা নাড়িয়া দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'মুক্তি তো যখন তখন দেওয়া যায়; কিন্তু ভক্তিটুকু ভগবান দিতে চান না। ভক্তি দিলেই যে ভক্তের কাছে বাঁধা পড়েন!'[৫]

শ্রীভগবানের জন্য যাহারা জন্মজন্ম তপস্যা করিয়া আসিয়াছেন, কিংবা শ্রীগুরুর অহেতুকী কৃপা তন্মুহূর্তে যাহাদের উপর উছলিয়া উঠিয়াছে, এমন ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী কেহ কেহ শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখোচ্চারিত মন্ত্র শ্রবণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুমূর্ত্তির স্থলে ইষ্টমূর্তি দর্শন করিয়া তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন। ক্বচিৎ কাহাকেও মা মন্ত্রদানের পূর্বেই তাহার ইষ্ট নির্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন, শুনা যায়। সু— বলেন: "দীক্ষার পূর্বদিন রাত্রে নিমতলার শ্মশানঘাটে বসিয়া অনেক চিন্তার পর সঙ্কল্প করিলাম, গঙ্গাস্নান করিয়া দীক্ষা লইতে যাইব। অসুখের জন্য আমি মোটেই স্নান করিতাম না। পরদিন সকালে মার বাড়ীতে যাইয়া কিন্তু সেকথা ভুলিয়া যাই। কলের জলে মাথা ধুইতে যাইতেছি, এমন সময় স্বামী সারদানন্দ বলিয়া উঠিলেন, 'ওরে আহাম্মক, গঙ্গায় না স্নান করার কথা ছিল?' হাসিতে হাসিতে তিনি জনৈক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে গঙ্গায় পাঠাইয়া দিলেন।

"দীক্ষার পূর্বে মনে হইয়াছিল, মা কি মন্ত্র দিবেন কে জানে! যে দেবতার

---

[৫] অক্ষয়কুমার সেনকে শ্রীশ্রীমা পত্রে লিখিয়াছিলেন: তুমি যে স্বপ্নের কথা লিখিয়াছ যে তিনি যেন কোথাও বদ্ধ আছেন, ভগবান ভক্তের নিকটই বদ্ধ থাকেন।

চিন্তা এতকাল করিয়া আসিয়াছি, সেই ঠাকুরের মন্ত্র দিবেন কি! দীক্ষার সময় আমাকে স্পর্শ করিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন, 'এই ত্যাখ।' বলিবামাত্র আমার চক্ষুর সম্মুখে ইষ্টমূর্তি জ্বলন্তভাবে আবির্ভূত হইলেন। মা বলিলেন, 'এই তোমার ইষ্ট, কেমন? এঁকেই তো বরাবর ধ্যান ক'রে এসেচ?' দীক্ষার পরে নেশার মত অবস্থা হইল। বসিয়াই আছি, ; পরে খাওয়ার সময় সারদানন্দ-মহারাজ আসিয়া চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া তুলিয়া নিলেন। বিকালবেলা মঠে গেলাম। আমাকে দেখিয়াই বাবুরাম-মহারাজ মহাপুরুষকে বলিলেন, 'তারকদা, দেখেচ, কি করে ছেলেটাকে খেয়ে দিয়েচে মা?' তারপরে হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মা—মা—মা—'।"

দীক্ষাগ্রহণের সময় ব্যতীত অন্য সময়েও কেহ কেহ শ্রীশ্রীমাকে নিজের ইষ্ট বা অন্যরূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। একটি বালক-ভক্তের দর্শনের বিবরণ যাহা আমরা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়াছি, তাহা এখানে সংক্ষেপে প্রদান করিলাম। শৈশবে মা-হারা বালক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি পড়িতে পড়িতে যেমন মার কথা জানিতে পারে, অমনি তাহার মনে হইতে থাকে যে, সে পুনরায় মা পাইয়াছে। তাহার গর্ভধারিণীর নামও ছিল সারদা। মার শেষ অসুখের সময় দর্শন করিতে যাইয়া সে তাঁহার আদরযত্ন লাভ করে এবং তাঁহার ইঙ্গিত-ক্রমে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁহার কাছেই থাকিতে পায়। এই সময়ে মার কাছে যোগীন-মাও উপবিষ্ট ছিলেন। মার চরণস্পর্শ করিয়া ছেলেটির একরূপ আবেশের মত অবস্থা হয় ; এবং 'গুরু ইষ্ট অভেদ', 'ঠাকুর মাকে জগদম্বারূপে পূজা করিয়াছিলেন, অতএব ইনিই মা-কালী', 'যিনি রাধা তিনিই সারদা'—এই চারিটি চিন্তার পরপর উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে অর্ধশয়ানা মার মূর্তির স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্তি (বালকের ইষ্টদেবতা), ঠাকুর, মা-কালী এবং শ্রীরাধা-মূর্তি দর্শন করে। কালী-রূপ দর্শন করিবার সময় সে একপ্রকার ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং মা শ্রীহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করেন। সর্বশেষে রাধা-রূপ দর্শনের পর মা বলিয়াছিলেন, 'তুমি বৈষ্ণব-বংশে জন্মেচ,

সেই সুকৃতির ফলে এই দর্শন পেলে।[৬] যদি আর কখন এঁকে দর্শন কর, মা ব'লে ডেকো না।'[৭]

কলিকাতায় শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে জনৈক শিষ্য একদিন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া করজোড়ে সংসারাতীত আনন্দের জন্য প্রার্থনা করিলে মা বলিলেন, 'বাবা, সব হবে, সব পাবে; ব্যস্ত হ'য়ো না। দ্যাখ নি, সোল মাছের ছানা হ'লে যদি কেউ ঐ সোলটিকে নিয়ে যায়, ছানাগুলিকে আর আর মাছে নষ্ট করে?' শিষ্যটি কহিলেন, 'মা, তা তো বুঝি, পাঁচমিনিটের জন্য কি হয় না? তা হ'লেও তো বুঝতে পারি ব্যাপারখানা কি।' মা তাঁহার মাথার উপরে হাত রাখিয়া জপ করিয়া একদিকে চলিয়া গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সিদ্ধির নেশার মত একরূপ আবেশ উপস্থিত হইল। তিনি দোতলার বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলেন আর চারিদিকে কেবল মাকেই দেখিতে লাগিলেন—মা মা মা, সমস্ত জগৎ মা-ময় হইয়া গিয়াছে! মিনিট কয়েক পরেই সেই ঘোর কাটিয়া গেল। [উ]

শুদ্ধচিত্ত আধার শ্রীগুরুর দর্শন, স্পর্শ বা সান্নিধ্যমাত্র লাভ করিয়া উচ্চ তত্ত্ব উপলব্ধি করে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁহার নিজের ঐরূপ একটি উপলব্ধি সম্বন্ধে আমাদিগকে বলিয়াছেন: তখনও মাকে দেখি নি, দেখতে গিয়েচি: মা উপরে রয়েচেন, আমি নীচের তলায় বসে—আমার হৃৎপদ্ম ফুটে উঠল!

দেবস্বপ্নে, ধ্যানে বা ভাবতন্ময় অবস্থায়, যে-কোন প্রকারেই হউক,

[৬] ঠাকুর গাহিতেন, রাধার দেখা কি পায় সকলে, রাধার প্রেম কি পায় সকলে, গো—সে যে সুদুর্লভ ধন!'

[৭] শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যবশতঃ অপূর্ব দর্শন লাভের আরও কতিপয় ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি। ১। কুসুমকুমারী দেবীর উক্তি: সন্ধ্যার পরে অশ্বত্থমূলে শ্রীশ্রীমার কাছে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম, একটি আশ্চর্য দর্শন উপস্থিত হইল। দেখিলাম মা যেন জ্যোতির ভিতর বসিয়া—দিগম্বরী। পোকার মত ছোট ছোট মানুষ প্রসব করিতেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে খাইয়া ফেলিতেছেন! দেখিয়া ভয় হইল। চাহিয়া দেখিলাম মা ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানভঙ্গের পর আমার দর্শনের কথা শুনিয়া মা বলিলেন, ঠাকুর তোমাকে প্রকৃতি দর্শন করিয়েচেন।'

জীবনে দুইএক বার ইষ্টরূপ দর্শন করিতে পারিলেই যে সাধক চিরকালের জন্য কৃতকৃত্য হইয়া গেল, কিংবা স্বভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া তাহার চিত্ত বাহ্য রূপরসাদি হইতে চিরবিমুখ হইয়া পড়িল, তাহা নহে। বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। যতদিন না পূর্ণ বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিয়া ইষ্টের অবাধ অথবা ইচ্ছামাত্র দর্শন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, ততদিন

২। নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উক্তি : দ্বিতীয়বার যখন শ্রীশ্রীমার কাছে যাই, স্ত্রীকে দীক্ষার জন্য সঙ্গে লইয়া গেলাম। দীক্ষার পর সে নেচে-কোলে, আর আমি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া, মাকে দর্শন করিতেছি—দেখিলাম মা এলোকেশী, উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী মূর্তি, ত্রিনয়না—ভ্রূমধ্যের ঊর্ধ্ব ভাগে লম্বা তৃতীয় চক্ষু। নীচে আসিয়া মনে সন্দেহ হইল : ভাবিলাম, যাহা দেখিয়াছি তাহা কি ধাঁধা? ঠিক এই সময়ে গোলাপমা আসিয়া হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'চল্, মাকে দেখে আস।' উপরে যাইয়া দেখি, যথাপূর্বং তথা পরং—মা ত্রিনয়না। তখনও দাঁড়াইয়া আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিতে আসিতে ফিরিয়া ফিরিয়া মার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, ত্রিনয়না মা অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া।

৩। শ্রীশচন্দ্র ঘটকের উক্তি : ৺কাশীতে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া ফিরিতেছি, দেখিলাম তিনি একপাশ হইতে বামচক্ষু দিয়া আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। চক্ষুটি নাসিকা হইতে কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত ও অতিশয় উজ্জ্বল। চক্ষুর ভ্রম মনে করিয়া হাত দিয়া চক্ষু রগড়াইয়া চাহিয়া একইরূপ দেখিলাম। দুইতিন বার দেখিয়াও কোনও পরিবর্তন দেখিতে পাইলাম না।

৪। স্বামী মহাদেবানন্দের উক্তি : কাশীতে একদিন বিকালবেলা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমাকে শ্রীশ্রীমার কাছে পাঠাইলেন কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য। আমার মনটা সেদিন ভাল ছিল না, মহারাজ আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই যাইতেছি, নতুবা যাওয়ার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। 'লক্ষ্মী-নিবাসে' দোতলার সিঁড়ির উপর উঠিয়া দেখি, আটদশ জন স্ত্রীলোক একসঙ্গে বসিয়া আছেন। মার গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, কিন্তু সেদিকে চাহিয়া দেখি, সকলেই মার মূর্তি। ভাবিতে লাগিলাম, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজের কথাগুলি বলি—ইহাদের মধ্যে প্রকৃত মা কে? অধিক সময় দাঁড়াইয়া থাকিলে ইঁহারাই বা কি মনে করিবেন? দুইতিন মিনিট এভাবে কাটিয়া গেল। তখন মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম 'মা, মহারাজ আপনাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেছেন।' যখন মা উত্তর দিলেন তখন দেখিলাম, স্ত্রীলোকদের মধ্যস্থল হইতে মা কথা কহিতেছেন, তাঁহাদেরও আর মার মত রূপ নাই।

উহা হয় না। যাহা হউক, ঐরূপ দর্শনের মহৎ ফলও অস্বীকার করা চলে না। কিছুদিন যাবৎ ঘনঘন ইষ্টরূপ দর্শন ও তজ্জনিত আনন্দ-প্রাপ্তির ফলে সহজেই চিত্তশুদ্ধি ঘটে—মন বিষয়বিমুখ হইয়া ঈশ্বরপরায়ণ হয়। গুরুকৃপায় মহাভাগ্যবান বিরল ভক্তের জীবনে ঐরূপ হইতে দেখা গিয়াছে।

রূপদর্শনাদি আবার সকল ধাতের সাধকের হয় না। কিন্তু ক্রমবর্ধমান বিবেক-বৈরাগ্য, কামকাঞ্চনে অনাসক্তি, চিত্তের সমতা ও প্রসন্নতা ঐরূপ সাধককে দিনদিন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষানুভূতির নিকটবর্তী করিতেছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কাহারও আবার প্রথমজীবনে দর্শনাদি, এমন কি ভাব-সমাধি পর্যন্ত হইয়া শেষজীবনে বিচারভাবের বা জ্ঞানভাবের প্রাবল্য ঘটিতে দেখা যায়। শ্রীশ্রীমার কৃপায় তাঁহার আশ্রিত সন্তানগণের মধ্যে এই সকল শ্রেণীর লোকের দর্শনই লেখকের ভাগ্যে অল্পবিস্তর ঘটিয়াছে।

সংসারে রাখিলেও শ্রীশ্রীমা তাঁহার কোন কোন গৃহী সন্তানকে অন্তর-সন্ন্যাস দিয়া গুপ্তযোগী করিয়াছেন। 'অন্তর-সন্ন্যাস—যেমন নারদের; ভিতরে গেরুয়া, বাহিরে সাধারণ মানুষের মতন।'—ইহা তাঁহার শ্রীমুখের কথা। বাহিরের ভেক সাধুত্বের অভিমান জাগ্রত রাখিয়া অনেকের পক্ষে উল্টা বন্ধনের কারণ হয় বলিয়া মা বাহ্য-সন্ন্যাস অপেক্ষা এই অন্তর-সন্ন্যাসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অল্পবয়সে,যতদিন ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রবল থাকে ততদিন পর্যন্ত,মা বাহ্য-সন্ন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। একজনকে বলিয়াছিলেন, 'গেরুয়া প'রে কখন মেয়েমানুষের পাল্লায় প'ড়ো না; নেড়ানেড়ীর দল করার চেয়ে বিয়ে করা ভাল।' [আ] ক্বচিৎ এমন কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে,—'কলিতে অনেক লোক সন্ন্যাসী হইবে,নাচিয়া গাহিয়া তারা নরকে যাইবে।'

শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্রদীক্ষিত অনেকে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের কাছে বিরজা-হোম করিয়া আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতের সাধুগণের নিকট গুরু-পরিচয় দিবার প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মন্ত্রগুরু বা সন্ন্যাস-গুরুর নামে পরিচয় দিবেন, স্থির করিতে অসমর্থ হন। পরে তাঁহারা মার কাছে উপস্থিত হইয়া ঐবিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিয়াছিলেন, 'মন্ত্রদাতা গুরুই গুরু। ঐ মন্ত্র

থেকেই কালে জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস—সব।' মার সুস্পষ্ট উক্তি হইতে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, তান্ত্রিক সন্ন্যাস বা পূর্ণাভিষেক ও বৈদিক সন্ন্যাসের গুরু, মন্ত্রদাতা গুরু হইতে অভিন্ন ব্যক্তি না হইলে, উপগুরু মাত্র। ইহাও বলা প্রয়োজন যে, দুই গুরুর কাছে ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিতে মা নিষেধ করিয়াছেন।

প্রার্থিত হইয়া শ্রীশ্রীমা যে-সকল শিষ্য-সন্তানকে স্বহস্তে ত্যাগের চিহ্ন গৈরিক দান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে অপরের কাছে বিরজাহোম করিতে নিষেধ না করিলেও ঐরূপ অনুষ্ঠানের আত্যন্তিক প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই। স্বামী কৈবল্যানন্দ মার নিকট হইতে গেরুয়া কাপড় ও সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। পরে কেহ কেহ তাঁহাকে মঠে বিরজা-হোম করিতে বলিলেও তাঁহার মন তাহাতে সায় দেয় নাই। মার মতামত জানিবার অভিপ্রায়ে তিনি সকল কথা মাকে লিখিয়া জানাইলে মা উত্তরে লিখিয়াছিলেন : তোমাকে আমি যাহা কিছু প্রয়োজন সবই দিয়াছি। তবে যখন উঁহারা বিরজা-হোম করিতে বলিতেছে, লোকে তীর্থ-ব্রতাদি যেভাবে করিয়া থাকে, সেইভাবে করিবে।

শ্রীশ্রীমা বহু সন্তানকে তদীয় গুরু-শক্তির অভয় অঙ্কে স্থান দিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে সাধন-পথে বিশেষভাবে অগ্রসর কেহ কেহ ভাব-সমাধিমান বা অদ্বৈত-বিজ্ঞানে অল্পবিস্তর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, শিষ্য-সংখ্যার অনুপাতে তাহাদিগকে খুব বেশী বলিতে পারা যায় না। 'ঠাকুরের কাছে যারা যেত, তাদের কত ভাব, সমাধি এসব হত ; আপনি তো আমাদের সেরকমটি করচেন না!'—কোন ভক্তের মুখে একথা শুনিয়া মা উত্তর দেন, 'ঠাকুর করেছিলেন, সে আর কটির ? (হাতে গণিবার মত করিয়া দেখাইয়া) হাতে গনা যায়। তাতেই তাঁর শরীর এত শীঘ্রি গেল। আমি যদি অমনটি করি, তবে ক'দিন এ শরীর থাকবে ? আমায় কত ছেলেকে দেখতে হ'চ্চে।' [সু] যাহা হউক, মার আশ্রয়প্রাপ্ত বহু ভক্তের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ লাভ করিয়া আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাহারা সকলেই পরকাল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ; এবং এক অচল অটল বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব তাহাদের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

আর একটিমাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছি। 'এই এই কথা মাকে জিজ্ঞাসা করিব', পূর্ব হইতেই এইরূপ মতলব আঁটিয়া এবং বারবার প্রশ্নগুলি মনে মনে তোলাপাড়া করিয়া লইয়া অনেকে শ্রীশ্রীমার কাছে আগমন করিতেন। কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিবার পর আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না; অন্তর ভরপূর হইয়া জিজ্ঞাসা-রূপ মনস্তরঙ্গ লুপ্ত হইত। স্বামী মহেশ্বরানন্দ বলেন, 'দুই মাস যাবৎ মার কাছে আছি; রোজই মনে করিয়াছি, আজ এই এই কথা মাকে জিজ্ঞাসা করিব; কিন্তু যেই মাকে দেখা, অমনি যেন সমস্ত মীমাংসিত হইয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে সব জিজ্ঞাসারও অবসান হইল। এভাবে কোনদিন একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।' মাকে দর্শন করিয়া প্রত্যেক-বারই জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তি ঘটিলেও, তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসার কিছুদিন পরে আবার সেই সকল প্রশ্ন মনে জাগে দেখিয়া, উমেশবাবু একবার দেশ হইতে রওনা হওয়ার পূর্বেই একখানি খাতায় প্রশ্নগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন এবং কলিকাতায় মার কাছে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সম্মুখে খাতাখানি খুলিয়া পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন! হাসিতে হাসিতে মাও সেই সকল কথার যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

তীর্থ-দর্শন

ইতঃপূর্বে শ্রীশ্রীমার দুইবার পশ্চিমাঞ্চলে কাশী-বৃন্দাবনাদি তীর্থে এবং দুইবার দক্ষিণে পুরীধামে গমনের বিষয় বলা হইয়াছে। ইহার পর একবার মা দক্ষিণাঞ্চলে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ফিরিবার প্রায় দেড় বৎসর পরে তৃতীয়বার কাশীধামে গিয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে মুখ্যতঃ ঐ দুইটি ভ্রমণের বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

রণজিৎ রায়ের দীঘি আরামবাগের দেড় ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে ডিহিবায়ড়া গ্রামে অবস্থিত। ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবতী রণজিৎ

রায়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বালিকা-বয়সে এই দীঘিতেই অন্তর্হিত হন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এক বৎসর বারুণী উপলক্ষ্যে যাইয়া শ্রীশ্রীমা এই দীঘিতে স্নান ও বিক্রমপুরে ৺বিশালাক্ষী দর্শন করিয়াছিলেন। বিক্রমপুর আরামবাগ ও ডিহিবায়ড়ার মধ্যপথে অবস্থিত।

একবার বর্ধমান হইয়া কলিকাতা আসিবার পথে শ্রীশ্রীমা স্বামি-শিষ্য-সংবাদ-প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর বর্ধমানের বাসায় দুইতিন দিন বাস করিয়াছিলেন এবং ৺সর্বমঙ্গলা, অষ্টোত্তরশত শিবমন্দির ও দক্ষিণ মশানের কালী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। দক্ষিণ মশানে কালীমূর্তির বিপরীত দিকে অবস্থিত ভৈরবের মূর্তির মা প্রশংসা করেন।

বিষ্ণুপুর কামারপুকুর হইতে প্রায় ১৭ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। বিষ্ণুপুরের পরমভাগবত রাজগণ কর্তৃক সংস্থাপিত বহু দেবালয় সংস্কারাভাবে বিগত-শ্রী হইয়াও অদ্যাপি বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। একবার বিষ্ণুপুর হইয়া যাইবার সময় শ্রীশ্রীমা এখানকার লালবাঁধের ধারে সর্বমঙ্গলার মন্দিরপ্রাঙ্গণে বসিয়া বলিয়াছিলেন: 'ঠাকুরের কথা তো আজ সত্যি হ'ল'। তিনি ব'লেছিলেন, 'ওগো, বিষ্টুপুর গুপ্ত-বৃন্দাবন, তুমি দেখো।' আমি ব'ল্লুম, 'আমি মেয়েমানুষ, কি ক'রে দেখব?' তিনি ব'ল্লেন, 'না গো, দেখবে, দেখবে।' [বি][১]

স্বামী শৈলানন্দের কাছে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন যে তিনি দুইবার তাঁহার মাসীবাড়ীতে গিয়াছেন ও দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে বগড়ী-কৃষ্ণনগরের

---

[১] বিষ্ণুপুরে পোকাবাঁধ, লালবাঁধ কৃষ্ণবাঁধ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ দীর্ঘিকাসকল বর্তমান। প্রথম প্রথম বিষ্ণুপুর হইয়া গমনাগমন কালে শ্রীশ্রীমা সাধারণতঃ পোকাবাঁধ কিংবা কৃষ্ণবাঁধের ধারে বিশ্রাম করিতেন। পরে ওখানকার শ্রীসুরেশ্বর সেনের বাড়ী মা ও তাঁহার ভক্তগণের বিশ্রাম-স্থলে পরিণত হয়। স্বামী সদানন্দ ১৩১৫ সালের চৈত্রমাসে বিষ্ণুপুরে যাইয়া প্রায় দুইমাস বাস করেন। তাঁহার সঙ্গগুণে সুরেশ্বরবাবু ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলে ঠাকুরের ভক্ত হইয়াছিলেন। ১৩১৮ সাল হইতে বিষ্ণুপুর হইয়া যাতায়াত-কালে মা ইঁহাদের গড়দরজার বাড়ীতে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিতেন। কয়েকবার দুইতিন দিন বাসও করিয়াছেন।

কৃষ্ণরায়জীউকে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মাসীবাড়ী বগড়ী-কৃষ্ণনগর হইতে একক্রোশ ব্যবধানে—পিয়াশালা গ্রামে।

এক বৎসর রথযাত্রার সময় শ্রীশ্রীমা গণেন্দ্রনাথের সঙ্গে মোটরগাড়ীতে কলিকাতা হইতে মাহেশে গমন করেন; এবং প্রায় সমস্ত দিন তথায় থাকিয়া, প্রসাদ-গ্রহণ করিয়া ও রথরজ্জু ধরিয়া টানিয়া সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ঐদিন রাধু ও নিতাইবাবুর মা মার সঙ্গে মোটরগাড়ীতে এবং যোগীন-মা প্রভৃতি স্ত্রী-ভক্তগণ নৌকাযোগে মাহেশে গিয়াছিলেন।

গিরিজা গুপ্তাকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন ঃ কালীঘাটের মা বড় প্রত্যক্ষ দেবী। একদিন আমি দর্শন ক'ত্তে গিয়েচি, অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম ক'রে প্রসাদী সিন্দূর নিয়ে এলুম। বাইরে এসে ভাবলুম, এখানে সধবা মেয়ে অনেক আছে তাদের প্রসাদী সিন্দূর একটু একটু দিয়ে দি। সামনে অল্প ঘোমটা দিয়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার কপালের মাঝখানে সিন্দূর দিতেই মেয়েটি শিউরে উঠল' ও মাথা সরিয়ে নিল। সে ব্যথা পেয়েচে মনে ক'রে ব'ল্লুম, 'একি মা, এমন ক'চ্চ কেন? কপালে লেগেচে?' মেয়েটি খানিক চুপ ক'রে থেকে আমার দিকে বড় বড় চোখ ক'রে চাইলে। তখন দেখতে পেলুম, তার কপালে আর একটি চোখ, তাতে সিন্দূর লেগেচে। 'আহা, মা কি দেখালে!'—এই ব'লতে ব'লতে আমার চোখ বুজে এল। তার পরেই চেয়ে আর মেয়েটিকে দেখতে পেলুম না।

* * * *

ভক্ত-পরিবারের আমন্ত্রণে, ১৩১৭ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া শ্রীশ্রীমা পরদিন[১] ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরাম বসু মহাশয়ের উড়িষ্যার জমিদারী কোঠারে পদার্পণ করেন। তথায় তিনি ৺সরস্বতী-পূজা পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক দুইমাস বাস করিয়াছিলেন। ঐ পূজা উপলক্ষ্যে প্রতিমার সম্মুখে উৎকলদেশীয় যাত্রাগান হয় এবং সেই যাত্রায় দুইটি বালক

১ তারিখটি স্বামী প্রেমানন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীতুলসীরাম ঘোষ মহাশয় কোঠারের জমিদারী সেরেস্তা হইতে উদ্ধার করিয়া লেখককে জানাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সাজিয়া অপূর্ব নৃত্যকলা প্রদর্শন করে। তাহা দেখিয়া মা এমনই মোহিত হইয়াছিলেন যে, পরদিন রাত্রেও সেই যাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল। মার আদেশে দ্বিতীয় দিন যথাবিধি পূজা করিয়া তৃতীয় দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। [আ]

কোঠারের তৎকালীন পোষ্ট-মাষ্টার দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অবস্থা-চক্রে পড়িয়া খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি তজ্জন্য অনুতপ্ত ও স্বধর্মে ফিরিয়া আসিতে আগ্রহান্বিত হইলে সেবকেরা মাকে সকল কথা নিবেদন করেন। মার অনুমতি-ক্রমে দেবেনবাবু সরস্বতীপূজার পূর্বদিন বলরামবাবুদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাশ্যামচাঁদজীউর মন্দিরের সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কৃষ্ণলাল-মহারাজের হস্ত হইতে গায়ত্রী সহ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন। মুণ্ডিতমস্তকে, যজ্ঞোপবীতস্কন্ধে আসিয়া প্রণাম করিতেই মা তাঁহাকে করযোড়ে প্রতিনমস্কার করিলেন এবং পরদিনই মন্ত্রদীক্ষিত করিয়া প্রসাদস্বরূপ নিজের একখানি কাপড়ও দিলেন। [আ]

৺সরস্বতী-পূজার পর শ্রীশ্রীমা ৺রামেশ্বর-দর্শন-মানসে যাত্রা করিলেন। এই ভ্রমণের সঙ্গী, তাঁহার অন্যতম সেবক আশুতোষ মিত্র লিখিতেছেন: "কোঠারে একদিন শ্রীশ্রীমার সঙ্গে তীর্থ-দর্শন বিষয়ে কথোপকথন-কালে দেখিলাম, তাঁহার তীর্থ করিবার অত্যন্ত ঝোঁক। রামেশ্বরে যাওয়ার কথা উত্থাপন করায় মা উৎসাহ-ভরে বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক ব'লেচ বাবা। আমার শ্বশুরও গিয়েছিলেন আর সেখান থেকে রাম-শিলা নিয়ে এসে-ছিলেন—এখনো কামারপুকুরে নিত্য পূজো হয়—দেখেচ তো? আমি যাব।' অতঃপর ঠিক হইল যে, স্বামী ধীরানন্দ, আত্মানন্দ, রাধুর মা[৩] ও রাধু, গোলাপ-মা, রামের মা, নিতাইয়ের মা ও আমি—সবশুদ্ধ আমরা আটজন মার সঙ্গে যাইব।[৪] বন্দোবস্তের জন্য মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণা-

---

৩ শ্রীশ্রীমা যখন কোঠারে আসেন, রাধুর মা তখন জয়রামবাটীতে। কোন বিশেষ ঘটনায় মা তাঁহাকে কলিকাতা হইতে দেশে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; রামেশ্বর গমনের প্রাক্কালে কোঠারে আনাইয়া লন।

৪ কাহারও কাহারও মতে 'কেদারের মা' নামে আর একজন স্ত্রী-ভক্তও শ্রীশ্রীমার

নন্দকে লেখা হইল এবং তথা হইতে উত্তর আসিলে আমরা মাঘের শেষে রওনা হইলাম। ভদ্রকে আসিয়া পুরুষদের জন্য মধ্যম শ্রেণীর ও স্ত্রীলোকদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া যথাসময়ে মাদ্রাজ-মেলে যাত্রা করিলাম। বলরামবাবুর উপযুক্ত পুত্র রামকৃষ্ণ বসু খুরদা-রোড পর্যন্ত আমাদিগকে পৌছাইয়া দিয়া পুরী চলিয়া গেলেন।

"খুরদা-রোড পার হইয়া অল্পদূর যাইতেই প্রসিদ্ধ চিল্‌কা-হ্রদ দৃষ্টিগোচর হইল। প্রাতঃকালের ফুরফুরে হাওয়ায় বক-পংক্তি রাত্রির অবসাদ ত্যাগ করিয়া, পাখা মেলিয়া গা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আহারান্বেষণে হ্রদকূলে বিচরণ করিতেছে; হয়তো আর এক পংক্তি অদূরস্থিত ক্ষুদ্র পর্বত হইতে উড়িয়া আসিতেছে; আবার নীলকণ্ঠাদি পক্ষিনিচয় নীলাকাশে উড্ডীয়মান হইতেছে—সে এক অপূর্ব দৃশ্য। মা বালিকার মত আনন্দ প্রকাশ করিয়া সকলকে ডাকিয়া ঐসকল দৃশ্য দেখাইতে লাগিলেন; নীলকণ্ঠ-পাখী দেখিয়া হাত-জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। গাড়ী হুড়হুড় শব্দে বেলা আন্দাজ আটটার সময় গঞ্জাম-জেলার বহরমপুর-ষ্টেশনে যাইয়া পৌছিল। স্বামী রামকৃষ্ণা-নন্দের বন্দোবস্তে এখানে কেলনার-কোম্পানীর বাঙ্গালী ম্যানেজার আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। আমরা সেইদিনের জন্য ইঁহার অতিথি হইলাম। অপরাহ্নে কদলী-নারিকেলাদি ফলের উপঢৌকন লইয়া কয়েকজন মাদ্রাজী ও গঞ্জামবাসী শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর দর্শনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"পরদিন প্রাতে পুনরায় মাদ্রাজ-মেলে রওনা হইলাম। পথিমধ্যে অপরাহ্নে প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যাবাস 'ওয়ালটেয়ার' পড়িল। অট্টালিকাসমূহ বক্ষে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ওয়ালটেয়ার-পর্বত গাড়ী হইতে একখানি ছবির

সঙ্গে রামেশ্বরে গিয়াছিলেন। স্বামী মহাদেবানন্দ বলেন: কেদারের মার তখন দীনহীন অবস্থা—একপ্রকার আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন বলিলেই হয়। সেইজন্য তাঁহার কথা মিত্র মহাশয়ের মনে না থাকারই সম্ভাবনা। কেদারের মার কাছে মীনাক্ষীদেবীর গল্প শুনিয়াছি; আরও শুনিয়াছি যে, রামেশ্বরের মন্দিরে শ্রীশ্রীমা শিবলিঙ্গ দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, 'আহা, যেমনকার তেমনটি আছে গো!' গোলাপ-মা 'কি বল্লে মা, কি বল্লে?'—প্রশ্ন করাতে মা সেই কথা চাপিয়া যান।

ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইল। এখানেও মা সানন্দে ছোট বালিকাটির মত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ত্যাখ ত্যাখ, যেন ছবির মতন বাড়ীগুলো পাহাড়ের গায়!' আমরা সেই দিন ও রাত্রি গাড়ীতে থাকিয়া পরদিন দ্বিপ্রহরে মাদ্রাজ পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে তিনখানি মোটরগাড়ী লইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও কতিপয় মাদ্রাজী ভক্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখানেই মা এই প্রথম মোটরগাড়ী চড়িলেন। আমরা ময়লাপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের সম্মুখে একখানি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম।

"মাদ্রাজে আমরা প্রায় একমাস রহিলাম। শ্রীশ্রীমাতৃদেবীকে দর্শন করিতে মাদ্রাজী ভক্তগণের অতিরিক্ত ভিড় হইতে লাগিল। নারীবিদ্যালয়ের মহিলারা ও বালিকারা আসিলেন: মহিলারা সুললিত-সুরে তামিল ভজন এবং বালিকারা বেহালা-বাদ্য শুনাইলেন। আমরা মাকে লইয়া সান্ধ্যসমীর সেবনের নিমিত্ত প্রায়ই সমুদ্র-তীরে যাইতাম; তথায় বসিবার ও পাদচারণ করিবার সুন্দর বন্দোবস্ত। একদিন প্রাচীন দুর্গটি দেখা হইল—ইহাই ভারতে ইংরাজের প্রথম দুর্গ। অন্যদিন সমুদ্র-তটে নবনির্মিত মৎস্যাগার দেখিলাম; বাড়ীটি তখনও সমাপ্ত হয় নাই, তথাপি তন্মধ্যে নানা বর্ণের ও নানা আকারের সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষিত হইয়াছে। অপর দুইদিন ট্রিপ্লিকেনে পার্থসারথির মন্দির ও ময়লাপুরে শিবমন্দির দর্শন করা হইল; মাদ্রাজে ঐ দুইটি মন্দিরই বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান মন্দির।

"মাদ্রাজে কতিপয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। 'অমৃতানন্দ' নামে তৎকালে মাদ্রাজের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-বাসী জনৈক আমেরিকান ব্রহ্মচারীও মার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বেই দেবস্বপ্নে ঠাকুর ও মার দর্শনাদি লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন।*

"নিতাইয়ের মার অসুখ হওয়ায় মাদ্রাজে বিলম্ব হয়। অবশেষে তাঁহাকে এখানে রাখিয়াই আমরা রামেশ্বরাভিমুখে রওনা হইলাম। স্বামী রামকৃষ্ণা-

* 'যখন কোঠারে আর মাদ্রাজে গেলুম, তখন যে আসে সে এসেই বলে স্বপ্ন আর স্বপ্ন!'—শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন। [উঃ

নন্দ ও ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল সঙ্গে চলিলেন; রামলাল-দাদা পরে মাদ্রাজে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। আমরা রাত্রে রওনা হইয়া পরদিন প্রত্যূষে মাদুরা পৌঁছিলাম এবং সেদিন তথায় পৌরপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি জনৈক মাদ্রাজী ভক্তের অতিথিস্বরূপ রহিলাম।

"মাদুরা বাইগাই নদীর তীরে অবস্থিত ভারতের একটি পুরাতন সহর। মাদুরার মন্দিরের ন্যায় সুন্দর, প্রাচীন ও প্রকাণ্ড মন্দির দক্ষিণ ভারতে আর নাই। মন্দির-মধ্যে সুন্দরেশ্বর-স্বামী বা 'সুন্দর' নামক শিবলিঙ্গ ও মীনাক্ষীদেবীর মূর্তি; মন্দিরপার্শ্বে প্রস্তর-নির্মিত 'শিবগঙ্গা' নামক সরোবর। আমরা অপরাহ্ণে মন্দির-দর্শনে বহির্গত হইলাম এবং ঐ সরোবরে স্নান করিয়া যথাবিধি দর্শনাদি করিলাম। এদেশের চলিত প্রথা অনুসারে স্ত্রীলোকেরা সন্ধ্যার সময়ে দীপ কিনিয়া শিবগঙ্গার তীরে নিজের নামে রাখিয়া যায়। মাও নিজের নামে দীপ-দান করিয়াছিলেন। মাদুরায় আমরা এই প্রথম নারিকেলতৈলের রান্না ও একটি নূতন জিনিষ—ভাতের পাঁপর খাইলাম।

"পরদিন দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণে পাম্বান-প্রণালী বা হরবলার খাড়ির তটে আসিলাম। এইস্থানে রেল শেষ হইয়াছে। ষ্টেশনটির নাম মণ্ডপম্। আমাদিগকে একখানি ক্ষুদ্র ষ্টীমার-যোগে দুইমাইল বিস্তৃত খাড়িটি পার হইয়া রামেশ্বর-দ্বীপে আসিতে হইল। এক্ষণে ঐ খাড়ির উপর রেল চলিতেছে, কিন্তু আমরা যখন যাই, তখন সেতুর স্তম্ভগুলির কিয়দংশ মাত্র নির্মিত হইয়াছিল। আমরা ষ্টীমার-যোগে রামেশ্বর-দ্বীপের যে স্থানটিতে আসিলাম, তাহাকে পাম্বান বা পবন-বন্দর বলে। আমরা ঐ বন্দর হইতে পুনরায় রেলযোগে রওনা হইয়া রামেশ্বর-ষ্টেশনে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় পৌঁছি এবং পাণ্ডা গঙ্গারাম পীতাম্বরের বন্দোবস্তে একখানি দ্বিতল বাড়ীতে গিয়া উঠি।

"রামেশ্বরের মন্দির প্রস্তর-নির্মিত, অতি প্রকাণ্ড এবং খোদিতকারুকার্য-পূর্ণ—দেখিতে অতি চমৎকার। মন্দিরের বাহিরে চারিদিকেই রাজপথ। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, পূর্বদিকের বারান্দা রাজগণ ও মন্ত্রিগণের প্রস্তরমূর্তিসমূহে পরিপূর্ণ। মন্দির-মধ্যে কয়েকটি মহল আছে; দুইতিন

মহল অতিক্রম করিয়া রামেশ্বরের মহলে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ মহলের প্রাঙ্গণে প্রায় একতলা সমান উচ্চ প্রস্তর-নির্মিত 'নন্দী'-বৃষ আছে, নিকটেই প্রায় তিনতলা সমান উচ্চ একটি স্তম্ভ প্রোথিত—প্রত্যহ উহার পূজা হইয়া থাকে। ঐ মহলের চতুর্দিকে বিশ্বনাথ, কেদারনাথ প্রভৃতির লিঙ্গমূর্তি পৃথক্ পৃথক্ বিরাজিত। পার্শ্বস্থিত ভিন্ন মহলে পার্বতী-দেবীর মূর্তি।

"রাত্রে আমরা ধূলা-পায়ে রাজপথ হইতেই রামেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বাসায় যাই। পরদিন প্রাতঃকালে সমুদ্র-স্নানান্তে অন্যান্য দেবদেবী-সকল দর্শন করিতে করিতে অবশেষে রামেশ্বরের স্থানে উপস্থিত হই। রামেশ্বরের বালুকাময় প্রস্তরের লিঙ্গমূর্তি কুণ্ড-মধ্যে অবস্থিত, অতি ক্ষুদ্র—কুণ্ডের উপর প্রায় অর্ধহস্ত-পরিমিত উচ্চ। উহা স্বর্ণমুকুটে আবৃত থাকে এবং ঐ মুকুটের উপরেই জল চড়ানো ও পূজাদি করা হয়। প্রাতঃকালে গঙ্গাজলে সর্বপ্রথম স্নান করাইবার সময় ঐ মুকুটাবরণ উন্মোচন করা হইলে প্রকৃত মূর্তির দর্শন লাভ ঘটে। কোন যাত্রী গঙ্গোত্রীর জল চড়াইতে চাহিলে এবং সেই উদ্দেশ্যে রামনাদের রাজার কাছারিতে ১৵০ জমা দিয়া অনুমতি-পত্র লইয়া আসিলে, মন্দিরের পূজারীগণ আবরণ উন্মোচন করিয়া সেই জল বাবার মাথায় ঢালিয়া দেন। বাবার নিত্যস্নান ও ভোগে গঙ্গাজল ব্যবহৃত হয়। প্রত্যহ ঐ জল সরবরাহের ব্যয়নির্বাহার্থে পুণ্যশ্লোকা রাণী অহল্যাবাই সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

"বাবার পূজারীরা দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, তাহাদের হাত দিয়াই বাবাকে পূজা দিতে হয়। বাবার গৃহে সব যাত্রী প্রবেশ করিতে পায় না, দক্ষিণী ব্রাহ্মণীরা পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া থাকেন কিন্তু আর্যাবর্তবাসী ব্রাহ্মণেরও প্রবেশাধিকার নাই! শিব-মন্দিরে ঐরূপ নিয়ম ভারতের অন্য কোথাও দেখা যায় না। তবে শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে ভিন্ন কথা। রামনাদের রাজার বন্দোবস্তে মার সঙ্গে আগত স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে বাবাকে গঙ্গোত্রীর জল ও বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিয়াছিলেন। পাণ্ডাদের নিকট পাঁচসিকা তোলা হিসাবে গঙ্গোত্রীর জল কিনিতে পাওয়া যায়।

"আমরা যথারীতি বাবার পূজা ও আরতি-দর্শন করিলাম। তৃতীয়দিন শ্রীশ্রীমা বিশেষভাবে বাবাকে পূজা দিলেন এবং পাণ্ডাদের পুঁথিতে লিখিত

রামেশ্বর-তীর্থের কাহিনী কথক-মুখে শ্রবণ করিয়া পাণ্ডা-ভোজন করাইলেন। প্রত্যেক পাণ্ডাকে একটি করিয়া জলের ঘটী দান করা হইল। হাতে সুপারি, পান ও পয়সা নিয়া পুরাণ-কথা শুনিতে এবং শ্রবণান্তে ঐসকল জিনিষ কথক-ঠাকুরকে দিয়া প্রণাম করিতে হয়। মা যথাবিধি কার্য করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার পুরীতে অবস্থান-কালেও মা কিছুদিন ধরিয়া পুরুষোত্তম-খণ্ড শ্রবণ করিয়াছিলেন ও শ্রবণ সম্পূর্ণ হইলে পাণ্ডা-ভোজন করাইয়াছিলেন।

"রামেশ্বরের মন্দির হইতে ১৪।১৫ মাইল দূরে, দ্বীপের শেষ সীমায় প্রসিদ্ধ ধনুস্তীর্থ বা ধনুষ্কোটি। ঐস্থান পর্যন্ত রেল গিয়াছে। ধনুষ্কোটিতে সোণা বা রূপার তীর-ধনুক দিয়া সমূদ্রের পূজা করিতে হয়। আমি ও কৃষ্ণলাল-মহারাজ তথায় গিয়াছিলাম. মা আমাদের হাতে রূপার তীর-ধনুক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"

রামেশ্বর-দর্শনের কথায় শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন : রামেশ্বরে গেছি ; শশী [স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] সব পূজোর ব্যবস্থা ক'রেচে—১০৮ সোনার বেলপাতা আমার জন্যে ক'রিয়ে রেখেচে। আমি সেই বেলপাতা দিয়ে পূজো ক'ল্লুম। রামনাদের রাজা তার ক'রেছিলেন, 'আমার গুরুর গুরু পরমগুরু যাচ্চেন,[১] সব ব্যবস্থা ক'রে দিও।' মণি-কোঠা খুলে দেখালে—সে কি দেখলুম! সামান্য আলো জ্বলচে, গোটা ঘরটা ঝক্‌ঝক্ ক'চ্চে! [বি]

রামেশ্বরে ত্রিরাত্র থাকিয়া শ্রীশ্রীমা প্রত্যাবর্তন আরম্ভ করেন এবং মাদুরায় একদিন মাত্র থাকিয়া, মাদ্রাজে পৌঁছিয়া তথায় কয়েকদিন বাস করেন। এই সময়ে মাদ্রাজ-মঠে ঠাকুরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালোর-মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্মলানন্দ আসিয়া মাকে তাঁহার মঠে লইয়া যাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে মা ১০ই চৈত্র বাঙ্গালোরে গমন করেন।[২] স্বামী আত্মানন্দ ব্যতীত দলের অন্যান্য সকলেই তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তথায় মা মঠের ভিতর বর্তমান ঠাকুর-ঘরে ত্রিরাত্র বাস

[১] রামনাদের রাজা শ্রীভাস্কর সেতুপতি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন।

[২] প্রথমতঃ বাঙ্গালোরের নারায়ণ আয়েঙ্গার প্রমুখ কতিপয় গৃহী ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে তথায় লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও

করেন। ঐ তিনদিন পুরুষ-ভক্তদের বাসের জন্য মাঠে তাঁবু খাটানো হইয়াছিল। নিত্য বহু লোক দলে দলে মাকে প্রণাম করিতে আসিত; তাঁহাদের আনীত ফুল একএক সময়ে স্তূপাকার হইয়া উঠিত। মঠের জমিতে চন্দনের গাছ ও একটী ক্ষুদ্র পাহাড় দেখিয়া মা আনন্দিত হন, এবং অনুরুদ্ধ হইয়া ঐ পাহাড়টির উপর প্রস্তরাসনে বসিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে জপ করেন।

বাঙ্গালোর হইতে শ্রীশ্রীমা পুনরায় মাদ্রাজে আসেন এবং তথায় দুইএক দিন থাকিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হন। রাস্তায় রাজমহেন্দ্রীতে তথাকার জজের অতিথি হইয়া তিনি একদিন বিশ্রাম ও গোদাবরীতে স্নান করেন। এই জজ একজন মাদ্রাজী ভক্ত—বৃদ্ধ ও পণ্ডিত লোক। তিনি স্বামী নির্মলানন্দের সঙ্গে সংস্কৃতে কথোপকথন করিয়াছিলেন।

রাজমহেন্দ্রী হইতে পুরীতে আসিয়া শ্রীশ্রীমা তথায় কয়েকদিন বাস করেন। এই সময়ে শ্রীব্রহ্মানন্দ-মহারাজ পুরীতে ছিলেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অটলবিহারী মৈত্র মাকে, মহারাজকে ও অন্যান্য সাধু ভক্তগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বাড়ীতে আনন্দোৎসব করেন। এই উৎসবে মা নিজে ঠাকুর-পূজা করিয়াছিলেন।[৮] অতঃপর পুরী হইতে যাত্রা করিয়া তিনি ২৮শে চৈত্র মঙ্গলবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। [দি] নির্মলানন্দ-মহারাজ বাঙ্গালোর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত বরাবর মার সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

না যাইতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া গেলে নির্মলানন্দজী নিজে আসেন। যতদূর স্মরণ হয়, বিভিন্ন সময়ে ঢাকা, বাঁচি ও চন্দ্রকোণার ভক্তেরা অনুরূপভাবে মাকে লইয়া যাওয়ার ব্যর্থচেষ্টা করেন। চন্দ্রকোণার নলিনবাবুকে মা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 'আমাকে কেউ কি নিয়ে যেতে পারে বাবা? নিয়ে যায় তো এক শরৎ।'

[৮] পুরীতে বেঙ্গল-নাগপুর-রেলওয়ের তৎকালীন ডাক্তার শ্রীরতিকান্ত মজুমদার বলেন: উৎসবের দিন আমি আমার বড় ছেলের সংবাদের জন্য টেলিগ্রাম করিয়া উত্তরের অপেক্ষায় ছিলাম। কয়েকদিন আগেই হাজারিবাগ হইতে তাহার আসিবার কথা ছিল। টেলিগ্রামের উত্তরে আরও উদ্বিগ্ন হইয়া প্রসাদ পাইতে গেলাম। সকলে আমার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ঘরের ভিতর জানালার কাছে দাঁড়াইয়া মা সকল কথা শুনিতেছিলেন বলিলেন, 'ছেলে ভাল আছে। ভয় নাই আজই ছেলের সংবাদ পাওয়া যাবে।' বাসায় ফিরিবার পথেই ছেলের কুশল সংবাদ পাইলাম।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিতেছেনঃ "শ্রীশ্রীমা দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগত হইলে বেলুড়-মঠে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। মার গাড়ী দৃষ্টি-পথারূঢ় হইলে নয়টি বোমা ছোঁড়া হয় এবং শতাধিক ভক্ত দুইসারি হইয়া 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে' ইত্যাদি স্তব সুর করিয়া গাহিতে আরম্ভ করেন। মা সেই দুই সারির মধ্য দিয়া স্ত্রী-ভক্তগণ সহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর এরূপভাবে আবৃত ছিল যে, মনে হইতেছিল যেন একটি বস্ত্রাচ্ছাদিত মূর্তিকে সচল করা হইয়াছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'খবরদার, মার চরণ এখন কেউ স্পর্শ করতে পারে না।' মহারাজের ভয়ে কেহই মার নিকটে যাইতে সাহস করে নাই। কিন্তু খোকা-মহারাজ [স্বামী সুবোধানন্দ] অতর্কিতভাবে তাঁহার পদস্পর্শ করিতেই মহারাজ 'ধর ধর' বলিয়া উঠিলেন। এদিকে খোকা-মহারাজ কোথায় যে উধাও হইলেন কেহই ঠিক করিতে পারিল না। সকলের মধ্যে হাসির রোল পড়িয়া গেল।

"শ্রীশ্রীমাকে স্ত্রী-ভক্তগণ সহ দোতলার একখানি ঘরে বসানো হইল। পুরুষদের বসিবার জন্য উঠানে সতরঞ্চ পাতা হইয়াছিল। মহারাজ উহার উপরে স্থাপিত একখানি বেঞ্চে বসিয়া কালীকীর্তনের দলকে কীর্তন আরম্ভ করিতে বলিলেন। তিনি একটি আলবোলা হুকায় ধূমপান করিতে করতে কীর্তন শুনিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে হুকার নলটি তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল, তিনি সমাধিস্থ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কীর্তন বন্ধ করা হইল, সকলে একদৃষ্টে সেই সমাধিমগ্ন মহাপুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে একঘণ্টা, দুইঘণ্টা অতিবাহিত হইল, তবুও তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল না। তখন মা জনৈক সাধুকে কি মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন। তিনি সেই মন্ত্র মহারাজের কানে বলিতে বলিতে সমাধির ঘোর অনেকটা কাটিয়া গেল। তিনি গায়ক-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হ্যাঁ—চলুক, চলুক!'—যেন অল্পক্ষণ মাত্র অন্যমনস্ক ছিলেন। সেই দিনের ঘটনা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, দেবমানব-লীলা দর্শনে তাঁহাদের জীবন সত্যই ধন্য হইয়াছে।

"তারপরে ঠাকুরের বাল্যভোগ হইল। শ্রীশ্রীমা উহা হইতে কিঞ্চিৎ

গ্রহণ করিয়া বাকী সমস্তই নীচে পাঠাইয়া দিলেন। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী সেই প্রসাদের থালা হাতে করিয়া নাচিতে লাগিলেন। ভক্তবর গিরিশচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; বলিলেন, 'ঠাকুরের প্রসাদ মার স্পর্শে মহাপ্রসাদ হয়েচে ; আমি থাকতে এ মহাপ্রসাদ আর কাউকে বিতরণ করতে দেব না।' তিনি কতিপয় ভক্তকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া থালাটি শরৎবাবুর হাতে ফিরাইয়া দিলেন। সন্ধ্যাবেলা মা যখন মঠ হইতে বিদায় লইলেন তাঁহার সম্মানার্থে পুনরায় নয়টি বোমা ছোড়া হইল—এইরূপে এই পুণ্য দিবসের অবসান হইল।"

কলিকাতা হইতে ১৩১৮ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ রওনা হইয়া শ্রীশ্রীমা ৫ই জয়রামবাটী পৌঁছেন। [দি] জয়রামবাটী পৌঁছিয়াই তিনি তাঁহার পালিতা কন্যা রাধারাণীর বিবাহ দিতে সচেষ্ট হন। তাঁহার আহ্বানে স্বামী সারদানন্দ যোগীন-মা, গোলাপ-মা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে গমন করিলেন। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে, তাজপুরের শ্রীমান্ মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাধারাণীর শুভ পরিণয়-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। জ্যেষ্ঠতাত প্রসন্নকুমার কন্যাসম্প্রদান করিলেন। তখন মন্মথের বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র এবং রাধু দ্বাদশ বৎসরে পড়িয়াছে।

বিবাহ-কালে রাধুর আপাদমস্তক অলঙ্কারে মোড়া ছিল। সুযোগ বুঝিয়া বরপক্ষীয়েরা সারদানন্দ-মহারাজের নিকট হইতে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য বহুগুণ অর্থ দাবী করিয়া আদায় করিয়াছিল। কেদারনাথ দত্ত তাহাতে আপত্তি ও বিরক্তি-প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে ডাকিয়া সরাইয়া লন।

বিবাহের পরদিন বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় সকলকেই ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করা হইল। অনিমন্ত্রিত গরীবদুঃখীরা আহারের পর যখন বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিল, শ্রীশ্রীমা পেছনের দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে খাওয়া দাওয়া কেমন হইল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া 'বর-কনে সুখে থাকুক' ইত্যাদি কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন একহাজার টাকা সমেত শ্রীশ্রীমার বড় কালো বাক্সটা রাধুর সঙ্গে তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে যায়। বাক্সটা মাই রাধুকে দিয়াছিলেন, টাকাটা যে আছে, খেয়াল করেন নাই। বর-কন্যা চলিয়া গেলে ঠাকুর

মাকে দেখা দিয়া বলিলেন, 'একহাজার টাকা রাধুর বাক্‌সে দিয়ে দিলে ?' মার কথায় বিভূতিবাবু তাজপুরে গিয়া টাকাটা লইয়া আসেন।

রাধুর বিবাহের কিছুকাল পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, 'মাষ্টার মশায় মর্টন ইন্‌ষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ, তাঁকে বল্লে তো তিনি সুপাত্র খুঁজে দেন।' তাহাতে মা উত্তর দেন, 'আপনা থেকে ছেলে জুটবে তো জুটুক—আমি কারুকে বন্ধনে ফেলবার জন্যে ব'লব, তা কখনো হবে না।'

* * * *

রাধুর বিবাহের কিছুদিন পরে কলিকাতায় মার বাড়ীতে, ১৩১৮ সালের ৪ঠা ভাদ্র, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ রামকৃষ্ণ-লোকে প্রয়াণ করেন। দীর্ঘকাল মাদ্রাজে ঠাকুরের ভাব প্রচার করিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ও তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। দেহ-রক্ষার কয়েকদিন পূর্বে তিনি শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে গণেন্দ্রনাথ মাকে আনিবার জন্য জয়রামবাটী যান ; কিন্তু মা আসিতে সম্মত হন নাই। শশি-মহারাজের মত ভক্তের মৃত্যু তিনি স্বচক্ষে দেখিতে পারিবেন না এবং তিনি আসিলে হয়তো রোগীকেই সরাইবার প্রয়োজন হইবে,ইত্যাদি কথা চিন্তা করিয়াই মা আসিতে চাহেন নাই। শশি-মহারাজ কিন্তু দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে দিব্যচক্ষে মাকে দর্শন করিয়া, উল্লাস-ভরে 'মা এসেচেন' ইত্যাদি কথা কহিয়া মহাসমাধিমগ্ন হন। তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদে মা কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন, 'শশীটি আমার চ'লে গেছে, আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে!' [বি] এই ঘটনার প্রায় তিনমাস পরে, ৮ই অগ্রহায়ণ মা কলিকাতায় আগমন করেন। [দি]

১৩১৯ সালে স্বামী প্রেমানন্দ বেলুড়-মঠে ৺দুর্গোৎসব করেন। শ্রীশ্রীমা দেবীর বোধনের দিন মঠে আসিয়া একাদশী পর্যন্ত ছয়দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। মঠের উত্তরদিকের বাগান-বাড়ীতে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল। বোধনের দিন মার গাড়ী আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া প্রেমানন্দ-মহারাজ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং মঠের প্রবেশ-দ্বারে কদলী-বৃক্ষ ও মঙ্গল-ঘট স্থাপিত হয় নাই দেখিয়া বলিলেন, 'এখনো কলাগাছ

মঙ্গল-ঘট রাখা হয়নি. মা আসবেন কি ?' দেবীর বোধন শেষ হইবামাত্র মাব গাড়ী আসিয়া মঠে পৌছিল ; গোলাপ-মা তাঁহাকে হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন এবং নামিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন, 'সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা-দুর্গাঠাকরুণ এলুম !' [সু] এইবারের পূজায় মহাষ্টমীর দিন রাত্রে 'জনা' নাটক ও ৺বিজয়ার রাত্রে 'রামাশ্বমেধ যজ্ঞ' যাত্রা অভিনীত হয়। মা দোতলায় বসিয়া দুইটি অভিনয়ই দেখিয়াছিলেন। [স][১]

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ-ভক্তগণ শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞান করিতেন এবং দুর্গাদেবীর অর্চনা প্রকারান্তরে তাঁহারই অর্চনা বলিয়া জানিতেন। সেইজন্য পূজার সময় তিনি উপস্থিত না থাকিলে, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে না পারিলে এবং তিনি যে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, কথায় ও কাজে ইহার প্রমাণ না পাইলে তাঁহারা পূজা নিষ্ফল জ্ঞান করিতেন। এক বৎসর মহাষ্টমীর দিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১০৮ পদ্মফুল দিয়া মাকে পূজা করিয়াছিলেন। ১৩১৯ সালের দুর্গাপূজা সম্বন্ধে লাবণ্যকুমার চক্রবর্তী লিখিয়াছেন : ষষ্ঠীর দিন মঠের ফটকে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া প্রেমানন্দ-স্বামী প্রমুখ রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ

---

[১] আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীশ্রীমা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে এই নাটকগুলির অভিনয় দেখার কথা জানা গিয়াছে : গিরিশচন্দ্রের দক্ষযজ্ঞ বিল্বমঙ্গল-ঠাকুর, জনা, পাণ্ডবগৌরব ও কালাপাহাড ; এবং অপরেশচন্দ্রের রামানুজ। দক্ষযজ্ঞ অভিনয় দর্শনে মা ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে একরাত্রে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ও জনা অভিনীত হয় কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সাহায্যার্থে ; গিরিশবাবু সাধক ও বিদূষকের ভূমিকা অভিনয় করেন। ঐ একই রঙ্গমঞ্চে পাণ্ডবগৌরব অভিনয়ে গিরিশবাবু কঞ্চুকী সাজিয়াছিলেন ; অভিনয়-শেষে মা গভীর সমাধিমগ্না হন। মনোমোহন রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধনের দিন কালাপাহাড অভিনীত হয় ; গিরিশবাবু তখন লোকান্তরিত। মিনার্ভায় রামানুজ নাটকের তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত শ্রীরামানুজের ভূমিকা অভিনয় করিয়া সেই বেশে সজ্জিতা তারাসুন্দরী প্রণাম করিতে আসিলে 'আয় মা, আয়' বলিয়া মা তাহাকে আদর করেন। স্বামী সারদানন্দের ১৩২৫ সালের ২২শে ভাদ্র তারিখের দিনলিপিতে লেখা আছে : H. M. to the theatre to witness 'Kumari'. [মাতাঠাকুরাণী 'কুমারী'-অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন।]

গাড়ী টানিয়া মঠ-প্রাঙ্গণে লইয়া আসিতেছেন। প্রেমানন্দ-স্বামী আনন্দে টলিতেছেন—চোখমুখ দিয়া যেন আনন্দ ঠিকরিয়া পড়িতেছে। মহানবমীর দিন দ্বিপ্রহরের পর গোলাপ-মা আসিয়া কহিলেন, 'শরৎ, মা-ঠাক্রুণ তোমাদের সেবায় খুব খুসী, তোমাদের তাঁর আশীর্বাদ জানাচ্চেন।' শরৎ-মহারাজ আনন্দ-গম্ভীর-কণ্ঠে 'বটে?' বলিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট বাবুরাম-মহারাজের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'বাবুরাম, শুনলে?' উভয়ে তখন আনন্দে কোলাকুলি।

১৩২৩ সালে পুনরায় ঘটা করিয়া মঠে দুর্গোৎসব হয়। সেবারের পূজায় স্বামী প্রণবানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী) পূজক ও স্বামী জগদানন্দ তন্ত্রধারক। প্রণবানন্দজী লিখিতেছেনঃ মহাসপ্তমীর দিন প্রত্যূষে চণ্ডীমণ্ডপে নবপত্রিকা-প্রবেশের পর শ্রীশ্রীমা ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া মঠে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন যোগীন-মা, গোলাপ-মা, সুধীরা দেবী প্রভৃতি। মঠের প্রবেশদ্বার হইতে চণ্ডীমণ্ডপ পর্যন্ত সমস্ত পথ পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত এবং প্রবেশদ্বারে পূর্ণকুম্ভ ও কদলীতরু সংস্থাপিত হইয়াছিল। বহু সাধু ও গৃহী ভক্তগণ সহ প্রেমানন্দ-স্বামিজী মাকে সাদরে আহ্বান করিয়া মঠের ভিতর লইয়া আসিলেন। ধূপধুনার গন্ধে, শঙ্খ-ঘণ্টা-ঢাক-ঢোল-সানাই-কাঁসরাদি বাদ্যধ্বনিতে ও 'মহামায়ী কি জয়' রবে গঙ্গাতীর মুখরিত হইয়া উঠিল। মা ঠাকুর-ঘরের সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হইলে শুকুল-মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দ) তাঁহাকে পঞ্চপ্রদীপে আরতি ও বাবুরাম-মহারাজ চামর-ব্যজন করিলেন। অল্পক্ষণ ঠাকুর-ঘরে থাকিয়া মা অতি ধীরে নীচে নামিলেন এবং চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া তাঁহারই জন্য পূর্ব হইতে রক্ষিত গালিচার আসনে উপবেশন করিলেন। আমার বয়স তখন অল্প, আনন্দে আত্মহারা হইয়া কি যে করিব স্থির করিতে পারিলাম না। অন্তর্যামিনী মাই যেন প্রাণে প্রাণে বলিয়া দিলেন যাহা করিতে হইবে, আর আমি যন্ত্রচালিতবৎ তাহাই করিতে বসিলাম। উৎকৃষ্ট জবা, গোলাপ, পদ্ম, অপরাজিতা ও বিল্বপত্র চন্দনম্রক্ষিত করিয়া চিন্ময়ীর পাদপদ্মে তিনবার অঞ্জলি দিলাম, এবং হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রেকাবীতে রক্ষিত ছোট একখানি নৈবেদ্য লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া রহিলাম। মা তখন অধ-

নিমীলিতনেত্রা, ভাবাবিষ্টা; আমারও কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। মা সেই নৈবেদ্য হইতে একটু চিনি গ্রহণ করিয়া নিজ মস্তকে স্পর্শ করাইয়া মুখে দিলেন। আমি প্রণত হইয়া শ্রীপাদপদ্ম অশ্রুসিক্ত করিলে তিনি তাঁহার কোমল বামহাত আমার মাথায় রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। সপ্তমীর পূজা সমাপ্ত হইলে শ্রীশ্রীমা স্ত্রী-ভক্তদিগকে সঙ্গে লইয়া আবার চণ্ডীমণ্ডপে আসেন ও অঞ্জলি দিবেন বলিয়া আমাকে মন্ত্র পড়াইতে আদেশ করেন। বেশ মনে আছে, তাঁহার কণ্ঠে চণ্ডীর এই শ্লোক সুমধুর ও সুস্পষ্ট-ভাবে উচ্চারিত হইতেছিল:

ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে॥

স্বামী স্ব-স্বরূপানন্দ বলেন: ১৩২৩ সালে মঠে পূজা দেখিতে যাই। শ্রীশ্রীমা সপ্তমীর দিন সকালে মঠে আসিয়া উত্তরপাশের বাগানবাড়ীতে বসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামী ধীরানন্দ আসিয়া বাবুরাম-মহারাজকে বলিলেন, 'মা বলচেন, রাধুর অসুখের জন্যে তাঁকে কলকাতা ফিরে যেতে হবে—থাকতে পারবেন না। আপনি গিয়ে একবার মাকে বলুন যাতে তিনি থাকেন।' বাবুরাম-মহারাজ শুনিয়াই হাত জোড় করিয়া বলিলেন, 'মহামায়াকে কে বাবা নিষেধ করতে যাবে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কি করবে? তাঁর যা ইচ্ছা তা তিনি করবেন।' পরে দেখা গেল, রাধু অনেকটা ভাল আছে—মারও যাওয়া হইল না। স্বামী গিরিজানন্দ লিখিতেছেন: সন্ধিপূজার পর পূজনীয় শরৎ-মহারাজ জনৈক ব্রহ্মচারীকে কহিলেন, 'এই গিনিটা মাকে দিয়ে প্রণাম করে আয়।' ব্রহ্মচারীটি মনে করিলেন, বোধ হয় মহারাজ গিনিটা ৺দুর্গা-প্রতিমার সম্মুখে দিতে বলিতেছেন। তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া মহারাজ পুনরায় কহিলেন, 'ও বাগানে মা আছেন, তাঁর পায় গিনিটা দিয়ে প্রণাম করে আয়। এখানে তো তাঁরই পূজা হল।'

* * * *

১৩১৯ সালের ১৯শে কার্তিক রওনা হইয়া শ্রীশ্রীমা পরদিন বেলা প্রায় একটার সময় কাশী পৌঁছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের সন্নিকটে নব-

নির্মিত 'লক্ষ্মী-নিবাসে' প্রায় আড়াই মাস অবস্থান করেন। মা বাস করিবেন বলিয়া গৃহস্বামীরা অল্পদিন পূর্বে তাড়াতাড়ি গৃহপ্রবেশ-কার্য সমাধা করিয়া রাখিয়াছিলেন। গোলাপ-মা, ভানুপিসী, কেদারের মা, নিকুঞ্জদেবী, মহামায়া মিত্র প্রভৃতি স্ত্রী-ভক্তগণ এবং মাষ্টার-মহাশয়, বিভূতিবাবু, সুধাংশুমোহন দত্ত, সুশান্ত কুমার ঘোষ প্রভৃতি পুরুষ-ভক্তগণ মার সঙ্গে কাশীতে গিয়াছিলেন। গণেন্দ্রনাথ মাকে কাশীতে পৌঁছাইয়া দিয়া, কয়েকদিন পরে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের ত্যাগী পার্ষদগণ পূর্ব হইতেই কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন।

কাশীর ডাক্তার পরমভক্ত শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমার বহু স্বজন সহ কাশী-যাত্রার সমুদয় ব্যয় একাকী বহন করেন। নিত্য প্রাতঃ-কালে গঙ্গাস্নান করিয়া হাতে এক ঠোঙ্গা মিষ্টি লইয়া তিনি মাকে প্রণাম করিতেন ও মা তাঁহাকে সকরুণ দৃষ্টিতে দেখিতেন।

ইতঃপূর্বে দুইবার কাশীতে গিয়া থাকিলেও শ্রীশ্রীমা তথায় দীর্ঘকাল বাস করিতে পারেন নাই। এইবারে কিছু অধিকদিন বাসেব সুযোগ পাইয়া তিনি কাশীখণ্ড শ্রবণ এবং বিশেষ বিশেষ মন্দির ও স্থানসমূহ দর্শন করেন। ভারতবিখ্যাত গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তী গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শনান্তে আসিয়া কয়েকদিন মাকে রামপ্রসাদী ও কাশীমাহাত্ম্য-সূচক গান শুনাইয়াছিলেন।

একদিন শ্রীশ্রীমা বাবু শম্ভুনাথের [১০] ঘোড়ার গাড়ীতে দুর্গাবাড়ী যান। যাইবার সময় বিভূতিবাবুকে বলিলেন: তুমি বাড়ীতে থাক। ঠাকুর আমাকে ব'লতেন, 'কত আর ঠাকুরদের সব প্রণাম ক'রবে? একটা

---

[১০] নৃপেনবাবুর পুত্র শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে শুনিয়াছি, বাবু শম্ভুনাথ তাঁহার পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন; নিজে সুলতানপুরে থাকিয়া ওকালতি করিলেও তাঁহার স্ত্রী ৺কাশীতে নারাঙ্গাবাদের বাড়ীতে থাকিয়া পূজার্চনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং নিজের গাড়ী মার ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন।

কলসীর ভিতর সব ঠাকুরকে প্'রে, সেই কলসীটাকে প্রণাম ক'ল্লেই সবাইকে প্রণাম করা হ'ল'।'

শ্রীশ্রীমা কাশীতে দুইজন সাধুকেও দর্শন করিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরে নবাগত এক নানকপন্থী সাধুকে টাকা দিয়া প্রণাম করিয়া মা তাঁহার পদ-ধূলি গ্রহণ করেন ; এবং ঠাকুরের অন্যতম গুরু তোতাপুরীর আখড়া-ভুক্ত নাগা-সন্ন্যাসী চামেলিপুরীকে দেখিয়া আসিয়া তাঁহার জন্য ফলমিষ্টি ও কম্বল পাঠাইয়া দেন।

একদিন শ্রীশ্রীমা উভয় আশ্রমের সাধুদের খাওয়াইয়া প্রত্যেককে একখানি করিয়া কাপড় দিয়াছিলেন। সেবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া তিনি সেই কর্ম-প্রতিষ্ঠান ও উহার স্থাপয়িতার প্রশংসা করেন এবং স্বয়ং উহার অর্থ-ভাণ্ডারে দশটাকা জমা দেন। একদিন মাকে সারনাথ দেখাইতে লইয়া যাওয়া হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণও সেইদিন সারনাথ দেখিতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় ব্রহ্মানন্দ-মহারাজ নিজে যে গাড়ীতে গিয়াছিলেন সেই গাড়ীতে আগে মাকে পাঠাইয়া দিয়া পরে মা যে গাড়ীতে গিয়াছিলেন সেই গাড়ীতে নিজে রওনা হন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে পেছনের গাড়ীর ঘোড়াটি হঠাৎ ক্ষেপিয়া পথভ্রষ্ট হয় ও গাড়ীখানি সবেগে অদূরবর্তী ধ্বংসস্তূপের গায়ে ধাক্কা খায়। আঘাত লাগিয়া মহারাজের কোমল শরীর স্থানে স্থানে ছড়িয়া রক্ত বাহির হইয়াছিল।[১১] মা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'এ বিপদ আমারই অদিষ্টে ছিল, রাখাল জোর ক'রে নিজের ঘাড়ে টেনে নিলে!'

নৃপেনবাবুর বন্দোবস্তে, বৃন্দাবন হইতে আগত একটি দল শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে তিনদিন রাসলীলা অভিনয় করে। অভিনয় দর্শনান্তে শ্রীশ্রীমা রাধাকৃষ্ণ-বেশী বালকদ্বয়কে টাকা দিয়া প্রণাম করেন ও

---

১১ গাড়ীতে ব্রহ্মানন্দ-মহারাজ ব্যতীত আরও দুইএক জন সাধু ছিলেন। আঘাত আসন্ন বুঝিয়া তিনি তাঁহাদিগকে 'মাথা বাঁচাও' বলিয়াই, নিজের মাথা দুইদিকে দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন এবং আঘাত লাগিবামাত্র ভাবের আবেগে গাহিয়াছিলেন : সুখের বাসনা কর আর কদিন। ছাড়ি অন্য বোল, কালী কালী বল, মানব-জীবন যদিন ॥

বলিয়াছিলেন, 'আসল নকল এক দেখলুম!' মা টাকা দিয়া প্রণাম করাতে উপস্থিত সাধুভক্তগণও যথাশক্তি প্রণামী দিয়াছিলেন।

অন্যান্য স্থানের মত কাশীতেও লোক শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া আসিত, কিন্তু সেখানে তিনি মন্ত্রদান করিতেন না। শ্রীমতী চারুবালা দেবী বলেন: কাশীতে একদিন একটি বাঙ্গালী মেয়েকে সঙ্গে করিয়া একজন মাড়োয়ারী স্ত্রীলোক আসিলেন। তিনি মাকে অনেক কথাই বলিলেন, কিন্তু মা তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারিলেন না। তখন বাঙ্গালী মেয়েটি বলিলেন, 'ওঁর পাঁচটি ছেলে, কিন্তু সংসারে মন বসে না। গোয়াল-ঘরে বসে গরুর সেবা আর ধ্যানপূজা করেন। ধ্যানের সময় 'সোঽহং' শব্দ শুনতে পান, কিন্তু শান্তি পান না। আপনার কাছে স্বপ্নে কি পেয়েচেন, তাই দীক্ষা নিতে এসেচেন।' মা শুনিয়া বলিলেন, 'ওর কুলকুণ্ডলিনী জেগেচে। এখন দীক্ষাটি হ'লেই হ'য়ে যাবে। কাশীতে তো আমি দীক্ষা দিই না, এখানে শিব-গুরু; জয়রামবাটী কি ক'লকাতা গেলে হবে।'[১২]

শ্রীশ্রীমা ২রা মাঘ কাশী হইতে রওনা হইয়া পরদিন কলিকাতা পৌঁছেন এবং তথায় একমাসের উপর থাকিয়া ১১ই ফাল্গুন দেশাভিমুখে যাত্রা করেন। মর্ত্য-লীলার অবশিষ্ট আট বৎসরাধিক কাল তিনি কখন দেশে, কখন বা কলিকাতায় নিজের বাড়ীতে বাস করিয়াছেন।

---

১২ শ্রীমতী অমিয়বালা ঘোষ মুজঃফরপুর হইতে আসিয়াছেন। তিনি ভোররাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন, 'বৌমা, তসরের কাপড়টা পর, আমি তোমাকে মন্ত্র দেব।' ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র তিনি উঠিয়া গিয়া পাশের ঘরে মাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইলে মা বলিলেন, 'না বৌমা, তোমাকে আমি ক'লকাতায় কি জয়রামবাটীতে মন্ত্র দেব; কাশীতে মন্ত্র দিলে সদ্যোমুক্ত হ'য়ে যাবে।' [বি]

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পারিবারিক চিত্রে : চরিত্র-মাধুর্য

সপ্তদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, শ্যামাসুন্দরীর পরলোকগমনের পর শ্রীশ্রীমাই সহোদরগণের সংসারে অভিভাবিকা হইযাছিলেন। বিষয়বিভাগ হইযা ভ্রাতৃগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইযা পড়িলে তিনি জ্যেষ্ঠ প্রসন্নকুমারের সংসারে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু অপর ভ্রাতৃগণের সঙ্গেও তাঁহার সম্পর্ক কিছুমাত্র শিথিল হইল না। তিনি কার্যতঃ সকলের হইযাই রহিলেন।

প্রসন্নকুমারের নলিনী ও সুশীলা (মাকু) নামে দুই কন্যা জন্মিবার পর অভযের রাধারাণী নামে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। রাধারাণীর জন্মের পর কালীকুমারের ভূদেব ও রাধারমণ নামে দুই পুত্র জাত হয। ইহারা সকলেই শ্রীশ্রীমার স্নেহযত্ন লাভের সুযোগ পাইযাছিল। প্রসন্নকুমারের কমলা নামে কন্যা এবং বরদাপ্রসাদের খুদিরাম ও বিজযকৃষ্ণ নামে পুত্রদ্বয মার আদরযত্ন লাভ করিলেও তখন তাহারা নিতান্ত শিশু।

রাধারাণীর বিবাহের পূর্বে নলিনী ও মাকুর বিবাহ হয়। নানা কারণে নলিনীর শ্বশুরগৃহে বাস সম্ভবপর হয় নাই এবং তাহার জননীর স্বর্গগমনের পর পিতা দ্বিতীযবার বিবাহ করায বিমাতার গৃহে বাসও কষ্টকর হইযা পড়ে। অগত্যা শ্রীশ্রীমা নলিনীকে নিজের কাছেই স্থানদান করেন। মাকুর অবস্থাও নলিনীর প্রায অনুরূপ, তাহাকেও মা অধিকাংশ সময নিজের কাছেই রাখিতেন। রাধারাণীর বিবাহ হইলেও মাকে ছাড়িয়া তাহার শ্বশুর-গৃহে গমন কদাচিৎ হইত[১] এবং পরবর্তীকালে তাহার স্বামীও অধিকাংশ সময মার কাছে থাকিতেন। বালক ভূদেব কখন কখন তাহার পিসীমাতার সঙ্গে থাকিত। সুতরাং মা যখন দেশ হইতে কলিকাতাদি স্থানে গমন করিতেন, তাঁহাকে এক বৃহৎ পরিবার সঙ্গে লইযা যাইতে হইত।

---

[১]জয়রামবাটী হইতে ১৩২২ সালের ১৩ই চৈত্র, ঘাবিন্দার শ্রীমতী নীরদবালা মজুমদারকে শ্রীশ্রীমা লিখিযাছেন, 'রাধু এখানে না থাকায় চিঠিপত্রের উত্তর দিবার সুবিধা

ক্রমশঃ আত্মীয়স্বজন ও ভক্ত-সংখ্যার বৃদ্ধিতে প্রসন্নকুমারের ক্ষুদ্রগৃহে বাস শ্রীশ্রীমার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিলে, স্বামী সারদানন্দ পুণ্যপুকুরের পশ্চিমতটবর্তী একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাতে নূতন বাড়ী নির্মাণ করাইয়া দেন এবং শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের অর্থ-সাহায্যে পুণ্য-পুকুরটিও বহু টাকায় ক্রয় করিয়া উহার পঙ্কোদ্ধারাদি সংস্কার করান। বাড়ীতে চারিখানি ঘর নির্মিত হয়। তন্মধ্যে পশ্চিমমুখী বাহিরের ঘরখানি ৺জগদ্ধাত্রী-পূজার ও ভক্তদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট থাকে এবং ভিতরের তিন-খানি ঘরের মধ্যে একখানি নলিনীর বাসের জন্য ও একখানি রন্ধনাদি-কার্যের জন্য নির্দিষ্ট হয়। এই নূতন বাড়ীতে মা ১৩২৩ সালের প্রারম্ভে প্রবেশ করিয়া প্রায় চারিবৎসর বাস করিয়াছিলেন। গৃহপ্রবেশ-কালে সারদানন্দ-মহারাজ ৺বৃন্দাবনে ছিলেন। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া জয়রামবাটী যাইলে বাড়ীর দলিল মা-জগদ্ধাত্রীর নামে রেজিষ্ট্রি করা হয়।

* * * *

রাধারাণীর যখন বিবাহ হয়, তখন সে বয়সে ও স্বভাবে নিতান্ত বালিকা। আজীবন তাহার এই স্বভাবটি অব্যাহত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার বালিকা-সুলভ চালচলন, ভবিষ্যতের চিন্তারাহিত্য এবং কথাবার্তায় ও আচরণে মনমুখের অভিন্নত্ব সকলকে মুগ্ধ করিত। এই রাধারাণী, ভ্রাতৃগণের পরিবার ও অন্যান্য সকলকে লইয়া শ্রীশ্রীমার জীবনের যে স্নেহ-মধুর, সহনশীলতাময় ও সহানুভূতিপূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছিল, কতিপয় ঘটনায় তাহারই একটি আংশিক চিত্র অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিব।

ইন্দুমতী দেবী বলেন ঃ "রাধু শ্রীশ্রীমাকে মাতৃ-সম্বোধন করিত এবং

হইয়া উঠে না।' স্বামী সারদানন্দের দিনলিপিতে ১৩২৫ সালের ১৮ই বৈশাখে লেখা আছে ঃ "Radharani came from Tajpur. Decided that Radhu will come to Calcutta with her husband in the month of Jaistha & not with H. M. [Holy Mother] at present." [রাধু মার অসুখের সময় কোয়ালপাড়া হইতে কিছুদিন পূর্বে তাজপুরে গিয়াছিল।]

তাহার গর্ভধারিণীকে 'নেড়ী-মা' বলিত। কখন কখন মা জিজ্ঞাসা করিতেন, 'রাধু, তুই সিঙ্গীর দুধ খেয়ে শিয়ালই রইলি? আমি যে তোকে এত ক'রে মানুষ ক'ল্লুম, আমার ভাব কিছু নিলি নি মা? তোর মায়ের ভাবই সব নিলি মা?' রাধু তাহাতে চুপ করিয়া থাকিত এবং মার উপর রাগ করিয়া মাথায় কাপড় ঢাকা দিয়া মুখ ফিরাইত। 'আমি না হ'লে তোর চলবেক নাই, আমাকে দেখে মাথায় কাপড় দিচ্ছ?'—বলিয়া মা হাসিতেন।

"আমার জ্যেষ্ঠপুত্র খুদিরাম—মা 'খুদি' না বলিয়া 'ফুদি' বলিতেন, কারণ, তাঁহার শ্বশুরের নামে নাম—ফল খাইতে ভালবাসিত। কলিকাতা হইতে মা তাহার জন্য পার্সেল করিয়াও কখন কখন ফল পাঠাইতেন। খাওয়ার শেষে দুধভাত মাখিয়া লইয়া তাহাকে স্মরণ করিতেন, এমন সময় খুদিও 'পিসীমা—'বলিয়া যাইয়া উপস্থিত হইত। মা বলিতেন, 'এস বাবা, আমি তোমাকেই ডাকছিলুম।' যদি কখন বলিতাম, 'আপনি ওকে ভাল-মন্দ এত ক'রে খাওয়াচ্ছেন, ও কি বরাবরই এমনি খেতে পাবে?—পাড়াগেঁয়ে ছেলে!' মা উত্তর দিতেন, 'তোরা বুঝিস নি গো, যে খায় চিনি, যোগায় তাকে চিন্তামণি।'

"কলিকাতা যাওয়ার সময় খুদি সঙ্গ নিল, কিছুতেই ছাড়িবে না। মা তাহাকে ভুলাইবার জন্য হাতে একটি সোনার আংটি দিলেন—ঐ আংটি শম্ভু রায়ের পরিবার মাকে দিয়াছিলেন—আর এক কুদো মিছরি দিয়া বলিলেন, 'যখনই আমার কথা মনে প'ড়বে, তখন এই মিছরি খাবে, তা হ'লেই আমাকে ভুলে যাবে!'

"খুদিকে যখন কলিকাতায় লইয়া গেলাম, মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা, তুমি কি মল লেবে?' খুদি বলিল, 'আমি দেতুবে [নেপুরে] মল লুব।' মা বলিলেন, 'বেশ তো বাবা, গোপালের পায়ে নূপুর আছে, তোমারও পায়ে নপুরে মল থাকবে।' মা গোলাপ-মাকে দিয়া মল গড়াইয়া দিলেন।

"একদিন খুদিকে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দিয়ে ভাত খেলে বাবা?' খুদি বলিল, 'আমার মা (দুইহাত বাড়াইয়া দেখাইয়া) এত বড় একটা মাগুর-মাছ কিনেচে।' 'কত বড় বাবা?' 'এত বড়।' তোমাকে দিয়েছিল?'

'একখানি মোটে দিয়েছিল পিসীমা, সবাইকে দিয়ে দিলে!' মা হাসিয়া বলিলেন, 'ইন্দু আসুক, তাকে ব'লচি আমি।' বিকালবেলা আমি যাইতেই মা বলিলেন, 'শুনেচিস? এত বড় মাগুর-মাছ কিনে রান্না ক'রেচিস; ফুদিকে মোটে একখানা দিয়েচিস,—আর দিস নি?' আমি বলিলাম, 'না, মাছ তো নেওয়া হয় নি।' মা হাসিয়া বলিলেন, 'ওলো, আমার মেজ ভাই উমেশ অমনি ব'লত'; সেকথাটি আজ ফুদি ব'ল্লে!'

"ভক্তেরা মার পাদপদ্ম ফুল দিয়া পূজা করিতেছে দেখিয়া খুদি মার পায়ের উপর একটা হাত রাখিয়া, অন্য হাতে মুঠা মুঠা ফুল লইয়া তাঁহার পায়ে দিতে লাগিল। 'বাবা, তোমরা যে আমার মুক্ত হ'য়ে এসেচ, তোমাদের ফুল দিতে হবে না'—এই বলিয়া মা তাহাকে নিজের কাছে নিলেন।

"যখন বিজয় হইল, তখন আমার কঠিন অসুখ। মা দেশড়াব যথার্থ ঘোষ, চন্দ্রকোণার নলিন সরকার, বাঁকুড়ার বৈকুণ্ঠ—তিনচারি জন ডাক্তার আনাইলেন। আমার অসুখে মা এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারও অসুখ হইল। অসুখ সারিয়া গেলে মা আমাকে বলিলেন, 'তোর যখন ছেলে হয়, তখন আমি বড় কষ্ট পাই—তোর যত না কষ্ট হয়, আমার তার চেয়ে বেশী যাতনা হয়। তুই যদি ম'রে যাস, আমাকেই তো দেখতে হবে! আমি তো ফেলতে পারব নি! আমি আশীর্বাদ করি, আর যেন না তোর ছেলে হয়।'

"বিজয় জন্মিয়া অবধি আমি অনেক কষ্ট পাই, তাই মা তাহার নাম রাখেন, 'দুঃখীরাম'। কলিকাতার যোগীন-মা ও গোলাপ-মা বলিলেন, 'আপনি যা নাম রাখবেন, তাই তো হবে? অমনিই তো কত দুঃখ পাচ্চে।' মা বলিলেন, 'তবে ওর নাম বিজয়কৃষ্ণ থাক্।'

"একদিন মা আমাকে বলিলেন, 'দ্যাখ্, তোরা ছেলেমানুষ, সব বিষয়ে খুব সাবধান হ'য়ে কাজ ক'রবি। আমার ঠাকুর হাত-পা-ওলা, যদি অসাবধান হ'স, তোদের অপরাধ হবে।'

"প্রথম প্রথম মা প্রত্যহ নিজে রান্না করিতেন। আমি ও নলিনী তখন ছোট, বেশ রান্না করিতে পারিতাম না। মা বলিতেন, 'আমার কাছে আয়,

রান্না শিখ্‌, আমি কি তোদের সংসারে বার মাস রান্না ক'ত্তে পারব ?' পরবর্তী কালে মা আমাকে বলিতেন, 'তুই বেঁধে এ বাড়ী আগে দিয়ে যাবি। ডুমুরের ডালনা তুই বড় ভাল বাঁধিস।' মা ডুমুরের ডালনা, আমরুল শাক, গিমে শাক, এইসব খাইতে ভালবাসিতেন।

"একবার বাগবাজারে আমার খুব পেটের অসুখ হইয়াছিল। মা বলিলেন,—ভ্যাখ্‌, তুই একটু ধ্যানজপ কর, তা হ'লে শরীরের ব্যাধি যাবে।"

শ্রীমতী সুবাসিনী দেবী বলেন ঃ "মনসা-পূজা উপলক্ষ্যে বলরাম বাড়ুজ্যের মা আমাদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন। রাত্রে কেহ রান্না করিতে চাহিল না—রাঁধুনী নলিনী পর্যন্ত। আমাদের নলিনী বলিল, 'একটিন মুড়ি হ'লেই সকলের হ'য়ে যাবে, একবেলা রান্না নাই বা হ'ল'।' আমি দুইসের চাউলের ভাত বসাইয়া দিলাম, সকলে বেশ খাইল। পরদিন তরকারী কুটিতে বসিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 'নলিনী, রান্তে বারণ ক'রেছিলি ; বৌ রাঁধলে—একটিন মুড়ি বেঁচে গেল। তা না হ'লে, কাল মুড়ি ভেজে গেছে, আজ আবার মৃগেন্দ্র বিশ্বাসের মাকে ডাকাতে হ'ত'। জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, যে বুঝে সেই শ্রেষ্ঠ।'

"একদিন বিকালে মার ঘর ঝল ঝাড়িয়া পরিষ্কার করা হইতেছিল। পুরাতন কাগজপত্রের সঙ্গে ৫০।৬০ টাকার একতাড়া নোট বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আমি ঐ নোট পাইয়াই আনিয়া মাকে দেই। তাহাতে মা আমাকে দাড়ি ধরিয়া চুমা খাইয়া বলিলেন, 'গৌরদাসী এইটি আমার [শিষ্য] ক'রে দিয়ে গিয়েছিল—গৌরদাসী সেয়ানা আছে কি-না! আমি মন্ত্র দিতে চাই নি—ঘরে মন্ত্র দেব নি—গৌরদাসী ব'ল্লে, তা হোক মা, একটি তোমার ব'লতে থাক্‌।[২] মায়ের পরিবারকে কাকেও তো বিশ্বাস নাই—একদিন স্নান ক'ত্তে গিয়েচি, ফিরে এসে দেখি, নলিনী বাক্সের চাবি খুলে দেখচে!'

"একবার মা ১০।১৫ দিন কামারপুকুরে ছিলেন। সেই সময়ে আমি

---

[২] আত্মীয়দের মধ্যে সুবাসিনী দেবী, সুশীলা, রাধারাণী ও তাহার স্বামী, ভূদেব ও তাহার স্ত্রী—এই ছয়জন শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য।

একটি মেয়েকে দিয়া পদ্মফুল ও মিষ্টি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, 'এ সংসারে কেউ আমাকে তত্ত্ব করে না, এই একটিই করে।' সেইবারে কামারপুকুরে যাওয়ার সময় মা আমার কাছে ১৫ খানা গিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন।

"মা যখন কলিকাতায়, একডিবা গুল তৈয়ার করিয়া স্বামীর হাতে পাঠাইয়া দেই। ফিরিয়া আসিয়া মা বলিয়াছিলেন, 'তুমি যে গুল পাঠিয়েছিলে, সবাই সুখ্যাত ক'চ্ছিল।'[৩] আমি তখন বলিলাম, 'মা, তুমি তো মন্ত্র দিয়েচ, সাধন-ভজন তো কিছু জানি না—জপে মন বসে না।' মা বলিলেন, 'তুমি এই যে কাজ ক'চ্চ, এতেই সাধন-ভজন করা হ'চ্চে; এর চেয়ে আর কি সাধন-ভজন? ঠাকুরকে জানাও,—আমার যেন ভক্তিলাভ হয়।'

"জগদ্ধাত্রী-পূজার আগের দিন আমার ছোট মেয়ে বিমলার পা ফুলিয়া ব্যথা ও জ্বর হয়, সে অজ্ঞান হইয়া যায়। দুপুরবেলা মা বৈকুণ্ঠ-মহারাজকে একবার দেখিতে বলিলেন। তিনি দেখিয়া বলিলেন, 'ধাত (নাড়ী) নাই; আপনি বল্লেন তাই একদাগ ওষুধ দিলুম—গড়িয়ে পড়ে গেল।' এই কথা শুনিয়া মা নূতন বাড়ী হইতে আসিলেন। আমি তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম ও পায়ের ধূলা লইয়া জল মিশাইয়া মেয়ের মুখে দিলাম। মা তাহার সমস্ত গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং প্রতিমার সম্মুখে যাইয়া সাশ্রুনয়নে কহিলেন, 'কাল তোমার পূজো হবে মা, বড়-বৌ হাউ হাউ ক'রে কাঁদবে?' রাত্রে মেয়ের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।"

ইন্দুমতী দেবী বলেন: "পাগলী [রাধুর মা] এক এক সময় মাকে বলিত, 'তোমার অনেক ভাজ আছে, তাদের ছেলে একটি লাওগে যাও। তুমি কি আমার ছেলেকেই লিবে ব'লে জন্মেছিলে?'

"মা পাগলীকে একখানা গরদের কাপড় দিয়াছিলেন। রাধুর জন্য কথা কাটাকাটি হওয়ায় সে কাপড়খানা মার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'এই

[৩] শ্রীশ্রীমা প্রত্যহ চারিবার দাঁতে গুল দিতেন। নারিকেল-পাতা ও দোক্তা পোড়াইয়া গুল তৈয়ার করা হইত।

নাও তোমার কাপড়, তোমার ভাল ভাজদের দাওগে।' মা বলিলেন, 'তোর চেয়ে আমার কে ভাল ভাজ আছে ? আমি কি তোর ভাতার যে আমার উপর এত উপদ্রব ক'চ্চিস ? আমি যাকে মন চায় তাকেই দিয়ে দেব।'

"মা আমাকে সোনার চুড়ি করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার বাড়ীর সদর দরজা দিয়া হন্‌হন্‌ করিয়া পাগলী বাড়ীতে ঢুকিতেছে আর ছেলেরা বলিতেছে, 'পাগলী-মামী এসেচে রে, পাগলী-মামী এসেচে!' মা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'চুড়িগুলি হাত থেকে ঠাণ্ডা কর্। আমি বিকেলবেলা চুড়িওলি ডেকে হাতে চুড়ি দিয়ে দেব।'

"একবার পাগলী মাজ্‌টে গ্রামে বাপের বাড়ী যায়। তাহার বাবা তাহার নিকট হইতে একশত টাকা ধার লইয়া কতকগুলি রূপার গহনা বন্ধক দেয়। পাগলীর নিজের অলঙ্কারপত্রও যথেষ্ট ছিল। সেগুলি একটা বাক্সে পূরিয়া সন্ধ্যার সময় রওনা হইয়া ফুলুই গ্রামে আসে; ফুলুইয়ে ভানুপিসীর ভাসুরপোরা তাহাকে যত্ন করিয়া রাখে। তাহাদিগকে যত্ন করিতে দেখিয়া পাগলীর সন্দেহ হইল—এত যত্ন কেবল তাহার অলঙ্কার-গুলি বাগাইবার জন্য! তখনই 'ওরে বাবা রে—আমাকে মারলে রে—' বলিয়া সে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। চীৎকারে গ্রামের লোক একত্র হইয়া তাহাকে বাপের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল আর এখানে মার কাছেও সংবাদ পাঠাইল। তাহার বাবা অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিয়া পরে অস্বীকার করিল। মা মহা ভাবিত হইয়া লোক পাঠাইয়া পাগলীর বাবাকে জয়রামবাটীতে আনাইলেন এবং অনুনয় করিয়া, এমন কি, পায়ে হাত দিয়া বলিলেন, 'আপনি আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।' কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মা সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া কলিকাতায় চিঠি দিয়াছিলেন। চিঠি পাইয়া মাষ্টার-মহাশয় ও ললিত চাটুজ্যে জয়রামবাটী আসিলেন। ললিতবাবু পুলিশের উপরওয়ালা একজনের চিঠি লইয়া আসিয়া-ছিলেন; তিনি পেন্টুলুন পরিয়া, পালকিতে চাপিয়া বদনগঞ্জ থানায় উপস্থিত হইতেই তাঁহার চেহারা ও পোষাক দেখিয়া থানার দারোগা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই ভয়ে অস্থির। মা মাষ্টার-মহাশয়কেও সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন

এবং বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, 'ব্রাহ্মণের যেন হাতকড়ি না পড়ে।' পুলিশ যাইয়া একটু ধমকাইতেই অলঙ্কার আদায় হইয়া গেল এবং সেইদিনই ব্রাহ্মণকে জয়রামবাটী লইয়া আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র সাজাইয়া আনন্দ করা হইল। পাছে ব্রাহ্মণেব বিশেষ কোন অপমান হয় এই চিন্তা সারাদিন করিতে করিতে মাব শরীর অসুস্থ হইল—তাঁহার বায়ু প্রবল হইয়া মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না ”

কমলা ঘোষ বলেন: একদিন বড়-মামী ও পাগলী-মামীতে ঝগড়া হইতেছিল ; বড-মামা নূতন বাড়ীতে শ্রীশ্রীমার কাছে আসিয়া বলিলেন, 'দিদি, এর একটা কিনাবা ক'রে দাও।' এমন সময় দুই মামীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই পাগলী-মামী মাকে গালাগালি করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, 'ছ্যাখ্, যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বব ঘবে বাঁধা। আমিও স'রে প'ড়ব, তোদেবও দুর্দশার শেষ থাকবে নি।'

কলিকাতার বাড়ীতে চন্দ্রমোহন দত্ত একদিন শুনিতে পান, পাগলী-মামী বিড়বিড় করিয়া শ্রীশ্রীমাকে কটুকথা কহিতেছেন। মা তখন পূজা করিতেছিলেন ; পূজা শেষ হইলে পাগলীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, -'কত মুনিঋষি তপস্যা ক'রেও আমাকে পায় না, তোরা আমাকে পেয়ে হরালি!' ৺কাশীতে একদিন সকালবেলা মা বলিয়াছিলেন, কাল সারা রাত ছোট-বৌ আমাকে গাল দিয়েচে—ব'লেচে, 'ঠাকুরঝি মরুক, ঠাকুবঝি মরুক।' ছোট-বৌ জানে না যে আমি মৃত্যুঞ্জয় হ'য়েচি। [বি]

পাগলী-মামী গালাগাল দিলেও শ্রীশ্রীমা তাঁহার কথায় সাধারণতঃ কান দিতেন না এবং তাঁহাব সকল কথার জবাবও দিতেন না। কখন কখন রঙ্গরস করিয়া কিংবা ছড়া কাটিয়া তাঁহার কথার উত্তর দিতেন। একদিন বলিয়াছিলেন, 'একটা প্যান্‌পেনে ঘ্যান্‌ঘেনে সিকনি-নেকো মেয়ে, তার জন্যে মাগী গরব ক'রে মরে! ছ্যাখ্ দেখি নি, (প্রবোধবাবু প্রমুখ ভক্ত-দিগকে দেখাইয়া) আমার কত শত সোনার চাঁদ ছেলে![৪]—না বিইয়ে

---

[৪] জয়রামবাটীতে শ্রীসুশীলকুমার সরকার বাহিরের ঘর হইতে একদিন শুনিতে

ছেলের মা!' কখন কখন মিষ্টি-মুখে তাঁহাকে নানাকথা বলিয়াও বুঝাইতেন। একদিন বলিয়াছিলেন, 'তুই আমাকে সামান্য মনে করিস নি। আমি দেবাংশী, ঈশ্বরজানিত লোক। তুই যে আমাকে এত বাপান্ত, মা-অন্ত ক'রে গাল দিচ্চিস্, আমি তোর অপরাধ নিই না—ভাবি দুটো শব্দ বই তো নয়? আমি যদি অপরাধ নিই, তা হ'লে কি তোর রক্ষে আছে? যে কদিন বেঁচে আছি, তোরই ভাল—তোর মেয়ে তোরই হবে। যে কদিন না মানুষ হয়, সে কদিনই আমি। নতুবা, আমার কি মায়া? এখুনি কেটে দিতে পারি।' [গ]

একএক সময়ে শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে পাগলী-মামীর কথাবার্তা ভক্তদের কাছে উপভোগ্য হইত। মা ঠাকুরকে ফুল দিয়া সাজাইতেছেন, আর পাগলী তাহা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া স্ত্রী-ভক্তদিগকে বলিতেছেন, 'ছাখ তোমাদের মার কি কাণ্ড—নিজের স্বামীকে নিজেই সাজাচ্চে।'

সুরবালা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া গালাগাল দিলেও, তিনি যে শ্রীশ্রীমার মহত্ত্ব ও দেবত্ব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন, তাহা নহে। তিনি ইহাও বেশ বুঝিতেন যে, মার যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার রাধু পাইবে, কেন না, মা তাঁহার রাধুর মত আর কাহাকেও এত ভালবাসেন না। সেইজন্য মা টাকাপয়সা অন্যকে বিলাইয়া দিতেছেন দেখিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহার নিজের জন্য কিন্তু তিনি অর্থাদি কামনা করিতেন না এবং মা তাঁহাকে টাকাপয়সা দিতে চাহিলেও লইতেন না। যখন মার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইল, তিনি আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরঝি, তুমি চব্বিশ-প্রহর করাও।'

* * * *

রাধারাণীকে শ্রীশ্রীমা লালনপালন করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন।

পাইলেন, শ্রীশ্রীমা তরকারী কুটিতে কুটিতে মেয়েদের কাহাকেও বলিতেছেন, 'একজনের যদি পাঁচটি ছেলে থাকে, এক একটি হয় এক এক রকমের: কেউ ভাল তো কেউ মাতাল, কেউ আরো কত কি। আমার এত যে ছেলে সবই বাছা বাছা ছেলে, একটিও খারাপ নাই!'

সুতরাং তাহার উপর যে মাতৃজন-সুলভ বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। মা যখন কলিকাতায় নিজের বাড়ীতে প্রথম আসেন, তখন রাধু বড় হইয়াছে। তাহার সঙ্গে একই তক্তাপোষে শোয়া মার কষ্টকর হইতেছে মনে করিয়া শরৎ-মহারাজের আদেশে গণেন্দ্রনাথ একখানি ছোট খাট প্রস্তুত করাইয়া আনেন। উদ্দেশ্য,—মা খাটে শুইবেন এবং রাধু তক্তাপোষে শুইবে। দুইখানি একসঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইলে মা যেন উপরোধে পড়িয়া সেই খাটে শয়ন করিলেন; কিন্তু কয়েকদিন শুইবার পরেই গণেন্দ্রনাথকে কহিলেন, 'বড় অসুবিদে হ'চ্চে। রাধি কাছে না শুলে আমার ভাল ঘুম হয় না। আমি তো এ খাটে দিনকতক শুলুম; এ খাট তোমাকে দিলুম, তুমি শোবে।'

বাগবাজার-ষ্ট্রীটের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা যখন ছিলেন তখন সিষ্টার নিবেদিতা রাধুকে অনেকগুলি ফ্রক তৈয়ার করিয়া দেন। রাধু ব্যবহার করিলেও কতকগুলি ফ্রক একপ্রকার নূতনই থাকিয়া যায়। মা সেইগুলি বাক্সে তুলিয়া রাখেন—রাধুর ছেলে হইলে পরিবে বলিয়া। ঐ ফ্রকগুলি মাকুর ছেলেকে দিবার জন্য গণেন্দ্রনাথ ও গোলাপ-মা অনেকবার বলিলেও মা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। মা যখন যে কাজটি করিতেন, সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সহিতই করিতেন: এই ঘটনায় ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীমা বিছানায় পা মেলিয়া বসিয়া আছেন; কাছে শুইয়া রাধু তাঁহার বেতো পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে, আর মা তাহাকে সুমধুর আবৃত্তি করিয়া শিখাইতেছেন,—'ওরে রসনা রে, পূরা বাসনা রে, রাধাগোবিন্দ গোবিন্দ ব'লে নেরে। জয় রাধাগোবিন্দ, শ্যামসুন্দর, মদন-মোহন, বৃন্দাবনচন্দ্র ॥'

একবার জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার ভীষণ জ্বর হয়। রাত্রিকালে জ্বরের ঘোরে অন্যান্য কথার সঙ্গে মা বলিয়া উঠিলেন, যেন ঠাকুরকে বলিতেছেন, 'যেতে দেবে না? কেন?—রাধির জন্যে? আচ্ছা তাই।' [আ]

বাল্যকাল হইতেই রাধুর দেহ রুগ্ন ছিল এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার রোগ লাগিয়াই থাকিত। তাহার রোগ হইলে শ্রীশ্রীমা মহা ভাবিত হইয়া

পড়িতেন এবং ডাক্তারি ও কবিরাজী চিকিৎসা, দৈব ঔষধ প্রয়োগ, ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত—এইভাবে একটার পর একটা করাইয়া বা করিয়া যাইতেন। একবার চণ্ড নামাইয়া রোগ ও তাহার প্রতিকার অবগত হইবার জন্য ইবকোণা গ্রামে বিভূতিবাবুকে পাঠাইয়াছিলেন। একদিন বলিলেন, 'রাধুর অসুখের জন্যে সব ঠাকুরকে ব'ল্লুম, কিছু হ'ল' না। কত ডাক্তার ক'বরেজ এসে গেল—তাদেরই সুবিদে হ'ল' !'

১৩২৫ সালে রাধু যখন অন্তঃসত্ত্বা হইয়া অসুস্থ হয়, শ্রীশ্রীমা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন ও তাহাকে লইয়া কলিকাতা হইতে কোয়ালপাড়া চলিয়া যান। সেইবারে দীর্ঘকাল শয্যাশায়িনী থাকিলেও, মার অশেষ যত্নে রাধু অবশেষে নিরাময় হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী মহেশ্বরানন্দ বলেন, 'প্রসব-কালের অনেকদিন পূর্ব হইতেই রাধু স্নায়বিক অবসাদ রোগে শয্যাশায়িনী হইয়া পড়ে। শরৎ-মহারাজ রাধুর কোষ্ঠী দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, তাহার সুখপ্রসব হইবে না, অস্ত্রোপচার করিতে হইবে। সেইজন্য তিনি ধাত্রীবিদ্যায় অভিজ্ঞ সরলাকে পাঠাইয়াছিলেন এবং আমাকেও যাইয়া থাকিতে বলিয়া-ছিলেন। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও সুখপ্রসব হইতে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। দীর্ঘকাল চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়িয়া ও চিকিৎসা করিয়া আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে এরূপ হওয়া অসম্ভব। ইহাকে মার প্রভাব ভিন্ন আর কি বলিব ?' রাধুর প্রসবের জন্য ডাক্তার আনাইবার পূর্বে ইন্দু-ভূষণ সেনগুপ্তকে মা বলিয়াছিলেন, 'কুকুর-শিয়াল যারা বনে থাকে তাদের কি আর প্রসব হয় না ? কে দেখে ? ঠাকুরই দেখবেন।'

রাধুর সঙ্গে দৈনন্দিন ব্যবহারে একএক সময়ে শ্রীশ্রীমার অপূর্ব বালিকা-মূর্তি ফুটিয়া উঠিত। এই বালিকা-মূর্তি তাঁহার চরিত্রের এক বিশিষ্ট অভিব্যক্তি। সুশীলাবালা দত্ত বলেন ঃ একদিন রাধু মার কাছে আসিয়া নালিশ করিল যে, বর তাহাকে চড় মারিয়াছে। মা উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, সে বরকে গামছা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। মা বলিলেন, 'একটা গামছা ছুঁড়ে মারলেই কি একটা চড় মারতে পারে ?' মা যেন মন্মথের উপর রাগিয়া গেলেন। আমি বলিলাম, 'তা রাধু যদি গামছা ছুঁড়ে মেরে থাকে, তা হলে তো বর এরকম করতেই পারে।' মা বলিলেন,

'তাই কি বৌমা? তোমাদের কি এরকম করে? ঠাকুরের সঙ্গে তো আমার এরকম ব্যবহার কখন হয় নাই, এসব জানি না। (রাধুর প্রতি) ঐ শোন, তোরই তো দোষ তা হ'লে। স্বামীকে এরকম ক'ত্তে নাই—ঐ যে বৌমা বলে!'

শ্রীশ্রীমার নূতন বাড়ী রেজিষ্ট্রি হইবে। স্বামী সারদানন্দ উপস্থিত আছেন। কোতুলপুর হইতে মুসলমান সাব্‌রেজিষ্ট্রার আসিয়াছেন। তাঁহাকে মার ঘরের বারান্দায় বসানো হইল। মা কপাটের আড়ালে দাঁড়াইলেন। সাব্‌রেজিষ্ট্রার প্রশ্ন করিলেন, 'আপনার নাম কি?' মা আস্তে আস্তে বিভূতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিভূতি, আমার নাম কি?' তিনি কহিলেন, 'মা, আপনার নাম সারদামণি।' তখন মাও বলিলেন, 'সারদামণি'।

কত সেবক কাছে থাকিলেও তাহাদিগকে না বলিয়া শ্রীশ্রীমা একটি ছোট ছেলেকে বলিতেছেন, 'দে বাবা, চারটি ফুল তুলে, লক্ষ্মী ধন আমার!' আর সে ছেলে বলিতেছে, 'নাঃ, আমি পারব নি।' সে ছেলে কিছুতেই কথা শুনিবে না, আর মাও ছাড়িবেন না। শেষকালে তাহাকে দিয়াই ফুল তুলাইলেন! কত সেবিকা কাছে থাকিলেও তাহাদিগকে না বলিয়া মা গ্রামের এক বৃদ্ধাকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, 'দে মা, পায়ে একটু হাত বুলিয়ে, পাটা বড় কামড়াচ্ছে।' আর সেই বুড়ি উত্তর করিতেছে, 'আমি পারব নি, বাছা। সমস্ত দিন গেল, 'আর এই রেতের বেলা পায়ে হাত বুলিয়ে দাও! আমি আর পারি নি।' মা বলিলেন, 'দে মা, একটু হাত বুলিয়ে, কি আর ক'রবি বাছা বল্‌!' সেও করিবে না, মাও ছাড়িবেন না। শেষকাল তাহাকে দিয়াই হাত বুলাইয়া নিলেন। [ত]

জয়রামবাটীতে একদিন শ্রীশ্রীমা ঘরের দাওয়ায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া আছেন। জনৈক ভক্ত দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, এ ধূলা-মাটিতে শুধু কাপড়ের উপর শুয়েচেন যে?' 'বাবা, একদিন তো মাটিতেই মিশতে হবে।'—এই বলিয়া মা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বসিলেন, যেন পাঁচ বছরের মেয়েটি। [উ]

শ্রীশ্রীমা নিজের দৃষ্টান্তে ও উপদেশে সর্বপ্রকার সৎশিক্ষা দিয়া মানুষ করিলেও, রাধুর ক্ষুদ্র আধারে অতটা গ্রহণ করিবার সামর্থ্য ছিল না। মার আদরযত্ন তৎকালে তাহার চরিত্রের একগুঁয়ে ও আব্দেরে ভাবটিই বিশেষভাবে বর্ধিত করিয়াছিল এবং তাহার গর্ভধারিণীর মস্তিষ্ক-বিকৃতিও তাহাতে সংক্রামিত হইয়াছিল। অনেক সময়ে সে মার উপর নিষ্কারণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত এবং যথেচ্ছ গালি বর্ষণ করিয়া উপস্থিত ভক্তগণের প্রাণে ব্যথা দিত। মার তিরোভাবের অনতিকাল পূর্বে তাহার এইরূপ স্বভাবের বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। একবার মা বিষ্ণুপুর হইতে গরুর গাড়ীতে আসিতেছেন, কোতুলপুরের কাছে আসিয়া রাধু তাঁহাকে পা দিয়া ঠেলিয়া বলিতে লাগিল, 'তুই সর্, তুই সর, তুই গাড়ী থেকে নেমে যা।' মা গাড়ীর পেছন দিকে সরিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন, 'আমি যদি যাব, তবে তোকে নিয়ে তপস্যা ক'রবে কে?' [বি] স্বামী মহেশ্বরানন্দের সাক্ষাতে রাধু মাকে লক্ষ্য করিয়া লাথি মারিয়াছে; সেই লাথি তাঁহার গায়ে লাগিতেই, 'ক'ল্লি কি, ক'ল্লি কি, রাধু?' বলিয়া মা নিজের পায়ের ধূলা রাধুর মাথায় দিলেন।

রাধুর ন্যায় রাধুর স্বামী মন্মথকে লইয়াও শ্রীশ্রীমাকে সময়ে সময়ে বিব্রত হইতে হইত। বড় ঘরের ছেলে, বিলাসী ও শিক্ষার দোষে স্বেচ্ছাচারী যুবক তখন শ্বশুরগৃহে আসিয়াও স্বভাব নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিতে জানিতেন না। রাধুর অসুখের সময় তিনি মাঝে মাঝে কোয়াল-পাড়ায় আসিয়া তথাকার মঠে অবস্থান করিলেও মঠের নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে চাহিতেন না। একদিন সন্ধ্যারতির সময় আড্ডা ও বৈঠকী গানে তাহাকে মত্ত দেখিয়া মঠাধ্যক্ষ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তগণের সাক্ষাতে, মৃদু তিরস্কার করিলে তিনি ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ গোযানের ব্যবস্থা করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া যান। সেইকথা জানিতে পারিয়া মা তাড়াতাড়ি লোক পাঠাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করেন।

* * * *

শ্রীশ্রীমা রাধুকে লইয়া কোয়ালপাড়ায় যখন ব্যস্তভাবে দিন কাটাইতে-ছিলেন, সেই সময় জয়রামবাটীতে যাইয়া মাকুর তিন বছরের ছেলে ন্যাড়া

ডিপ্‌থিরিয়া-রোগে মারা যায়। এই দৈব-প্রকৃতিবিশিষ্ট শিশুটিকে মা লালনপালন করিয়াছিলেন এবং তাহার শোকে এতই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মৃত্যুর আটদশ দিন পরেও ন্যাড়ার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে অশ্রু ঝরিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহাকে এইরূপ শোক করিতে দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়াছিল, 'সংসারী লোকের ছেলেমেয়ের মরণে কতটা কষ্ট হয়, তা বোধ হয় এবার আপনিও বুঝতে পারলেন?' মা বলিলেন, 'তা কি আর ব'লতে? যে কষ্ট হ'চ্চে মাকুর ছেলেকে পালন ক'রে, তা ভুলতে পাচ্চি নি!' [উ] ন্যাড়ার মৃত্যুর দুইতিন দিন পরে মা বলিয়াছিলেন: ন্যাড়া আমাকে যাবার সময় পেন্নাম ক'রে যায় নি। দুফুরবেলা আমি খেয়ে শুয়েচি, পালকি এসে পৌঁছেচে; নলিনী চীৎকার ক'রে ব'লচে 'মাকি, এখনো দাঁড়িয়ে রয়েচিস? শীঘ্রি চ'লে আয়।' মাকু অমনি ন্যাড়াকে নিয়ে চ'লে গেল—মাকু আমাকে পেন্নাম না ক'রিয়েই নিয়ে চ'লে গেল![৫] ন্যাড়া যে আমাকে সীতা ব'লেছিল! ন্যাড়া যে আমাকে সীতা ব'লেচে! আমার দাঁত প'ড়ে গেছে, পায়খানার সিঁড়িতে ব'সে পা দুলিয়ে দুলিয়ে ব'লচে নিজের দাঁত দেখিয়ে, 'পিসীমা, আমার দাঁত দুটি লাও!' [বি]

জয়রামবাটী হইতে শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসিবেন। সমস্ত জিনিষপত্র গাড়ীতে তোলা হইয়াছে, কেবল 'ঠাকুরের বাক্‌স' তুলিতে বাকী আছে। বিভূতিবাবু বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখেন, ন্যাড়া মার ঘরের বারান্দায় ঠাকুরের বাক্‌সের উপর বসিয়া আছে ও মা হাততালি দিতেছেন। দেখিবামাত্র তাঁহার মনে হইল, বাক্‌সের ভিতরে যিনি বাহিরেও তিনি—এইরূপ দেখিয়াই যেন মা হাততালি দিতেছেন।

কোয়ালপাড়ায় বনের মত স্থানে জন্মিয়াছিল বলিয়া শ্রীশ্রীমা রাধুর ছেলের নাম রাখিয়াছিলেন বনু বা বনবিহারী।[৬] প্রত্যহ সকালে মা এই

---

[৫] শ্রীশ্রীমা যখন দক্ষিণ দেশ হইতে ফিরিয়া আসেন রামলাল-দাদা সঙ্গে ছিলেন। রাখাল-ছেলেরা ঢিল ছুড়িতেছিল, রামলাল-দাদার কপালে লাগে। হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়া মাকে প্রণাম করিয়া যেমন তিনি ঢিলের কথা বলিলেন, মা বলিয়া উঠিলেন, 'রামলাল, গাড়ীতে উঠবার সময় তুমি তো আমাকে প্রণাম কর নি!' [বি]

[৬] ১৩২৬ সালের ২৪শে বৈশাখ বনুর জন্ম হয়। [দি]

গান গাহিয়া বন্ধুর ঘুম ভাঙ্গাইতেন,—'উঠ লালজি, ভোর ভায় সুর-নর-মুনি-হিতকারী। স্নান ক'রে দান দেহি গো-গজ-কনক-সুপারি॥' মা বলিতেন, 'কৌশল্যা রামচন্দ্রকে এমনিভাবে গান গেয়ে উঠাতেন।'

* * * *

ভ্রাতুষ্পুত্র ভূদেবের বিবাহে শ্রীশ্রীমাকে অত্যন্ত খাটিতে হইয়াছিল। সহোদরগণের সংসারের যে-কোন ব্যাপারেই তাঁহাকে এইরূপ পরিশ্রম করিতে হইত। বিবাহের দুইদিন পরে মা নিজের পায়ের ফুলা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'গিরিশবাবু সত্যিই ব'লেচেন,—এরা সব [মার ভাইয়েরা] মাথা কেটে তপস্যা ক'রেচে।' [বি]

ভূদেবের যখন বিবাহ হয়, তখন তাহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র এবং তাহার স্ত্রী নিতান্ত বালিকা। বিবাহের দিন কয়েক পরেই শাশুড়ী নূতন বৌকে শাসন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীমা হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, 'ও মেজ-বৌ, চুপ—চুপ কর্। এলো কি অমনি এসেচে? এলোর বিয়েতে কত বাদ্যি বেজেচে! কত বাদ্যি বেজেচে, কত বাজনা বেজেচে! (গম্ভীরভাবে) তুই বকচিস কেন? কত সাধের বউ!'[১]

এই রঙ্গরসপ্রিয়তা শ্রীশ্রীমার চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব। পাত্র-ভেদে অনেক সময় ইহার মধ্য দিয়াই তিনি শিক্ষাদান করিতেন এবং রঙ্গরস করিবার সময় কখন কখন তাঁহার মুখ হইতে স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে বাক্য নির্গত হইত। এখানে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না।

অক্ষয়কুমার সেন বলিয়াছেন : আমি একদিন মার কাছে গিয়ে বল্লুম, 'মা!' মা বল্লেন, 'হ্যাঁ বাবা।' তখন বল্লুম, 'মা, আমি বল্লুম,—মা, আর তুমি বল্লে,—হাঁ; আর কিসের ভয়?' মা বল্লেন, 'না বাবা, অমন কথা বোলো না। যার আছে ভয়, তারই হয় জয়।' [সু]

জয়রামবাটীতে মার জ্বর হইয়াছে। একটা বাটিতে প্রায় একসের পরিমাণ দুধ-সাগু তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে। মা খানিকটা মাত্র খাইয়া বাটি হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, 'কিগো, আজ যে

---

[১] রোহিণীবালা ঘোষ ঘটনার সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

প্রসাদে ভক্তি নাই?’ ভক্তেরা শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর যাইয়া সেই প্রসাদ ভাগ করিয়া খাইলেন। [উ]

প্রসন্ন-মামার ঘরের ভিতর মা পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রকাশ-মহারাজ গুটিকতক পদ্মফুল হাতে লইয়া প্রণাম করিতে ভিতরে ঢুকিলেন। তাঁহার নিকট হইতে একটি ফুল চাহিয়া লইয়া প্রবোধবাবু পেছনে পেছনে ঢুকিলেন। প্রকাশ-মহারাজ মার পাদপদ্মে ফুল দিয়া প্রার্থনা করিলেন, ‘মা, আমাকে আর ঘুরোবেন না।’ মা হাসিমুখে উত্তর দিলেন, ‘আমাকে ছেড়ে এতদিন ঘুরতে পাল্লে, আমি একটু ঘুরব নি?’

কলিকাতা হইতে মা জয়রামবাটী যাইবেন, কিন্তু একের পর অন্যের অসুখের জন্য কেবলই বাধা পড়িতেছে। মা ঠাকুরকে বলিতেছেন, ‘জয়রাম-বাটী চল। জয়রামবাটীর বড় পুকুরের জল আর তুলসী কি মনে লাগে না তোমার?’ [ই][৮]

শেষোক্ত ঘটনায় শ্রীশ্রীমার আচরণ দেখিয়া মনে হয়, তিনি যেন ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া কথা কহিতেছেন। বাস্তবিক, ঠাকুরকে তিনি আমাদের মত ছবিমাত্র দর্শন করিতেন না; সাক্ষাৎ ঠাকুরের সঙ্গেই তাঁহার মিলন ও কথাবার্তা হইত। কলিকাতায় নিজবাটীতে যখন মা প্রথম শুভাগমন করেন, সেই সময়ে ঠাকুর-ঘরের পাশের ঘর তাঁহার শয়নের জন্য নির্দিষ্ট হয়। মা তাহা দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, ‘ঠাকুরকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি? আমাকে ঠাকুর-ঘরেই দাও।’ [আ]

---

৮ জয়রামবাটীতে ফুল অনেক সময়েই বড একটা পাওয়া যাইত না বলিয়া শ্রীশ্রীমা শুধু তুলসীপাতা ও জল দিয়া ঠাকুর-পূজা করিতেন। তথায় অবস্থান-কালে মার পূজার ফুল সংগ্রহ করিবার জন্য শরৎ-মহারাজ গণেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া কোন দিন শিহড়ে, কোন দিন বা আমোদর-তীরে যাইতেন। গণেন্দ্রনাথ শিহড়ে কাঞ্চন-গাছে এবং আমোদর-তীরে গুলঞ্চ-গাছে চড়িয়া ফুল পাড়িতেন এবং শরৎ-মহারাজ নীচে থাকিয়া সেই ফুল কুড়াইতেন। বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে মার পূজার ফুল যোগাড় করিবার জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীত রাত্রি চারিটায় উঠিয়া শিউলি-তলায় চাদর বিছাইয়া রাখিতেন।

শ্রীশ্রীমার মধ্যমভ্রাতা কালীকুমার যে জায়গায় বাড়ী নির্মাণ করেন পূর্বে তথায় অনেক ফুলের গাছ ছিল; মা প্রত্যেক দিন নিজহাতে ফুল তুলিয়া ঠাকুর-পূজা করিতেন। [ই]

স্বামী মহাদেবানন্দ মোটা তুইগাছি গড়ে মালা গাঁথিয়া কোয়ালপাড়া হইতে স্বামী বিদ্যানন্দের হাতে পাঠাইয়াছেন। পূজার সময় মা সেই মালা ঠাকুরকে পরাইলেন এবং পূজা শেষ হইলে বিদ্যানন্দজীকে কহিলেন, 'মতিকে বোলো, এত ভারী মালা যেন না দেয়—ঠাকুরকে ভারী লাগবে।'

নিবেদিত অন্নাদি ঠাকুর গ্রহণ করেন কি-না তাহাও শ্রীশ্রীমা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন। যে নৈবেদ্য ঠাকুর গ্রহণ করিলেন না দেখিতেন, তিনি নিজে তাহা কদাচ গ্রহণ করিতেন না। কতবার সেই অগৃহীত ভোজ্য পরীক্ষা করিয়া তাহাতে কেশ, মৃত কীট ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিংবা উহার অগ্রভাগ অপরে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৩১৮ সালে জয়রামবাটী যাইয়া ডাক্তার লালবিহারী সেনের পেটের অসুখ হয়। মা তাঁহাকে খিচুড়ি দিতে আসিলে তিনি খাইতে আপত্তি করেন। তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, 'একটু খাও, স্বয়ং ঠাকুর খেয়েচেন।' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুরকে কি দেখতে পাওয়া যায়?' মা বলিলেন, 'হ্যাঁ; আজকাল মাঝে মাঝে এসে খিচুড়ি আর ছানা খেতে চান।' স্বামী অসিতানন্দ একদিন জগদম্বা-আশ্রমে মাকে বলেন, 'মা, ঠাকুরকে তো ভোগ নিবেদন করি' কিন্তু তিনি খান কি-না, কিছুই বুঝতে পারি না।' মা উত্তর দেন, 'খান বই কি, বাবা; প্রাণের ভিতর থেকে নিবেদন ক'ল্লে নিশ্চয়ই খান। আমি যখন গোপালকে খেতে দিয়ে আদর ক'রে ডাকি, তখনই দেখি, গোপাল নূপুর-পায়ে ঝুন্‌ঝুন্ ক'রে এসে হাজির হয় আর আব্দার ক'রে খায়!'

শ্রীশ্রীমা বলিতেন, দেবতার চক্ষু হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া নিবেদিত ভোজ্যবস্তু চুষিয়া দেখে বা উহার সূক্ষ্মাংশ গ্রহণ করে; তাঁহার অমৃতস্পর্শে উহা আবার পরিপূর্ণ হয় বলিয়া কমে না। কদাচিৎ সবল বিশ্বাস ও ভক্তির ঐকান্তিকতায় ঠাকুর যে স্থূলভাবেও নিবেদিত অন্নাদি গ্রহণ করিতে পারেন তাহার নিদর্শনস্বরূপ মার শ্রীমুখ-কথিত একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি। শ্রীমতী স্নেহলতা সেনকে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ এক ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে যাওয়ার সময় নিজের পাগলাটে ছোট ছেলেকে বলিলেন, 'তুই আজ ঠাকুরের পূজো করিস, ভোগ দিস—কেমন, পারবি তো?' ছেলে বলিল, 'হ্যাঁ—, খুব পারব।' পূজা শেষ হইলে তাহার মা থালায় ভোগ

বাড়িয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ছেলেটি দরজা বন্ধ করিয়া জোড়হাতে ঠাকুরকে খাইতে বলিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া 'খাও ঠাকুর, খাও ঠাকুর' বলা সত্ত্বেও গোপাল-ঠাকুর কিছুতেই খান না দেখিয়া তাহার রাগ হইল ও লাঠি হাতে করিয়া বসিয়া বলিল, 'ঠাকুর, খাবে তো খাও, তা না হ'লে এই লাঠি দিয়ে তোমার মাথা ভেঙ্গে দেব!' তখন ঠাকুর একটি ছোট ছেলের বেশ ধরিয়া মূর্তি হইতে বাহির হইলেন ও আসনে বসিয়া খাইতে লাগিলেন! সমস্ত ভোগ নিঃশেষে ভোজন করিয়া ঠাকুর কহিলেন, 'আমি যে খেয়েচি, কাকেও বলিস নি; ব'ল্লে ভাল হবে না।' এই কথা কহিয়াই তিনি মূর্তির মধ্যে মিলাইয়া গেলেন। দরজা খুলিতেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে, ঠাকুরকে খাইয়েচিস?' ছেলে উত্তর করিল, 'হুঁ: এবার আমাকে খেতে দাও।' ব্রাহ্মণী দেখিলেন, থালায় কিছুই অবশিষ্ট নাই। পাগল ছেলে ঠাকুর-ঘরে বসিয়াই ঠাকুরের ভোগ খাইয়াছে মনে করিয়া তিনি ভয় পাইলেন, এবং খানিক পরে ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিতেই সকল কথা বলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই ঠাকুরকে ভোগ দিয়েচিস—ঠাকুরকে খাইয়েচিস?' ছেলে বলিল, 'হ্যাঁ—, খুব ভাল ক'রে খাইয়েচি।' পুনরায় ধমক দিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'ঠাকুরকে খাইয়েচিস, না নিজে খেয়েচিস?' ছেলে তখন নিরুপায় হইয়া বলিল, 'না বাবা, আমি খাই নি—ঠাকুর নিজে খেয়েচেন, কাকেও ব'লতে মানা ক'রেচেন—মূর্তি থেকে বার হ'য়ে খেয়ে আবার মূর্তিতে ঢুকে গেছেন।' এই কথা কহিবামাত্র রক্ত বমন করিয়া ছেলেটি মারা গেল। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের কাছে পড়িয়া, 'আমার একমাত্র ছেলেটিকে নিলে ঠাকুর!' বলিয়া অনেক কান্নাকাটি করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। ভগবান যখন আসেন তখন শিশু আর গরীবের ভিতর দিয়াই আসেন।

* * * *

শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী হইতে কলিকাতা যাত্রা করিতেছেন: তাঁহার খুড়ী বলিলেন, 'সারদা, আবার এসো।' মা বলিলেন, 'আসব বই কি', এবং ঘরের মেজেয় হাত দিয়া বারবার স্পর্শ করিয়া ও সেই হাত বারবার মাথায় ঠেকাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' [বি]

শ্রীশ্রীমার খুড়তুতো ভাই সূর্যনারায়ণ কলিকাতা হইতে তাঁহার সঙ্গে দেশে যাইতেছিলেন। বিষ্ণুপুরে পৌঁছিয়া দেখা গেল, সূর্যনারায়ণ কোন জিনিস ভুলক্রমে কলিকাতায় ফেলিয়া গিয়াছেন। তখনই সেই জিনিষটি পরবর্তী গাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে টেলিগ্রাম করা হইল; এবং মা তাঁহাকে বিষ্ণুপুরে একাকী রাখিয়া যাইতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'সূয্যি কি আমার পর?' [ম]

স্বামী তন্ময়ানন্দ একবার জয়রামবাটীতে যাইয়া দেখেন, শ্রীশ্রীমা চিন্তান্বিত হইয়া বসিয়া আছেন। প্রণাম করিতেই বলিলেন, 'কামারপুকুরে রামলালের অসুখ; রামময়কে দেখতে পাঠিয়েচি, সে এখনো ফিরে আসে নি—কি জানি অসুখ বেশী হ'ল' কি-না।'

গয়লা-বৌ শ্রীমতী আহ্লাদিনী ঘোষ শ্রীশ্রীমাকে 'ঠাকুর-ঝি' বলিতেন। তিনি কখন কখন মার হাত-পা টিপিয়া বা চুল আঁচড়াইয়া দিতেন। মা খুসী হইয়া বলিতেন, 'কুসুমের মত আমার মাথাটি আঁচড়ে দিলে বৌ! কুসুমের হাত এমনি ঠাণ্ডা ছিল।' গল্পচ্ছলে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'যখন ক'লকাতায় থাকি, যোগেন, গোলাপ, শরৎ—এদের কাছে বারো বছরের বহুড়ীর মত ভয়ে ভয়ে থাকি।'

শ্রীশ্রীমা গ্রামবাসীদের সকলেরই ঘরের সংবাদ রাখিতেন এবং অসময়ে যথাশক্তি সাহায্য করিতেন। তাহারা জানিত, মার কাছে আসিয়া জানাইতে পারিলেই তাহারা শোকে সান্ত্বনা পাইবে এবং রোগে তাহাদের ঔষধপথ্যের-ও একটা ব্যবস্থা হইবে। তাহারা একাধিকবার দেখিয়াছিল যে, তিনি গ্রামে থাকিতে অন্যত্র দুর্ভিক্ষ হইলেও তথায় অন্নাভাব হয় না; তাঁহার উপস্থিতিতে অনাবৃষ্টি দূরীভূত হইয়া যায়। একবৎসর বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-জনিত রিলিফ-কার্য হইতে আসিয়া স্বামী বরদানন্দ লোকদের অশেষ-প্রকার দুর্গতির বর্ণনা করিতে থাকিলে, মা চারিদিকে হাত ঘুরাইয়া দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'ত্যাখ বাবা, মা-সিংহবাহিনীর কৃপায় এইটুকুর মধ্যে [জয়রাম-বাটীতে] ওসব কিছু নাই। বাঁকুড়াবাসীর চারপো [পাপ] হ'য়েচে; ভাগ্য-বান তারা যে, ঠাকুর তাদের শীঘ্রি ক্ষয় ক'রিয়ে দিচ্চেন।' বরদানন্দজী কহিলেন, 'মা, আপনি, আছেন বলেই এখানে কিছু নাই; সিংহবাহিনী তো বুঝি না!' মা একথার কোন উত্তর দিলেন না।

শ্রীশ্রীমার প্রভাব নিত্য দর্শন করিয়াও গ্রামবাসীরা তাঁহাকে কিছুতেই যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, তিনি চিরকাল তাহাদের মাসী, পিসী, দিদি ইত্যাদিই থাকিয়া গিয়াছেন।[১] একদিন গ্রামের কোন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাকে দেখতে কত লোক কত দূরদেশ থেকে আসচে; আমরা তোমাকে কিছুই বুঝতে পাচ্চি না কেন?' মা বলিলেন, 'তা নাই বা বুঝলে, তোমরা আমার সখা, তোমরা আমার সখী।' [সু] প্রবীণ-বয়স্ক চৌকিদার অম্বিকাচরণ বাগ্‌দি একদা মাকে বলিয়াছিল, 'লোকে তোমাকে দেবী, ভগবতী, কত কি বলে; আমি তো কিছু বুঝতে পারি না!' মা উত্তর দেন, 'তোমার বুঝে দরকার নাই; তুমি আমার অম্বিকে-দাদা, আমি তোমার সারদা-বোন।' [স] ৺বিজয়া দশমীর দিন দেখা যাইত, সন্ধ্যা হইতে শয়নের পূর্ব পর্যন্ত গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইতেছে; আর তিনি সকলের প্রণাম গ্রহণ করিয়া

---

[১] স্বরূপ-গোপনের সহজ প্রবৃত্তিই যে শ্রীশ্রীমাকে তৎকালে পরিজন ও প্রতিবেশিগণের নিকট অধিকতর দুর্জ্ঞেয় করিয়াছিল নিম্নোক্ত ঘটনা-দুইটিতে তাহার সমর্থন পাওয়া যাইবে।
১। একবৎসর জগদ্ধাত্রীপূজার দিন শ্রীশ্রীমার ভ্রাতা বরদাপ্রসাদ যখন অন্ন পরিবেশন করিতেছিলেন সেই সময় আশুতোষ মিত্র তাঁহার কপালে হোমের ফোঁটা দেন। আহারের পর গ্রামের মুখ্য যোগেন্দ্র বিশ্বাসকে একজন কেমন খাওয়া হইল জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন, 'উইলসনের হোটেলে খাওয়া হ'ল! আর কি জাতফাত রইল?' ইহা লইয়া আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং স্থির হয় যে, মাকে ত্রিশ টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইবে। সেই টাকা দিয়া তাহারা যাত্রাগান শুনিয়াছিল। মার কাছে সহজেই আদায় করিতে পারা যায় দেখিয়া যে-কোন ছলছুতা ধরিয়া ঐরূপ আন্দোলন সৃষ্টি করা হইত এবং মা আন্দোলনকারীদিগকে টাকাপয়সা, গরদের কাপড় ইত্যাদি দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন। কেবল একদিন বলিয়াছিলেন, 'আমি এসব সহ্য ক'চ্চি, আমার ছেলেরা ক'রবে না।'
২। শ্রীশ্রীমা যেবার জগদম্বা-আশ্রমে ছিলেন, সেবকেরা জয়রামবাটীতে ঠাকুরের উৎসব করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মা তাঁহাদিগকে পাঁচটি টাকা দেন। উৎসবে কীর্তন, বাদ্যভাণ্ড ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল ও উৎসব খুব জমিয়াছিল শুনিয়া মা বলিয়াছিলেন, 'আমি থাকতে থাকতে এত জাঁকজমক কেন রে বাপু? আমাকে ম'ত্তে তবু দে!'

সকলকেই আশীর্বাদ করিতেছেন। ভিন্নগ্রামবাসী হইলেও প্রতিমা-শিল্পী কুঞ্জ-মিস্ত্রীকে মা 'কুঞ্জ-কাকা' সম্বোধনে ও বহু আদরযত্নে আপ্যায়িত করিতেন। [স]

দেশ-বিদেশের সংবাদ শ্রীশ্রীমা নানাস্থান হইতে আগত ভক্ত-সন্তানদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন ; কখন বা পত্রিকা পড়াইয়া শুনিতেন। মহাযুদ্ধের সময় অনেকদিন তিনি পত্রিকা পড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। নারীদের কিংবা দেশসেবায় ব্রতী ছেলেদের লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।[১০] লোকের অন্নাভাবে, জলপ্লাবনজনিত দুর্দশায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন এবং দুঃখ দূর করিবার জন্য ঠাকুরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাইতেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

নারীর আদর্শ

শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জীবনী সমগ্রভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে উহাতে পারিবারিক সম্পর্কের চারিটি প্রধান অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়,—সেবাপরা কন্যা, স্নেহশীলা ভগিনী, পতিপ্রাণা সহধর্মিণী এবং সন্তানবৎসলা জননী। কন্যা, ভগিনী, জায়া ও জননী—নারী-জীবনের এই চারিটিই মুখ্য প্রকাশ। নারীমাত্রেই এই সম্পর্কগুলির কোন-না-কোনটির দ্বারা অপরের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বদ্ধ থাকেন। অন্যান্য বিশিষ্ট সম্পর্ক এই মুখ্য সম্পর্কগুলির অবান্তর ভেদমাত্র এবং এইগুলি হইতেই কল্পিত হইয়া থাকে।'

---

[১০] প্রথম মহাযুদ্ধ চলিবার সময় শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী দেবী দেশের পরাধীনতাজনিত দুর্গতির কথা—অত্যাচার, শোষণ, দুর্ভিক্ষ, বিধবার অশ্রু ইত্যাদি—বর্ণনা করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মাকে প্রশ্ন করেন। মা বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুর যখনই আসেন তখনই এরূপ হ'য়ে থাকে। আরো কত কি হবে—এদের ধ্বংস হবে, নিজেদের রাজ্য নিজেদের হবে।'

দরিদ্র কিন্তু ভক্ত মাতাপিতার সংসারে শ্রীমতী সারদা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে সামর্থ্যানুযায়ী কাজকর্ম করিতে হইয়াছে; আর তিনি সানন্দে ঐসকল নিষ্পন্ন করিয়া জননী ও জনকের শ্রম-লাঘব করিয়াছেন। যৌবনকালেও, পিতৃবিয়োগের পর যখন সংসারে অভাব অভিযোগ দেখা দিয়াছিল, তিনি পরিবারস্থ লোকের অন্নের সংস্থান করিতে জননীকে যথাশক্তি সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাকে কাশী-বৃন্দাবন ও পুরী-তীর্থ করাইয়াছিলেন; এবং অবিবাহিত ও ব্যাধিগ্রস্ত খুল্লতাতকে শেষবয়সে নিজের কাছে রাখিয়া পরিচর্যায় পরিতুষ্ট করেন। মাতাপিতার গুণাবলী তিনি আজীবন স্মরণ এবং কথাপ্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে কীর্তন করিতেন।

সহোদরদিগকে তিনি কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পড়াইয়া উপযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ ভ্রাতার অকালে মৃত্যু হইলে তদীয় অনাথা পত্নী ও কন্যার সমগ্র ভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। অন্যান্য ভাইদের সংসারেও তিনি সকলের জন্য আজীবন খাটিয়াছেন ও অর্থাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

দরিদ্র মাতাপিতার বা ভ্রাতৃগণের বৃহৎ সংসারে আজীবন কর্মানরতা কন্যা বা ভগিনীর দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। কিন্তু যাহাদিগকে ঐরূপ পরিশ্রম করিতে হয় তাহারা প্রায়শঃ অবস্থার অধীন হইয়াই উহা করেন এবং করিতে করিতে বা করিবার পরে সহস্রবার অনুযোগ করেন কিংবা অন্যের কাছে কীর্তন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করেন, দেখা যায়। তাহাদের অন্তর প্রতিদান-লিপ্সাবর্জিত নহে। শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জীবনালোচনায় স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, কন্যা ও ভগিনীরূপে তাঁহার কার্য ঐজাতীয় কন্যা ও ভগিনীগণের কার্য হইতে স্বতন্ত্র। সকল সময়ে তিনি অবস্থাধীন হইয়াই চালিত হন নাই; অধিকাংশ স্থলে কেবলমাত্র কর্তব্যবোধে বা হৃদয়ের প্রেরণাতেই কাজ করিয়াছেন এবং ঐরূপ করিবার জন্য জীবনে একটিবারও অনুযোগ বা আত্মশ্লাঘা-কীর্তন করেন নাই।

তাঁহার পাতিব্রত্য জগতে অনুপমেয়। অল্প কথায় ইহার আভাসও দেওয়া চলে না। পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়ের মধ্যে

এই চিরসীমন্তিনীর পাতিব্রত্যের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টামাত্র হইয়াছে। তিনি শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে মাতৃবৎ এবং ঠাকুরের তন্ত্র-সাধনার গুরু ভৈরবী-ব্রাহ্মণীকে ও ঠাকুরে বাৎসল্য-রতিসম্পন্না গোপালের মাকে শ্বশ্রূবৎ সম্মান ও সেবা করিয়াছেন। একদিন রাত্রিতে ঠাকুরের বাল্যসহপাঠী কামারপুকুরের বৃদ্ধ গণেশ ঘোষাল মাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটী আসেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মা গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হন, কিন্তু বৃদ্ধ 'সে কি, সে কি, আমার মা, আমার মা, এতে অকল্যাণ হয় আমার'—এই বলিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন। [আ]

তাঁহার মাতৃত্ব তাঁহার অন্যান্য ভাবকে ছাপাইয়া লোক-সমক্ষে প্রকটিত হইয়াছে। দেহ-সম্পর্কে জননী না হইয়াও, সহস্র সহস্র পুত্রকন্যার হৃদয়ের ভক্তিসিক্ত 'মা'-ডাক শ্রবণ আর কোনও ভাগ্যবতীর অদৃষ্টে ইতঃপূর্বে ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। ঠাকুরের সম্পর্কে তিনি যেমন নিত্য-সীমন্তিনী, ঠাকুরের ভক্তসংসারের অগণিত পুত্রকন্যার সম্পর্কে তেমনি নিত্য-জননী।

নারী বা পুরুষ মাত্রেরই বিশেষসম্বন্ধহীন মানব-সাধারণের সঙ্গে একটা শান্তভাবের সম্পর্ক অল্পাধিক বিদ্যমান থাকে। সাধারণতঃ লোকচক্ষুর অন্তরালে জগতের এক অনুন্নত ও অখ্যাত কোণে নিরক্ষর পল্লীবাসীদের মধ্যে বাস করিয়াও শ্রীশ্রীসারদা দেবী মানুষের প্রগতিমূলক কার্যমাত্রে যেরূপ প্রেরণা দিতেন, তাহার তৃপ্তিতে যেরূপ হর্ষপ্রকাশ করিতেন ও তাহার দুঃখে যেরূপ বিচলিত হইয়া উঠিতেন তাহাতে, শান্তভাবের পরিপুষ্টিতে, মানবসাধারণের সঙ্গে তাহার যোগ যে কিরূপ নিবিড় ও গভীরতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

অনেক বিদুষী নারী কেবল শিক্ষা দ্বারা এমন অবস্থা লাভ করেন যাহাতে সুশিক্ষিত ও মার্জিত-সমাজভুক্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, আর্যাবর্তবাসী ও দাক্ষিণাত্যবাসী, পুরুষ ও রমণী—সকলের সহিতই সমভাবে মিশিতে পারেন। কিন্তু সেই শিক্ষা যদি উদার অধ্যাত্ম শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত না থাকে, তাহা হইলে ঐসকল মহিলারাও কোন কোন ক্ষেত্রে সকলের সহিত সমভাবে মিশিতে বা সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে পারেন না। আক্ষরিক

শিক্ষায় অনেকটা বঞ্চিতা হইলেও শ্রীশ্রীসারদা দেবীর উদার অধ্যাত্ম শিক্ষার চরম ফল 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধা' ছিল বলিয়া তিনি এই বিষয়েও শিক্ষিত নারীগণের আদর্শস্থল হইয়া আছেন। পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্যবাসী নরনারীর সঙ্গে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সকলপ্রকার কল্যাণভাব-সমন্বিত শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মহোচ্চ জীবনের আদর্শ অন্ধকারে আলোকস্তম্ভের ন্যায় জগতের নারীসমাজকে পথ প্রদর্শন করিতেছে ; আন্তরিকতার সহিত তৎপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করার উপরেই যে ভবিষ্য মানবজাতির কল্যাণ অনেকখানি নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আর ভোগৈকলক্ষ্য, জটিলতাময়, বিদেশী সভ্যতার সংঘর্ষে—তথা-কথিত প্রগতির ফলে ও অর্থনৈতিক কারণে, আজ ভারতীয় নারীর জীবন যতই সমস্যাময় হইয়া উঠুক না কেন, শ্রীশ্রীমার জীবনাদর্শ অনুসরণ করিয়াই একদিন তাহাকে আত্মস্থ হইতে হইবে।[১]

অতঃপর আমরা শ্রীশ্রীমার জীবনে, আচরণে ও উপদেশে, ক্ষুদ্রবৃহৎ ব্যাপারে নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত অথবা স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে, যথাজ্ঞান তাহার উল্লেখ করিব।

শ্রীশ্রীমা নিজে বিদ্যাশিক্ষার তেমন সুযোগ পান নাই, কিন্তু অধ্যবসায়-বলে পড়িতে শিখিয়াছিলেন ও অবসর সময়ে রামায়ণাদি পুস্তক পড়িতেন। তাঁহার দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সাধারণভাবে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন ; তাহাদের দ্বারা ধর্মগ্রন্থ পড়াইয়া শুনিতেন ও চিঠিপত্র লিখাইতেন। উচ্চ আদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে যত্নশীলা বিদুষী মহিলারা তাঁহার স্নেহের পাত্রী ছিলেন।[২]

---

[১] শ্রীবিবেকানন্দ-লিখিত একখানি পত্রের কিয়দংশ এইরূপ : মা-ঠাকুরাণী যে কি বস্তু তা আজও বুঝতে পারি নি, এখনও কেহই পারচে না,—ক্রমে পারবে ভায়া! শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? —শক্তির অপমান সেখানে হয় বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।"

[সাপ্তাহিক 'ভারত' (১৬ই পৌষ, ১৩৪৩) হইতে উদ্ধৃত]

সূচিকর্মাদি শিল্পকার্যে শ্রীশ্রীমা স্ত্রীলোককে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় সেলাইয়েব কাজ স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহাকে দিবার জন্য বা দেখাইবার জন্য কেহ কোন সূচিশিল্প—আসন, দেবতার প্রতিকৃতি ইত্যাদি লইয়া গেলে তিনি আনন্দিত হইতেন এবং বারবার প্রশংসা করিয়া ও সকলকে দেখাইয়া শিল্পীর প্রাপ্য মর্যাদার বহুগুণ অধিক দান করিতেন। প্রফুল্লমুখী বসু কার্পেটে উলের মন্দিব তৈয়ার কবিয়াছিলেন; তাহাতে ঠাকুবের, মার ও স্বামিজীব সাতখানি ফটো বসানো ছিল। মা উহা দেখিয়া, আনন্দে হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন, 'পূর্ববঙ্গের মেয়েবা বড় গুণী, বড় ভক্ত! কি চমৎকাব সব তারা তৈরি করে—বড় ভক্ত, বড় গুণী!'

নিজের জন্য পরিধেয় বস্ত্রাদির বাহুল্য শ্রীশ্রীমা পছন্দ করিতেন না; ভক্তগণেব আনীত কাপড়েব প্রায় সমস্তই সাধু, ভক্ত ও স্বজনগণের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন। তিনি সেমিজ বা জামা পরিতেন না। একবার শীতে বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া ভক্তেরা বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে জামা পরিতে সম্মত করে ও গণেন্দ্রনাথ দশটাকা দিয়া একটি সিল্কের গেঞ্জি কিনিয়া আনেন। গেঞ্জিটি পাইবামাত্র মা আনন্দ প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ গায়ে দিলেন এবং ক্রমাগত তিনদিন ব্যবহার করিয়া কহিলেন, 'বাবা, আমি তো তিনদিন প'রলুম; মেয়েমানুষ জামা প'রলে লোকে কি ব'লবে? এখন থাক্, দেশে গিয়ে প'রব।'

শ্রীশ্রীমা সঙ্গীত ভালবাসিতেন। তিনি স্বয়ং সুকণ্ঠ ছিলেন এবং কখন কখন পুরুষদেব অসাক্ষাতে মৃদু গলায় গানও করিতেন।[৩] দক্ষিণেশ্বরে

[২] কোয়ালপাড়ায় স্ত্রীশিক্ষা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: এদেশের মেয়েরা সব পশুর মতন দেখছি। আমার একএক সময় ইচ্ছা হয় এদের শিখাবার ব্যবস্থা করি; কিন্তু করি কি ক'রে? শিখাবার লোক আনতে গেলে পূর্ববঙ্গ থেকে আনতে হয়; তাতে হিতে বিপরীত ফল হবে। মানুষের স্বভাব এই যে, তারা মন্দটা আগে শিখে। তাদের অনেক সদ্‌গুণ আছে সে সব নিতে পারবে না, বাবুয়ানাটি আগে নেবে। আহা, এদেশের মেয়ে সেরকম শিক্ষিত হয়! [প্র]

[৩] রাধারাণীর নিকট হইতে প্রাপ্ত, শ্রীশ্রীমার প্রিয় একটি গান ১৫শ অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে; নিম্নে আর একটি দেওয়া হইল।

একদিন রাত্রিতে তাঁহাকে ভাসুরকন্যা লক্ষ্মীর সঙ্গে গাহিতে শুনিয়া ঠাকুর উৎসাহিত করিয়াছিলেন। জয়রামবাটীতে যাইয়া গিরিশবাবু সকলের অনুরোধে স্বরচিত দুইখানি গান গাহেন। একবাবমাত্র শুনিয়াই মা গান দুইটি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন; কোন ভক্তসন্তানের পীড়াপীড়িতে তিনি ঐ দুইটি গানের একটির কিয়দংশ গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন।[৪] [অ] ভক্তদের মুখে গান শুনিয়া কোনটি বিশেষ পছন্দ হইলে মা লিখাইয়া রাখিতেন। রাজেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহাকে 'রামকৃষ্ণচরণ-সবোজে মজরে মন-মধুপ মোর' গানটি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমার বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থের একস্থানে আছে, তিনি বলিতেছেন: মাদ্রাজের দুটি মেয়ে বিশবাইশ বছর বয়স, বিয়ে হয় নাই, নিবেদিতা স্কুলে আছে। আহা তারা সব কেমন কাজকর্ম শিখেচে! আর আমাদের? এখানে পোড়া দেশের লোকে আট বছর হ'তে-না-হ'তেই বলে, 'পরগোত্র ক'রে দাও, পরগোত্র ক'রে দাও।' মাদ্রাজের যে দুইজন মেয়ের মা প্রশংসা করিয়াছিলেন তাঁহারা শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মচারিণীই থাকিয়া গিয়াছেন, দেখা যায়। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, একাদশ কিংবা দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা কোন কোন কুমারীর অভিভাবিকাকে মা বলিয়াছেন, 'আর বড় করা ভাল নয়—এবার বিয়ের চেষ্টা গ্যাখ।' নিজের পালিতা কন্যা রাধারাণীকেও তিনি ঐরূপ বয়সেই বিবাহ দিয়াছিলেন। জোর করিয়া কন্যাকে অবিবাহিত রাখিতে যত্নশীল অভিভাবক সম্বন্ধে, এবং ঐরূপ রাখার পরিণাম সম্বন্ধেও, তিনি কঠোব মন্তব্য করিয়াছেন। প্রবৃত্তি সংযত রাখিয়া ও কাজকর্ম শিখিয়া সদ্ভাবে ও স্বাধীনভাবে ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করিতে যাহারা সমর্থ, তাহাদের চিরকুমারী-জীবন

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিন একদুয়ের মত।
তখন ছিল হাঁটুখানি জল, [এখন] যমুনা উথল, সাঁতার দিতে হবে।
এ তো ধরাধরির প্রেম নয় হে; মন মানে তো থাকবে সেথা, নইলে আসবে দ্রুত॥

৪ হামা দে পলায়, পাছু ফিরে চায়, রাণী পাছে তোলে কোলে। [জনা]

শ্রীশ্রীমার অনভিমত ছিল না এবং জোর করিয়া তাহাদিগকে সংসারী করারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

এদেশে বিধবারা ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করেন এবং প্রচলিত বিধান মানিয়া দিনবিশেষে নির্জলা উপবাস করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীমা শরীর-ক্ষয়কারী অতিরিক্ত কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহাকে কখন নিরম্বু উপবাস করিতে দেখা যায় নাই। শিবরাত্রির দিনও তিনি ঠাকুরের প্রসাদী অন্ন গ্রহণ করিতেন।[৫] একাদশীর দিন ভাত না খাইয়া লুচি খাইতেন। তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত, 'খেয়ে দেয়ে শরীরটা ঠাণ্ডা ক'রে নিয়ে ভগবানকে ডাক। না ক'রবে চুরি, না ক'রবে দারী, খাওয়া-দাওয়ায় কিছু দোষ নাই।' [ই] বাল-বিধবা শ্রীমতী শবাসনা দেবী একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করিতে যাইলে মা বলিয়াছিলেন, 'আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? আমি ব'লচি, তুই জল খা।'[৬] সুরবালা দেবী বিধবা হইয়া বাকি জীবন হবিষ্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মা বলিয়াছিলেন, 'আত্মা যদি কোন কিছু খেতে চায়, আত্মাকে দিতে হয়। না দিলে দোষ হয়, অপরাধ হয়; আত্মা কাঁদে—আমাকে দিলে না ব'লে।' [ই]

সধবার বেশে থাকিলেও শ্রীশ্রীমা মৎস্যাহার করিতেন না। তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয় অন্ধ কাকা, স্বামী ভজনানন্দের সাক্ষাতে, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুর আমাকে ব'লেছিলেন, বেদাচার মেনে চ'লো, লোকাচার মেনে চ'লো না। আমি মাছ খাই না কেন, আমার জ্ঞানী ছেলেরা সে কথা ব'লতে পারে বটে, কিন্তু আমাকে সমাজে ভাইদের সঙ্গে থাকতে হয়; আমি যদি মাছ খাই, এদের উপর অত্যাচার

---

[৫] একবার শ্রীঅন্নপূর্ণা পূজায় কিরণবাবুদের বাড়ীতে আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীশ্রীমা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, 'অন্নপ্রসাদ না খেলে আমার শরীর ভাল থাকে না, তোমরা সেদিন ঠাকুরকে অন্নভোগ দেবার ব্যবস্থা ক'রবে।' তিনি ঠাকুরের অন্নপ্রসাদ ও অন্নপূর্ণার পাকাপ্রসাদ একত্র গ্রহণ করেন।

[৬] শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, লক্ষীর একাদশী শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'আমি শাস্ত্রের পার, খুব খাবে; আর থান ধুতি, যেন রাক্ষুসে বেশ।' [নি]

হবে।' একবার কালীঘাটে মা-কালীর প্রসাদ পাইতে বসিয়া একটু চচ্চড়ি মুখে করিয়াই মা বুঝিয়াছিলেন, তাহাতে মাছের মুড়া দেওয়া আছে। তিনি চচ্চড়ির বাটিটা সরাইয়া রাখিলেন, কিন্তু হাত বা মুখ ধুইলেন না। [গ] শেষবার অসুখের সময় মাকে মাগুর-মাছের ঝোল দেওয়া হইয়াছিল; তিনদিন খাওয়ার পর তিনি আর খাইতে অসম্মত হন।

বাল-বিধবা প্রমীলা বসুকে প্রথম সাক্ষাতের দিন শ্রীশ্রীমা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন,—'সতী হও মা।' সময়ান্তরে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন, 'বেশ ঠাণ্ডা মেয়েটি। অবীরা বিধবা, অনেকদিন বাঁচতে হবে — ওকে শ্বশুরবাড়ী থেকে নিয়ে যেও না।'

* * * *

স্বয়ং পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হইয়াও চিরকাল শ্রীশ্রীমা বাহিরের পুরুষ-মানুষের কাছে কুলবধূর মত অবগুণ্ঠনবতী থাকিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। বাহিরের পুরুষেরা তাঁহাকে দর্শন অথবা প্রণাম করিতে যাইয়া তাঁহার চরণদ্বয় ব্যতীত আর কোন অঙ্গই দেখিতে পায় নাই। এমন কি, ঠাকুরের সময়কার যেসকল ত্যাগী বা গৃহী পুরুষ-ভক্তের সম্মুখে আসিতে তিনি পূর্ব হইতেই অভ্যস্ত ছিলেন না, তাঁহাদের নিকটেও চিরকাল ঐরূপ অবগুণ্ঠনবতী থাকিয়া গিয়াছেন; ঐশ্বরিকভাবে আবিষ্ট হইয়া কদাচিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী কালের ভক্ত যাঁহারা তাঁহাকে মাতৃজ্ঞান করিয়া মাতৃদর্শনে আসিতেন, বিশেষতঃ যাঁহারা তাঁহার মন্ত্রদীক্ষিত সন্তান, তাঁহাদের সম্মুখে তিনি কখনো অবগুণ্ঠনবতী থাকেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, আপনি কি সকলের সামনে বের হন না?' মা বলিলেন, 'বাবা, যাদের মনে পুরুষ-ভাব প্রবল, আমি কেবল তাদের সামনে বেশীক্ষণ থাকতে পারি না।'

কলিকাতায় একদিন সুরেনবাবু ও তাঁহার পরিবারের সঙ্গে শ্রীশ্রীমা কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ষোলসতর বছরের যুবক তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিল। তাহাকে দেখিয়াই মা ঘোমটা টানিয়া দিলেন এবং সে বিলম্ব করিতেছে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, 'তুমি এখন এস—দেখচ না, বৌমা এখানে রয়েচে!' সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় হ্যারিসন রোডে

মেসে বসিয়া সঙ্গীদের সাথে কখন কখন মার কথা আলাপ করিতেন। একদিন মা তাঁহাকে বলিলেন, 'মেসে ব'সে মেয়েলোকের কথা আলাপ করিস কেন?'

চালচলনে ও আচরণে স্ত্রীলোকের নির্লজ্জ ভাব শ্রীশ্রীমা কোন কালে সমর্থন করেন নাই। মেয়েদের আবরু রক্ষা করা তিনি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিতেন। ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনীকে লোকসমক্ষে গঙ্গায় একবুক জলে দাঁড়াইয়া জপ করিতে দেখিয়া তিনি তিরস্কার করিয়াছিলেন। রাধুকে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় উঠাইয়া বসিতে দেখিয়াও অনুরূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন। হাসিতে হাসিতে মা একদিন তাঁহার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতে উদ্যত কোন ভক্ত-বধূকে বলিয়াছিলেনঃ বৌমা, নাই বা স্নান ক'ত্তে গেলে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিবে গায়; পুরুষগুলো হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে, যেন তাদের সমাধি হ'য়ে যায়! [বি]

একটা বয়স পর্যন্ত, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সঙ্গে ব্যবহারে ও মেলামেশায় স্ত্রীলোককে ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, মন্দচরিত্র স্ত্রীলোক হইতেও দূরে থাকিতে হয়। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন যে, দক্ষিণেশ্বরে এক সময়ে ভাসুরপুত্র রামলালকেও ঠাকুর তাঁহার কাছে বেশী যাইতে দিতেন না। পূর্বজীবনে বেশ্যা এক বৃদ্ধা শেষজীবনে হরিনাম করিত; সে কখন কখন দক্ষিণেশ্বরে মার কাছে বসিয়া হরিকথা আলাপ করিত। একদিন ঠাকুর দেখিতে পাইয়া ঐরূপ লোকের সঙ্গে কথা কহিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন। কোয়ালপাড়ায় দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর কমলা ঘোষ অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে বসিয়া আছেন এমন সময় একজন আসিয়া বলিল, 'অমুকের মেয়েকে বার ক'রে নিয়ে গেছে।' বিষয়টি নিয়া আলোচনা চলিয়াছেঃ পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইয়াই মা কমলাকে লক্ষ্য করিয়া ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন, 'বৌমা, ওখানে কি ক'চ্চ?'

আপন পুত্রও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জননী তাহার সঙ্গে বাৎসল্যসুলভ দৈহিক মাখামাখি পরিত্যাগ করেন। ইহাতে বাৎসল্যের অভাব বুঝায় না। স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ একদিন শ্রীশ্রীমাকে বলেন, 'মা, আপনি রাধুকে ভালবাসেন, আমাদের ভালবাসেন না।' মা ঈষৎ হাসিয়া সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তর

দেন, 'সত্যিই তোমাদের ভালবাসি।' 'তা হলে এমন করে দিন যাতে ষোল আনা মন আপনার দিকেই যায়।'—তাঁহার এই প্রার্থনার উত্তরে মা বলিয়াছিলেন, 'বাবা, এ যে মানুষের ছাল।'

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় দেখিতে পাই, কোন শিষ্যাকে শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন, 'ছাখ মা, পুরুষ-জাতকে কখন বিশ্বাস কোরো না—অপরের কথা কি, নিজের বাপকেও না, ভাইকেও না ; এমন কি স্বয়ং ভগবান যদি পুরুষরূপ ধারণ ক'রে তোমার সামনে আসেন, তাঁকেও বিশ্বাস কোরো না।' যাহাকে মা ঐরূপে সাবধান করিয়াছিলেন, আমরা যতদূর শুনিয়াছি, তিনি প্রথম-বয়সে বিধবা, রূপবতী, এবং সর্বোপরি, স্বামি-পরিত্যক্ত বহু সম্পত্তির অধিকারিণী। ঐরূপ অবস্থাপন্ন অবলার যে পিতা বা সহোদরের নিকট হইতেও সাবধানতার প্রয়োজন আছে, বিশেষতঃ যদি তদুপরি নিজের অতৃপ্ত বাসনার প্রাবল্য থাকে, বাস্তব জগতের ঘটনা ইহা অস্বীকার করে না। ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই যে মার এই সাবধান-বাণী, তাহা ঐ স্ত্রী-ভক্তটির প্রতি তাঁহার অন্যান্য উপদেশ হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়। মা তাঁহাকে বলিতেছেন, 'দেখো, যেন আমায় ডুবিও না, শিষ্যের পাপে গুরুকে ভুগতে হয়।' 'কারো সঙ্গে মিশবে না—কোন কিছুতেই থাকবে না।' 'ঘড়ীর কাঁটার মতন ইষ্টমন্ত্র জপ ক'রবে।' আবার, 'ভগবান যদি পুরুষরূপ ধারণ ক'রে তোমার সামনে আসেন তাঁকেও বিশ্বাস কোরো না'—এই বাক্যেও পরম পুরুষ হইতে সতর্কতা অবলম্বন অভিপ্রেত নহে। এই স্ত্রী-ভক্তটিকেই মা পুরুষদেহী ঠাকুরের সেবা-পূজা-ধ্যান করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। পুরুষ-মানুষে ঈশ্বরবুদ্ধি আরোপ করিয়া ও নিকটতরভাবে মেলামেশা করিতে যাইয়া, প্রবৃত্তির ছলনায় অনেক নারী যে প্রতারিতা হন, তাঁহাদের 'বাৎসল্য' যে 'তাচ্ছল্যে' রূপান্তরিত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল নহে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পুরুষ-ভক্তকেও মা বলিয়াছেন, 'মেয়েমানুষকে কখন বিশ্বাস ক'রবে না, মেয়েমানুষ সব ক'ত্তে পারে।' [আ]

৺কাশীতে নববধূ অমিয়বালা ঘোষ ঠাকুরের মানসপুত্র ব্রহ্মানন্দ-মহারাজকে দর্শন করিতে যাইবেন কি-না, কথা হওয়ায় শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'রাখালকে দেখবে না? রাখালকে দেখে মানব-জন্ম সার্থক করুক।'

স্বভাবতঃ সতীলক্ষ্মী, কিংবা সাংসারিক কামনায় উদাসীন, দেবচরিত্রা নারীর দর্শনে মানুষের মন পবিত্রভাবে পূর্ণ হয়, শ্রদ্ধায় অবনত হয়। সর্বাবস্থায় তাঁহারা নিজেদের মহিমাতেই নিজেরা সুরক্ষিত থাকেন এবং একটা পবিত্রতাময় আবহাওয়া বিস্তার করিয়া সংসারে বিচরণ করেন। সভ্যসমাজে তাঁহাদিগের প্রতিপদে সাবধান থাকিবার প্রয়োজন হয় না। আদর্শ-রক্ষার খাতিরে লোকাচার মান্য করিয়া চলা সকলের কর্তব্য হইলেও, দেশকালপাত্র-ভেদে কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইতে পারে ও হইয়া থাকে। তাহাতে মহাভাবত অশুদ্ধ হয় না। পুরুষ-ভক্তেরা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিতেছেন শুনিয়া শ্রীমতী সুখবালা ঘোষ অন্যান্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে সেখান হইতে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম করিলে, মা বলিয়াছিলেন, 'তোমাকে যেতে হবে না, তুমি থাক।' ঠিক তেমনি আবার মা তাঁহার কোন যুবক-সন্তান সম্বন্ধে স্ত্রী-ভক্তদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, 'তোমরা এর কাছে কোন সঙ্কোচলজ্জা কোরো না ; একে তোমাদেরই একজন মনে ক'রবে।'

স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর মেলামেশার সমস্যা আজিকার জগতে, বিশেষতঃ ভারতে, অন্যতম প্রধান সমস্যা। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণজাত অবাধ মেলামেশা ও তথাকথিত স্ত্রী-স্বাধীনতা যে ভারতের ধর্মমূলক সভ্যতার পরিপন্থী, এবং অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইলে উহাকে সমূলে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। শ্রীশ্রীমার জীবনে কিংবা উপদেশে এই জাতীয় স্বাধীনতার সমর্থন পাওয়া যায় না।

*   *   *   *

দুর্বলতাময় মানুষের জীবনে, প্রলুব্ধ হওয়ার সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে, নৈতিক বিচ্যুতি সহজেই ঘটিতে পারে। উহা পুরুষের বেলায় যেমন, নারীর বেলায়ও তেমনি ঘটে এবং সামাজিক দৃষ্টিতে উভয়স্থলেই নিন্দার্হ বিবেচিত হয়। তথাপি, সমষ্টি-সমাজের উচ্চতম আদর্শের রক্ষা ও অভিব্যক্তির বিশেষভাবে পরিপন্থী বলিয়াই বোধ হয়, পুরুষ অপেক্ষা নারীর নৈতিক বিচ্যুতি অধিকতর দূষণীয় বিবেচিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীমাও এই ভাবের সমর্থন করিয়াছেন। কোন ভক্তের সাময়িক বিচ্যুতির কথায় মা বলিয়াছিলেন, 'কিই বা হ'য়েচে? বেটা-ছেলে, মেয়ে তো নয়? মেয়েদের

হ'লে দোষ। বেটা-ছেলের অমন হয়—কত বড় বড় মহর্ষি প'ড়ে গেল !'

নারীর নৈতিক বিচ্যুতি দোষের বলিয়া মন্তব্য করিলেও শ্রীশ্রীমা পতিতার প্রতি অকরুণ ছিলেন না। যেমন পাপকর্ম করিয়া অনুতপ্ত পুরুষকে, তেমনি অনুতপ্তা নারীকেও তিনি সমভাবে শ্রীপদে স্থান দিয়াছেন। শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে 'শ্রীম' বলিয়াছিলেন ঃ হাঁড়ির ভাত একটি টিপলেই বুঝতে পারা যায় হয়েচে কি-না। মা-ঠাকরুণের একটি কথাতেই বুঝতে পারা যায় তিনি কে ছিলেন। তাঁর কাছে বেশ্যারা আসত বলে সাধুরা তাদের বারণ করেছিল। মা শুনে বলেছিলেন, 'ওদের যদি আসতে না দাও আমি এখানে থাকব না। ঠাকুর কি এবার শুধু রসগোল্লা খেতেই এসেছিলেন ?'

শ্রীশ্রীমা সকলকেই, বিশেষভাবে স্ত্রীলোককে, কাজ ছাড়া এক মুহূর্তও বসিয়া থাকিতে নিষেধ করিয়াছেন। সর্বদা কর্মে লিপ্ত থাকিলে মনের সমতা রক্ষিত হয়, আর কর্মের দ্বারা কর্মের বন্ধন কাটে। তাঁহার কোন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে মা বলিয়াছিলেন, 'কর্ম লক্ষ্মী।' একদিন শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীকে মা বলিলেন, 'মেয়েমানুষের কাজই লক্ষ্মী। আমার মা ব'লতেন, যে খুব ভাল ক'রে রেঁধেবেড়ে লোকজনকে খাওয়ায় তার ঘরে মা অন্নপূর্ণা অচলা হ'য়ে অবস্থান করেন। আমার মা লোকজনকে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন।' রাজলক্ষ্মী কহিলেন, 'তাই বুঝি মা তুমি এসেছিলে তাঁর ঘরে ?' মৃদু হাসিয়া মা বলিলেন, 'আমি কে মা, ঠাকুরই সব।'

নিজে সুচরিতা হইলেও, স্বামীর দুশ্চরিত্র ও অতিমাত্রায় দুর্ব্যবহারের জন্য পতিনিষ্ঠ থাকিয়া জীবন-যাপন অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। ঐরূপ অবস্থাপন্ন কোন স্ত্রীলোকের সকল কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'তোদের মানুষ-স্বামী। দুটি পেটের ভাতের জন্যে তো ? এখানে কি দুটি ভাত মিলে না ?'. স্বামী কর্তৃক নিপীড়িতা অথবা পরিত্যক্তা, বালবিধবা এবং কোন কারণে যাহার বিবাহ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এরূপ কুমারী—ইহারা সকলেই যাহাতে লেখাপড়া ও কাজকর্ম শিখিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে এবং মানুষের পরিবর্তে ভগবানকেই জীবনের

অবলম্বনস্বরূপ করিতে পারে সেই দিকে মার লক্ষ্য ছিল, যত্ন ছিল এবং তিনি সেই ভাবের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

প্রফুল্লমুখী বসু লিখিতেছেন: ১৩২১ সালের ৺বোধনপঞ্চমীর দিন শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি। মা আমাকে তাঁহার নিকটে বসিতে বলিলেন। জানি না, কেন তখন আমার সমস্ত প্রাণ আকুল করিয়া চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। তখন আমাকে বিধবা বলিয়া চেনা সহজ ছিল না—চওড়া পাড়ের শাড়ী, গহনা সবই পরা ছিল। মাথার কাপড় টানা, কাজেই সিন্দূরহীন সিঁথি দেখিবার উপায় ছিল না। মা কিন্তু প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, তোর স্বামী নাই?' আশৈশব সকলের আদরে পালিত হইয়াছি, তথাপি আমার মনে হইয়াছিল অমন স্নেহমাখা কথা কখন শুনি নাই। চেষ্টা করিয়াও একটি কথা কহিতে পারিলাম না। মা আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, 'ভয় কি মা, তোমাদের ঠাকুর আছেন; তিনি দেখবেন। তিনিই তোমাদের শান্তি দেবেন, আনন্দ দেবেন। তোমাদের দ্বারা তিনি অনেক কাজ করাবেন। কোন ভয় নাই মা, কোন ভাবনা নাই মা।'

শ্রীমতী প্রমীলাবালা বসু লিখিতেছেন: শ্রীশ্রীমা যখন ৺কাশীতে ছিলেন, আমি জব্বলপুর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই। একদিন মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, তুমি যে এখানে এলে, টাকাপয়সা কোথা থেকে পেলে?' আমি বলিলাম, 'আমি ভাইদের সংসারে খরচপত্র করি, তা থেকে মাঝে মাঝে কিছু বাচে।...' মা বলিলেন, 'ভাইরা নিজেদের সংসারের মত টাকা দেয়, তা থেকে বাঁচাবার চেষ্টা আর কোরো না। তা হ'লে আরো সংসারে আসক্তি বেড়ে যাবে। তাদের খরচার টাকা থেকে বাঁচালে তাদের বঞ্চিত করা হয়।'

"আমার একটি ছোট ভগিনী মারা যাওয়ার পর তাহার একটি শিশু-কন্যাকে নিজের কাছে রাখিয়া লালনপালন করিতেছিলাম। ইহা জানিতে পারিয়া মা আমাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 'আমাকে দেখেও কি তোমার চৈতন্য হ'ল' না? আমি রাধুকে নিয়ে কি কষ্টে প'ড়েচি, তা তো দেখচ!'"

* * * *

পতিব্রতা নারীর জীবন সংসারে সর্বমঙ্গলের আকর-স্বরূপ। 'তোমার

নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী'—শ্রীবিবেকানন্দের স্বহস্ত-লিখিত এই বাক্যে যে তিনজন মহীয়সী নারীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা তিনজনেই পাতিব্রত্যের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জনৈক ভক্ত একসময়ে সংসার হইতে মনকে সরাইয়া ভগবন্মুখী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার ধারণা জন্মে যে, সর্ববিষয়ে তাঁহার মুখাপেক্ষিণী পত্নীই ইহার প্রধান বিঘ্নস্বরূপ। স্ত্রীর সর্বদা 'ঠেস্ দিয়া থাকা'র ভাবটি দূর করিবার জন্য তিনি নানা উপায়ে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই বুঝিলেন না দেখিয়া একদিন তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'আচ্ছা, তুমি আমাকে চাও, না ভগবানকে চাও ?' একথায় স্ত্রী নিরুত্তর হইলেন এবং মনের সন্দেহ দূর করিবার জন্য জয়রামবাটীতে গিয়া মার কাছে সকল কথা নিবেদন করিলেন। তিনি স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই শুনিয়া মা সস্নেহে কহিলেন, 'কেন মা, তুমি কেন ব'লতে পার নি ? তোমার বলা উচিত ছিল, আমি ভগবানকে চাই না , আমি তোমাকেই চাই।'

দীর্ঘকালব্যাপী অশেষবিধ কষ্টের মধ্যেও সর্বপ্রকার আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া যাহারা স্বীয় পতির সেবায় অবহিতা ও পতিতে অনুরক্তা, তাহাদিগকে শ্রীশ্রীমা বিশেষভাবে স্নেহ করিতেন ; অযাচিতভাবে তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতেন এবং আদর্শে অবিচলিত থাকিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। আপন সংসারের কথা মুখে কিছুমাত্র প্রকাশ না করিলেও, শ্রীমতী অশ্রুমতী সেনকে মা বলিয়াছিলেন, 'স্বামীর সঙ্গে গাছতলাও রাজ-অট্টালিকা।' আর স্ত্রীর প্রতি বিরাগসম্পন্ন তাহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, 'স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থেকো ; দুজনে যেখানেই থাক, সেইখানেই রামরাজ্য।'

পীতাম্বর নাথ বলেন : আমার শ্বশুর সঙ্গতিপন্ন লোক। তিনি কৌশলে নিজের মেয়েকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার দ্বারা ইচ্ছানুরূপ কাজ করাইতে না পারিয়া নানাপ্রকারে আমার অনিষ্টচেষ্টা করিতে থাকেন। দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাঁহার কন্যাকে নিয়া আর সংসার করিব না। কোন নারী-আশ্রমে রাখিয়া দিবার জন্য স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলাম ও গঙ্গায় স্নান করিতে গেলাম। স্নান করিয়া যেমন গঙ্গায় পুষ্পাঞ্জলি দিতে যাইব, দেখিলাম, পাশের ঘাটে

শ্রীশ্রীমা স্নানান্তে কাপড় ছাড়িতেছেন। পুষ্পাঞ্জলি আর গঙ্গায় না দিয়া মার পাদপদ্মে দিতেই তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'এখানে নয় বাছা. লোকে কি মনে ক'রবে? ঘরে এস।' স্ত্রীকে ঘাটে বসাইয়া রাখিয়া মার বাড়ীতে গেলাম। প্রণাম করিতেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সঙ্গে আর কে আছে?' আমি বলিলাম, 'স্ত্রী।' মা বলিলেন, 'তাকে কেন আন নি? যাও, এখুনি নিয়ে এস।' মার কাছে স্ত্রীকে পৌঁছাইয়া দিয়া তাঁহার আদেশে নীচে নামিয়া গেলাম। অনেকক্ষণ পরে উপরে যাইয়া দেখি, স্ত্রী তাঁহাব চরণ ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেছে আর মা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতেছেন। আমাকে মা বলিলেন, 'ওর কোনো দোষ নাই, ও আমাকে সব ব'লেচে। তুমিও জান না, ওর বাবা তোমাকে মারবার জন্যে কি ষড়যন্ত্রই না ক'রেছিল। ও তা ক'ত্তে দেয় নি। তোমার ধর্মপত্নী, ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে সংসার কর।' তারপরে স্ত্রীকে বলিলেন, 'দ্যাখ মা, স্ত্রীর কাছে স্বামী সকলের চেয়ে বড়—তুমি তার সেবা কোরো।' পুনরায় মা আমাকে বলিলেন, 'ও যদি তোমার কাছে কোনো দোষ করে, তুমি নিজে তার বিচার না ক'রে আমাকে জানাবে।'

গার্হস্থ্য-জীবন শত ঝঞ্চাটে পূর্ণ। কিন্তু ইহার মধ্যেই কোনরূপে একটু অবসর করিয়া লইয়া যে ভগবানকে ডাকিতে পারে, ভগবান তাহার উপব অত্যন্ত প্রসন্ন হন। শ্রীমতী সুগন্ধাবালা দেবীকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'যারা সংসারে একধারে স্বামী আর একধারে ছেলে নিয়ে থেকে, তাদের সেবা ক'রেও ঠাকুরকে ডাকতে পারে, তারা নিশ্চয়ই ঠাকুরকে পাবে—তাদের বরং শীঘ্রি হবে।' কমলা ঘোষকে বলিয়াছিলেন, 'কারো কাছে কিছু চেয়ো না—বাপের কাছে তো নয়ই, স্বামীর কাছেও নয়। লোকের দেওয়া জিনিষ কি থাকে গো? ঠাকুর যখন দেবেন তখন রাখবার জায়গা পাবে না—ঠাকুরের দেওয়া জিনিষ ফুরতে জানে না। যে চায় সে পায় না, যে চায় না সে পায়। তুমি কারু কাছে কিছু চেয়ো না।'

ক্ষুদ্রবৃহৎ সমুদয় কার্যেই শ্রীশ্রীমা স্ত্রীলোকের শিষ্টাচার মান্য করিয়া চলিতেন। বিভূতিবাবু বলেন: কোয়ালপাড়ায় একদিন মা মঠ হইতে জগদম্বা-আশ্রমে যাইবেন; আমি পেছনে যাইতেছিলাম, বলিলেন, 'আগে

যাও।' তিনি পেছনে পেছনে আসিলেন। হাওড়া-ষ্টেশনে একদিন মা গাড়ী হইতে নামিবেন; ডান পা বাড়াইয়াছেন মাত্র, অমনি সংশোধন করিয়া লইলেন—ডান পা পিছাইয়া দিয়া বাম পা বাড়াইলেন।

ষড়্বিংশ অধ্যায়

গৃহীর আদর্শ

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা উভয়েরই জীবন একই ঐশ্বরিক ভাবে ভাবিত হইলেও উহার বাহ্য অভিব্যক্তিতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ লক্ষিত হয়ঃ ঠাকুরের জীবন সন্ন্যাস-ভাব-প্রধান; মার জীবন গার্হস্থ্যভাব-প্রধান। প্রমাণ-স্বরূপ, ঠাকুরের আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও, নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লিখিত হইতে পারে ঃ

(১) ঠাকুর পরিণত জীবনের অধিকাংশ সময় আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে দেবমন্দিরে অতিবাহিত করিয়াছেন; মা জীবনের অধিকাংশ সময় আত্মীয়স্বজনকে লইয়া পিত্রালয়ে বাস করিয়াছেন।

(২) মুদ্রাস্পর্শে ঠাকুরের হাত বাঁকিয়া যাইত ও তিনি শরীরে যন্ত্রণা-বোধ করিতেন; মা টাকা বাক্সে রাখিবার সময় মাথায় স্পর্শ করাইতেন এবং বাক্স হইতে বাহির করিয়া দিবার সময়ও তদ্রূপ করিতেন। অথচ, ঠাকুরের ন্যায় তাঁহারও অর্থের উপর বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। টাকা মস্তকে ঠেকাইবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া মা বলিয়াছিলেন, 'বাবা, লক্ষ্মী!'

(৩) জগৎকল্যাণে নিম্নভূমিতে মন রাখিবার জন্য ঠাকুর 'তামাক খাব', 'জল খাব' ইত্যাদি তুচ্ছ বাসনা অবলম্বন করিতেন; মা তজ্জন্য একটি কন্যা প্রতিপালন করিয়া, আপাতদৃষ্টিতে আসক্তির সহিত দিবারাত্র তাহার যত্ন করিয়াছেন।

এই সকল কারণে, ঠাকুরের জীবন হইতে সন্ন্যাসীরা এবং শ্রীশ্রীমার জীবন হইতে গৃহস্থেরা যে সমধিক শিক্ষা লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামী কেশবানন্দ প্রমুখ ভক্তগণকে স্বামী প্রেমানন্দ বলিয়াছিলেন,

'তোমরা দেখে তো এলে, রাজরাজেশ্বরী সাধ করে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর-নিকুচ্চেন, বাসন মাজচেন, চাল ঝাড়চেন, এমন কি, ভক্তছেলেদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করচেন! মা জয়রামবাটীতে থেকে অত কষ্ট করচেন, গৃহীদের গার্হস্থ্য-ধর্ম শেখাবার জন্যে। অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা, সর্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য!'

নিজে গৃহস্থের ভাবে ভাবিত ছিলেন বলিয়াই শ্রীশ্রীমা সন্ন্যাসীকে গৃহস্থের দেয় শ্রদ্ধা ও সম্মান বিশেষভাবে দান করিতেন। সন্ন্যাস দান করিয়া তাঁহার নিজেরই কোন শিষ-সন্তানকে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়াছিলেন। জয়রামবাটীতে একদিন স্বামী সারদানন্দ আহারের পর আসন ত্যাগ করিলে মা সেই আসনখানি উঠাইয়া বারবার মাথায় ঠেকাইতে লাগিলেন। নলিনবাবু বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিয়াছিলেন,'কত ভাগ্যে গিরস্তের দরজায় সাধুর পায়ের ধূলো পড়ে! সাধুর আসন তো মাথায়ই রাখতে হয়। আমরা গৃহী, আমাদের এই তো ধর্ম।'

একদিন স্নানের সময় কৃষ্ণলাল-মহারাজ আসিয়া বলিলেন, 'মা, গঙ্গা নাইতে যাবে কি?' শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 'আজ যাবার ইচ্ছা নাই।' সেদিন কি একটা পর্ব ছিল, খানিক পরে গোলাপ-মা আসিয়া বলাতে মা গঙ্গায় যাইতে প্রস্তুত হইয়াই বলিলেন, 'ওমা, কি হবে গো, সাধুর কাছে মিছে কথা হল'—কেষ্টলালকে ব'ল্লুম, যাব না।' মেয়েরা কহিলেন, 'তা তোমার আর কি হবে তাতে? 'সে কি মা, তা কি হয়?'[১]

য—বলেন: একদিন শ্রীশ্রীমাকে বলিলাম, 'যাঁরা ঠাকুরের কৃপা পেয়েচেন, গৃহস্থই হউন আর সন্ন্যাসীই হউন, তাঁরা তো সকলেই সমান—সকলেরই তো একই গতি হবে?' মা জোরে উত্তর দিলেন, 'সে কি ব'লচ? তা কি কখন হয়? দেখতে পাচ্চ না, আমি এদের সব নিয়ে আছি ব'লে তাঁকে ডাকবার সময় পাচ্চি না? সন্ন্যাসীতে গিরস্তে আকাশ-পাতাল তফাৎ। গেরুয়া প'রেচে, সংসার ছেড়েচে, ভগবানের জন্যে; আর এরা সব নিয়ে আছে ব'লে ভগবানের দিকে মন দিতেই সময় পায় না।'

---

[১] শ্রীমতী সরযূবালা সেনগুপ্ত হইতে প্রাপ্ত।

"তীর্থ ঘুরিয়া মাকে দর্শন করিতে গিয়াছি ঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোন্ কোন্ জায়গা ঘুরে এলে ?' আমি বলিলাম, 'কেদার-বদরী, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী এই সব।' মা তীর্থের উদ্দেশে বারবার জোড়হাতে প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'আহা পুণ্যতীর্থ সব! সাধু কি কম গা? কত সব জায়গা ঘুরে! যেখানে যেখানে গিয়েচ, আমাকে এক এক অঞ্জলি জল দিয়েচ তো? যেখানে যেখানে যাও, আমাকে তিনতিন অঞ্জলি জল দিও।'

"তখন আমার পৈতায় একটি দ্বিমুখী রুদ্রাক্ষ ছিল। মা পূর্বে আমাকে উহা ধারণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এখন বিরজাহোম করিবার আদেশ দেওয়ায় বলিলাম, 'এটি কি আর রাখব?' 'তাই তো, সন্ন্যাসী!'—বলিয়া মা চুপ করিয়া রহিলেন। আমি তখন উহা গলা হইতে খুলিয়া পাদপদ্মে অর্পণ করিতেই বাধাসূচক 'হাঁ হাঁ'—উচ্চারণ করিয়া দুইহাতে তুলিয়া নিজের মস্তকে বারবার স্পর্শ করাইলেন এবং পূজার সিংহাসনে রাখিয়া বলিলেন, 'আহা, কত তীর্থ হ'য়েচে, সাধুর গলার জিনিয!' তারপর রাধুকে বলিলেন, 'রাধু, আয় তো, তোর দাদাকে প্রণাম কর্।' 'মা, সে কি, সে কি' বলিয়া আমি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বলিলেন, 'দাঁড়াও। (রাধুব প্রতি) সাধু তীর্থ ক'রে এসেচে, প্রণাম কর্; তোর সব দুঃখ দূর হ'য়ে যাবে।' আমাকে বলিলেন, 'বাবা, আশীর্বাদ কর, রাধুব যেন সব দুঃখ চ'লে যায়!'"

শ্রীশ্রীমা প্রকৃত সাধুকে এইরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিলেও, গৈরিকের অভিমানে স্ফীত হইয়া যদি কেহ কথায় বা আচরণে গৃহস্থ-ভক্তের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিত, তবে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন। ঐরূপ কোন গৈরিকধারীর কথায় প্রবোধবাবুকে বলিয়াছিলেন, 'বামুনের ছেলে সন্ন্যাসী হ'লে হাতীর দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধান হয়; আর সন্ন্যাসীর রাগ অভিমান থাকলে বেতের রেক [চাল মাপিবার পাত্রবিশেষ] চামড়া দিয়ে বাঁধান হয়।' মঠে একবার কড়াকড়ি নিয়ম হয় যে, গৃহস্থ ভক্তেরা সাধুদের বিছানায় শুইবে না। অক্ষয়কুমার সেন মহাশয় স্বামী বোধানন্দের বালিশ ব্যবহার করায় সেই বালিশ গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হয়; তাহা শুনিয়া মা অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। [গ]

যাহা হউক, শ্রীশ্রীমা প্রকৃত সাধুকে নিজের সাধ্যমত সেবা করিয়াছেন, সেবা করিতে অন্যকে প্রেরণা দিয়াছেন এবং ঐরূপ সেবার মহৎ ফলও কীর্তন করিয়াছেন। ঠাকুর স্থূলদেহে অপ্রকট হইলে জনৈক উৎকল-দেশীয় বৃদ্ধ সাধু কামারপুকুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। মা গ্রামবাসিগণের সাহায্যে তাঁহার জন্য কুটীর নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, স্বয়ং তাঁহার ডাল, চাউল ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাইতেন এবং সকাল-সন্ধ্যায় কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন। অল্পদিন পরে সাধুটি ঐ কুটীরেই দেহরক্ষা করেন। চন্দ্রমোহন দত্ত একদিন মাকে প্রণাম করিয়া বলেন, 'মা, আপনার পায়ে আমার হাতখানা বুলিয়ে দি।' তাহাতে মা উত্তর দেন, 'আমার পায়ে হাত বুলতে হবে না। আমার শরতের পায়ে হাত বুললেই আমার পায়ে হাত বুলন হবে। যে আমার শরতের পায়খানা সাফ ক'রবে, তার ব্রহ্মজ্ঞান হবে।' মার কথায় চন্দ্রবাবু কিছুদিন যাবৎ সারদানন্দ-মহারাজের পদসেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। মাতঙ্গিনী নামে জনৈক স্ত্রীলোক একদিন মাকে বলিয়াছিলেন, 'মা, এরা—বিভূতি, বশী আর টাবু গুপ্ত-মহারাজের কি সেবাটাই করেচে!' তাহা শুনিয়া মা বলেন, 'এরা গুপ্তর সেবা ক'রেচে, এদের আবার তপস্যা কি!'

শ্রীশ্রীমা ব্রাহ্মণকেও তাঁহার প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। জয়রামবাটীতে ৺বিজয়া দশমীর রাত্রে সিন্ধুনাথ পাণ্ডা ও এক মোটা গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ একসঙ্গে খাইতে বসিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণকে মা খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া খাওয়াইলেন। নিজের উচ্ছিষ্ট পাতা গুটাইয়া লইয়া সিন্ধুবাবু ঐ ব্রাহ্মণকেও তদ্রূপ করিতে আদেশ করিলে মা বাধা দিয়া বলিলেন,'না বাবা, ব্রাহ্মণ উনি,ওঁকে একথা ব'লতে আছে? (ব্রাহ্মণের প্রতি সবিনয়ে) আপনি মুখ ধুনগে।' নিজের বসন্ত-রোগের সময় চিকিৎসাকারী শীতলার ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া মা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেন। কেহ ঐ ব্রাহ্মণের চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া পদধূলি গ্রহণে আপত্তি জানাইলে বলিয়াছিলেন, 'হাজার হোক, ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলো নেওয়াই উচিত।' [আ]

শ্রীশ্রীমা বিশেষ বিজ্ঞ ব্যক্তিকে উপযুক্ত মান দান করিতেন এবং তদ্রূপ

করিতে অন্যকেও শিখাইতেন। তাঁহার আদেশে রাধারাণী কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়কে প্রণাম করিয়াছিল।

চারুবালা দেবী বলেনঃ ১৩১৯ সালে বড়দিনের ছুটিতে আমরা ৺কাশীতে গিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমার জন্মতিথির দিন আমি ও সর্বমঙ্গলা দেবী ভানুপিসীকে প্রণাম করিয়াছি শুনিয়াই গোলাপ-মা চটিয়া বলিলেন, 'এদের অল্প বয়সে, ভক্তি ছ্যাখ! ব্রাহ্মণ হয়ে গয়লার মেয়েকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা! অমন করলে এদের অহঙ্কার হয়—ধরাকে সরা জ্ঞান করে।' একথা মা শুনিতে পাইলেন এবং আমাদিগকে ডাকাইয়া গোলাপ-মার সম্মুখেই বলিলেন, 'গোলাপের কাণ্ড ছ্যাখ! উৎসবের দিন, সকলে আনন্দ ক'রবে, ও কি-না মনে কষ্ট দিচ্চে! তোমরা কিছু মনে কোরো না মা, ভক্ত-ভাবে সকলকেই প্রণাম করা যায়—তাতে দোষ নাই।'

* * * *

জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "মার পথের সঞ্চয় ক'রবার সাহায্য ক'ত্তে পার, তবেই তো ঠিকঠিক ছেলের কাজ ক'ল্লে। তাঁর বুকের রক্ত খেয়ে যে এত বড় হ'য়েচ—কত কষ্ট ক'রে তোমাকে মানুষ ক'রেচেন! তাঁর সেবা করা তোমার সব চেয়ে বড় ধর্ম জানবে।"[২]

মাখনলাল দত্তকে শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সংসারে কে আছে? বিয়ে হ'য়েচে কি?' তিনি বলিলেন, 'বাবা আছেন, মা নাই; বিয়ে হয় নাই।' মা বলিলেন, 'তোমার এখন সন্নাসী হওয়া চলবে না, বুড়ো বাপের সেবা ক'ত্তে হবে। বিয়ে না ক'রে থাকতে পাল্লে ঘরে থেকেও সন্ন্যাসী।'

* * * *

কালীকুমার অতি অল্প বয়সে ছেলেদের বিবাহ দেন। ভূদেবের তের বৎসর এবং রাধারমণের এগার বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। রাধারমণের বিবাহ সম্বন্ধে কলিকাতায় মার কাছে যে পত্র যায় সেই পত্র শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'পোড়ারমুখো ছোট ছোট ছেলের বিয়ে দিচ্চে, আমার ঠিঁয়ে আদায় ক'রে নিচ্চে। আখেরে যে কষ্ট পাবে তা জানে না।' [ই]

[২] শ্রীশ্রীমায়ের কথা।

শ্রীকিশোরীমোহন ভৌমিক শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, 'মা, আমার তো বিয়ে হয়েচে।' মা উত্তর দেন, 'তাতে কি হ'য়েচে? তাতে ভয় কি? ঠাকুর তো বিয়ে ক'ত্তে মানা করেন নাই, সংসার ক'ত্তে নিষেধ করেননাই। ঠাকুরের নাম ক'রবে, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

* * * *

শ্রীব্রজনাথ সেন বলেন: রথদ্বিতীয়ার দিন জগদম্বা-আশ্রমে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি; আমার সন্তান হইয়া বাঁচে না শুনিয়া বলিলেন, 'গয়াতে [মৃত-সন্তানের নামে] পিণ্ড দিলে এই দোষ সেরে যায়।' তারপরে মা একজনের গয়ায় পিণ্ড দিয়া ঐ দোষ সারিয়া যাওয়ার উল্লেখ করিয়া কহিলেন, 'আর একটি দরগা ধ'রে থাক।' 'দরগা' কি, বুঝিতে না পারায় বলিলেন, 'হিঁদুদের বাড়ীর কাছে কোন ঠাকুর-দেবতা থাকে না? তাঁকে আশ্রয় ক'রে থাক।'

শ্রীমতী প্রভাসিনী দেবীর একমাত্র কন্যা পাঁচ বৎসর বয়সে মারা যায়। তাঁহার স্বামী তখন সন্ন্যাসী। জীবনের একমাত্র অবলম্বন কন্যার শোকে তিনি অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়েন ও তাঁহার পাগল হওয়ার সম্ভাবনা দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় একদিন রাত্রে দেখেন, শ্রীশ্রীমা জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন, 'তুমি ওর জন্যে শোক ক'চ্চ কেন? ও তো তোমার নয়। নিজের কর্মফল খণ্ডন ক'ত্তে ও কয়েক জন্ম তোমাদের গোষ্ঠীর ভিতরেই ঘুরে ফিরে আসচে।' তদবধি তাঁহার শোক একেবারে দূরীভূত হইল। আত্মীয়দের মধ্যে খবর লইয়া দেখা গেল, কয়েকটি মেয়ের জন্ম ও অল্পবয়সে মৃত্যু ঠিক পর পর ঘটিয়াছে। [ত]

সুবাসিনী দেবী গর্ভধারিণীর মৃত্যুসংবাদে কাঁদিয়া আকুল হইলে, শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন, 'কার সঙ্গে কার সম্বন্ধ? জগতের যে মা, সেই হ'ল' সকলের মা। কা কস্য পরিবেদনা!' অক্ষয়কুমার সেনকে মা লিখিয়াছিলেন, 'সংসারে জন্মমৃত্যু অনিবার্য জানিয়া সহ্য করিয়া যাইবে।'

সংসারে স্বজনবান্ধবহীন হংসেশ্বর নায়েককে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'যার কেউ নাই, তার হরি আছেন।'[৩]

---

[৩] শ্রীভবদেব ঘোষাল হইতে প্রাপ্ত।

পুত্রকে সংসারে ফিরাইয়া লইতে অভিলাষিণী শ্রীমতী মাখনবালা দেবীকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'ত্যাগী ছেলে গর্ভে ধরা বড ভাগ্যের কথা। লোকে একটা পিতলের বাটির মায়া ছাড়তে পারে না, আর সংসার ত্যাগ করা কি সোজা কথা? তোমার ভাবনা কি?—তুমি আমার ছেলেকে পেটে ধ'রেচ, মানুষ ক'রেচ। তোমার মরণের সময় সে কাছে থাকবে।' [প্র]

* * * *

স্বামী মহেশ্বরানন্দ বলেন: প্রসন্ন-মামার বাড়ীতে আমরা কয়েক জন রাত্রে খাইতে বসিয়াছি; একটি জোনাকী পোকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আলোয় পড়িতে যাইতেছিল। কেহ উহা হাত দিয়া সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করাতে শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 'ওটা মেরে ফেল—আর অত দয়ায় কাজ নাই।' স্বামী সারদেশানন্দ একটি তেঁতুল-বিছা মারিয়া ফেলেন। তাহা দেখিয়া মা বলিয়াছিলেন, 'বিছেটার কি ভাগ্যি, সাধুর হাতে মারা গেল!'

একদিন জয়রামবাটীতে পূজনীয় বাবুরাম-মহারাজ ও খোকা-মহারাজ একসঙ্গে খাইতে বসিয়াছেন। একটি বিড়াল খোকা-মহারাজের পাত হইতে কি নেওয়ার চেষ্টা করায় তিনি এক থাপ্পড় বসাইয়া দেন। তাহা দেখিয়া বাবুরাম-মহারাজ বলিলেন, 'খোকা, করলি কি, করলি কি? মেরে বসলি? মার বাড়ীতে কোন্ দেবদেবী কি বেশে আছে, কে জানে!' খোকা-মহারাজ তো অপ্রস্তুত। শ্রীশ্রীমা শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হ'য়েচে!' বাবুরাম-মহারাজ বলিলেন, 'খোকা বেরালটাকে মেরেচে!' মা বলিলেন, 'বেশ ক'রেচে। ও বড় দুষ্টু হ'য়েচে।' [স্ব]

* * * *

শ্রীশ্রীমা বলিতেন, 'যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়।' তরকারীর খোসাটিও তিনি নষ্ট না করিয়া গরুকে দিতেন; কেন-না, সেটি গরুর প্রাপ্য।

শ্রীশ্রীমার দরজায় ভিখারী কখন বিমুখ হইত না। একদিন শ্রীসারদা-রঞ্জন দত্তগুপ্ত মার বাড়ীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি ভিখারী দরজায় আসিয়া ভিক্ষা চাহিল; কিন্তু জনৈক সাধু তাহাকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। উপর হইতে মা উহা জানিতে পারিয়া লোকটিকে

ফিরাইয়া আনিতে নীচে বলিয়া পাঠাইলেন এবং কয়েকজন ছুটাছুটি করিয়া লোকটিকে খুঁজিয়া লইয়া আসিলে স্বয়ং ভিক্ষা দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। ক্ষুধার্তকে তিনি ঘরে আর কিছু না থাকিলেও মুড়িগুড় খাইতে দিতেন।

তাহার মুখে ঠাকুরের এই উক্তিটি শুনা যাইত, 'যার আছে সে মাপ, যার নাই সে জপ।' [অর্থাৎ, যাহার ধনধান্য আছে সে সৎকাজে ব্যয় করুক, যাহার নাই সে ভগবানের নাম জপ করুক।][৪] সৎকাজে মুক্তহস্ত লোককে তিনি ভালবাসিতেন, কিন্তু অপচয় সহ্য করিতেন না; বলিতেন, 'অপচয়ে মা-লক্ষ্মী কুপিতা হন।' অকারণে তরকারীর খোসাটাও তিনি পুরু করিয়া ছাড়াইতে নিষেধ করিতেন।

একবার জয়রামবাটী হইতে যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীমা স্বামী জ্ঞানানন্দকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'বেরালগুলোর জন্যে চাল নেবে; যেন কারো বাড়ী যায় না—গাল দেবে, বাবা!' [ই]

দুর্গাদেবী বলেন : একবার যখন শ্রীশ্রীমার কাছে আছি, একটি লোক মসুরকলাই বিক্রয় করিতে আসিয়াছে দেখিয়া বলিলাম, 'আমি আট আনার মসুরকলাই নেব।' মা বলিলেন, 'বেশ তো, আমি ব'লে দিচ্চি।' তাহা শুনিয়া উনি [স্বামী] বলিলেন, 'মার কাছে এসে কি চাইতে কি—মসুর-কলাই চাচ্চে!' মা বলিলেন, 'বাবা, মেয়েমানুষ ওরা, ওদের সংসার ক'ত্তে হবে—সব রকম চাই। ওদের নীলবড়ী থেকে—শশাবীচি থেকে—সমুদ্রের ফেণা থেকে সমস্ত যোগাড় ক'রে রাখতে হয়। ওদের সংসার ক'ত্তে হবে।'

* * * *

অতিমাত্রায় চা-পানে অভ্যস্ত কোন ভক্তকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুর আমাকে শিখিয়েছিলেন শরীরকে সামশীতলে রাখতে। কেবল গরম জিনিষ না খেয়ে, মিছরির পানা, ডাবের জল এসব খাওয়া ভাল।' [আ]

---

[৪] শ্রীশ্রীমা যখন কলিকাতা যাইতেন, রাত্রে কোয়ালপাড়া হইতে রওনা হইয়া সকালে প্রায় আটটার সময় বিষ্ণুপুরের দুইতিন মাইল আগে তাঁতিপুকুরে গরুর গাড়ী থামাইয়া ঠাকুরকে বাল্যভোগ দিতেন। একবার বলিয়াছিলেন, 'কে ভাগ্যবান তাঁতি যে এই পুকুরটি দিয়েচে—এত লোক জল খেয়ে বাঁচ্চে!' [বি] শেষবার কলিকাতা আসার সময় তাঁতিপুকুরের পার্শ্বস্থ বটবৃক্ষকে মা 'মহাবৃক্ষ' বলিয়া নমস্কার করিয়াছিলেন।

স্বামী স্ব-স্বরূপানন্দ বলেন ঃ শ্রীশ্রীমার জন্মতিথির দিন আমরা কয়েকজন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। সেইদিন খাওয়া-দাওয়ার পর মার জ্বর হইল। পরদিন সকালে যখন প্রণাম করিতে গিয়াছি, মা বলিলেন, 'কাল জ্বর এসে গেছে, জ্বর ছাড়ে নাই। কাল সকাল থেকেই শরীরটা একটু খারাপ ছিল ; মনে ক'ল্লুম স্নান ক'রব না। তারপর ভাবলুম, জন্মতিথি—স্নানটা করি। বাবা, প্রথম-মনের কথা শুনতে হয় ; সেই ঠিক বলে। প্রথম-মন ব'ল্লে, স্নান কোরো না ; দুষ্টু-মন ব'ল্লে, জন্মদিন—স্নানটা কর। স্নান ক'রেই জ্বর।'

গৃহস্থ-বাড়ীতে পূজার অঙ্গরূপে ও শান্তি-স্বস্ত্যয়নে চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে ; কিন্তু উহা বিধিপূর্বক না হইলে ফল তো হয়ই না, বরং অনিষ্ট হইয়া থাকে। এক সময়ে মা আপনা হইতে মঠে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, 'মঠে চণ্ডীপাঠ ঠিক হ'চ্চে না—বন্ধ কর।' তাঁহার আদেশে মঠের চণ্ডীপাঠ বন্ধ হইয়া যায়। ইহার কিছুকাল পরে মা একদিন মঠে যান—মঠ তখন নীলাম্বরবাবুর বাগান-বাড়ীতে। সেইদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ ব্যক্তিগতভাবে চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন ; তাঁহার পাঠ শুনিয়া মা বলিলেন, 'হরি চণ্ডী প'ড়তে পারে।' সেই অবধি মঠে পুনরায় চণ্ডীপাঠ হইতে থাকে। [আ]

প্রভাকর মুখোপাধ্যায় বলেন ঃ "দীক্ষা গ্রহণের পর শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা, লোকে বলে, ব্রাহ্মণ-শরীর হলেও যদি মড়াকাটা ইত্যাদি করে, তার হাতে দেবতারা পূজা ও পিতৃপুরুষেরা পিণ্ড গ্রহণ করেন না। তা কি সত্যি ?' মা বলিলেন, 'হ্যাঁ।' আমি পিতার একমাত্র ছেলে অথচ ডাক্তারি শিখিতে আমাকে মড়াকাটাদিও করিতে হইয়াছে, তাই কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তা হলে কি হবে মা ?' মা বলিলেন, 'আর কোন ভয় নাই, এখন হ'তে সকল পূজায় অধিকার হ'ল'।'

"কোনও সময়ে আমাকে মা ডাকিতেছেন শুনিতে পাইয়া বলিলাম, 'মুখে পান রয়েচে, কি করে যাব ?' মা বলিলেন, 'পান পবিত্র—এস।' "

প্রবোধবাবু বলেন ঃ আমাদের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমা আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের মুখে নিজের প্রসাদ দিয়াছিলেন। বিকালে যখন সকলে তাঁহার কাছে বসিয়াছি, মা বলিলেন, 'অন্নপ্রাশন তো হ'ল' বাবা, হ'ল' কিন্তু রবিবারে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রবিবারে হলে কি হয় মা ?' মা বলিলেন, 'আর কিছু হয় না, একটু গরীব হয়।' আমি বলিলাম, 'তা গরীব হোকগে, আপনার শ্রীচরণে মতি থাকলেই হ'ল'। মা প্রসন্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 'ছাখ বাবা, বামুনের ছেলে—একটু বৈদিক কার্য ক'ত্তে হয়, সংস্কার কি-না। বাড়ীতে গিয়ে একটু ঘি পুড়িও।'

ইন্দুমতী দেবী বলেন : বিজয়ের ভাতের সময় উনি [স্বামী] বলিলেন, 'দিদি, ছেলের ভাত হবে নি। ও তো বাঁচবে নি দিদি ; আমি পয়সা খরচ ক'রব শুধু-শুধু ?' মা বলিলেন, 'সে কি রে ? ধানের আগড়া [অসার ধান] ভেসে যায়, মানুষের আগড়া থেকে যায়—করাবি বৈ কি।'

কমলা ঘোষ বলেন : আটমাস বয়সে আমার প্রথম ছেলের লক্ষ্ণৌয়ে অসুখ হয়। ঠাকুর স্বপ্নে দেখা দিলেন ও যেন নিজে ছেলেকে কোন ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেম। ছেলে ভাল হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমাকে কলিকাতায় সেই কথা বলিবার উপক্রম করিতেই বলিলেন, 'আমাকে শুনিয়ো না, স্বপ্নাগু ওষুধ ব'লতে নাই।'

আহারের বিধিনিষেধ সম্বন্ধে শ্যামাচরণ চক্রবর্তীকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'তোমার মাছমাংস যা খেতে মন চায়, খাবে। তবে ঠাকুর ব'লতেন আগুশ্রাদ্ধের, সংস্কার-বিবাহের আর প্রায়শ্চিত্তের অন্ন খেতে নাই।'

জয়রামবাটীতে স্বামী কৈবল্যানন্দের আহারের সময় কাছে বসিয়া ছোঁয়াছুয়ির কথায় শ্রীশ্রীমা বলিলেন : সংস্কার কি সহজে যায় ? ঠাকুরের ঘরে মা-কালীর প্রসাদী অন্ন একথালা রোজ আসত' আর তার সঙ্গে ছোট বাটিতে একবাটি ঘিও আসত'। ঠাকুর পেটরোগা, অতটা ঘি খেতে পাত্তেন না। আমাকে ব'লতেন, 'ওগো, ঘিটা আলগোছা ঢেলে রাখ না ; অতটা ঘি তো খেতে পারব না।' আমার ভাতে-ছোঁয়া ঘি তুলে রাখতে সঙ্কোচ হ'ত'। মনে হ'ত', এঁটোটা রাখব ? ঠাকুর মনের কথা বুঝতে পেরে ব'লতেন, 'না না গো, ঘি, তেল ভাতে ছোঁয়া গেলেও সকড়ি হয় না, পাত্রান্তর ক'ল্লেই শুদ্ধ হ'য়ে যায়।' ঠাকুরের কথা শুনে রেখে দিতুম বটে, কিন্তু মন খুঁতখুঁত ক'ত্ত'। এমনি সংস্কার !

গণেন্দ্রনাথ যে কাপড় পরিয়া শৌচে গিয়াছিলেন সেই কাপড়ে মার

নিকটে আসাতে নলিনী একটু কিন্তু করিতেছিল। তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 'ব্যাটা-ছেলে সদামুক্ত—ওদের আর শুচি অশুচি কি ?' [বি]

* * * *

পুত্রবতী, গর্ভবতী নারীকে সংসারে অনেক বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। সুরমা রায় বলেন ঃ "প্রথম যেবার শ্রীশ্রীমার কাছে যাই, তখন আমার মেয়ে পেটে। মা আমাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি আস্ত জিনিষ, লাউ কি কুমড়ো, কেটো না।'

"জয়রামবাটীতে সন্ধ্যার পর কাপড় বাহিরে শুকাইতেছিল। মা নলিনীকে 'পোয়াতীর কাপড় সন্ধ্যার পর বাইরে রাখতে নাই' ইত্যাদি কথা কহিয়া কাপড় না উঠাইবার জন্য বকিলেন। নলিনী বলিল, 'পিসীমা, তুমি আমাদের বকলে; বৌদিদিকে তো বকলে না?' মা বলিলেন, 'ওদের কাপড় বাইরে থাকলে কিছু হবে না। ওরা যাঁর নাম নিয়ে বেরিয়েচে, তিনিই রক্ষে ক'রবেন।'

"কামারপুকুরে যাওয়ার সময় আমবাগান, ভূতির খালের শ্মশান ইত্যাদি স্থানে অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়াছিলাম। নলিনী সেকথা শুনিয়াই চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া পড়িল ও বলিল 'ওগো পিসীমা, শুন বৌদিদি কি ব'লচে!' মা হাসিয়া বলিলেন, 'ওদের কিছু হবে না; ঠাকুর ওদের সর্বদা রক্ষে ক'চ্চেন!"*

কমলা ঘোষ বলেন ঃ "যখন আমার প্রথম ছেলে পেটে, বাপের বাড়ী যাওয়ার কথায় শ্রীশ্রীমা ওঁকে [স্বামীকে] বলিয়াছিলেন, 'প্রথম পোয়াতী বাপের বাড়ীতেই প্রসব হওয়া ভাল। গীতা, চণ্ডী নতুন কাপড়ে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে দেবে—মা-চণ্ডী রক্ষে ক'রবেন।'

"মেয়ে পেটে, তৃতীয়বার যখন জয়রামবাটী যাই, তখন শ্রাবণের শেষ—নদী বাঁধা। নদীর ধারে শ্মশান। খেয়া পার হওয়ার আগে আমি নদীর ধারে বালির উপর শুইয়া পড়িয়াছিলাম শুনিয়া মা বলিলেন, 'ক'রেচ কি গো!' পরদিন স্নান করিতে যাওয়ার সময় মা আমাকে সঙ্গে লইয়া

* একদিন শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'যোগেন্দ্রর স্ত্রী [বাগ্দিজাতীয়া] অন্তঃসত্ত্বা—শ্মশানের পুকুরে মাছ ধ'রে বেড়ায়। তারা গরীব—ভগবান তাদের রক্ষে করেন। [বি]

গিয়া ৺সিংহবাহিনীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'মা সিংহবাহিনী, বৌমা কিছু জানে না, তোমাকে দেখতে এসেচে, ওকে রক্ষা কর।'

"সেই অবস্থায় মা আমাকে কাহারও ঘরে খাইতে দিতেন না; বলিতেন, 'পোয়াতী মানুষকে যার তার ঘরে খেতে নাই।' ফিরিবার সময় মা শিয়াকুলের কাঁটাশুদ্ধ ডাল আমার খোঁপায় গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, 'শেঁকুলের কাঁটা ধ'রব তো ছাড়ব না। আমার মা পোয়াতীকে শেঁকুলের কাঁটা যাত্রাকালে দিতে ব'লতেন।'

"একবার কলিকাতায় একাদশীর দিন কিছু না খাইয়াই মার বাড়ী হইতে মাসী-বাড়ী যাই। সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিতেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাত পেয়েছিলে কি?' আমি বলিলাম, 'ভাত পাই নি' 'একাদশীর ফল পেলে। আর তোমাকে একাদশী ক'ত্তে হবে না।' 'মাছ খেয়েচি যে?' 'বেশ ক'রেচ। একাদশীর দিন, এয়োস্ত্রী-মানুষ, রাত্রে দুটি ভাত আর একটু মাছ মুখে দেবে।'"

* * * *

লোকনিন্দার কথায় শ্রীশ্রীমা কৈলাসকামিনী রায়কে বলিয়াছিলেন, 'খোসাটা আর চালটা—লোকনিন্দা হ'ল' বাইরের খোসা। নরেনকেই লোকে কত নিন্দা ক'রেচে।' স্বামী কৈবল্যানন্দকে বলিয়াছিলেন, 'লোকে কাপড় ময়লা করে, ধোপা সেই কাপড় সাফ ক'রে দেয়। লোকে খারাপ কাজ করে, আর যারা সেই কাজের চর্চা করে তারাই তাদের পাপের ভাগী হয়।'

সত্যকথা বলিতে যাইয়া চক্ষুলজ্জাশূন্য হইতে দেখিলে শ্রীশ্রীমা তিরস্কার করিতেন। লোকের মুখের উপর স্পষ্টকথা কহিতে দেখিয়া গোপাল-মাকে বলিয়াছিলেন, 'অপ্রিয় বচন সত্য কদাপি না কয়।'

রাধুর মার সঙ্গে একটি সদ্‌গোপের মেয়ের ঝগড়া হইতেছিল। শ্রীশ্রীমা দূর হইতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন, 'কথায় মত্ত হওয়া ভাল নয়। হেটেল মারলেই পাটকেল খেতে হয়।' নলিনীর সঙ্গে সুবাসিনী দেবীর ঝগড়া হইয়াছিল। চিঠিতে সেই কথা জানিয়া মা লিখিয়াছিলেন, 'সময়ে সবই সহ্য করিতে হয়; সময়ে ছাগলের পায়েও ফুল দিতে হয়।' উমেশবাবুকে

লিখিয়াছিলেন, 'তুমি ঠাকুরের সন্তান, তুমি শত্রুর সঙ্গে মিত্র-ব্যবহার করিবে। ইহাতে ঠাকুর তোমার মঙ্গল করিবেন।'

অদ্বৈতচরণ দাসের সঙ্গে কোন প্রতিবেশীর বিবাদ হয়। প্রতিবেশীরই যত দোষ ছিল, তথাপি অদ্বৈতচরণ সাধুবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ ধর্মপথের বিঘ্নকর জ্ঞানে, নিজের হীনতা স্বীকার করিয়াও সদ্ভাব-স্থাপনে ইচ্ছুক হন ও শ্রীশ্রীমাকে তাহা জানান। তাঁহার অভিপ্রায় শুনিয়াই স্বামী অরূপানন্দ বলিলেন, 'সে চাচ্চে না, তবু তুমি গায়ে পড়ে ভাব করতে যাচ্চ?' সঙ্গে সঙ্গে মাও বলিলেন, 'হ্যাঁ বাবা, ঠিকই তো ব'লেচে। এতে কি তোমার মনুষ্যত্ব থাকে?' [ন]

বিবাদ-বিসম্বাদ, অশান্তির কথায় শ্রীশ্রীমা প্রায়ই বলিতেন, 'পৃথিবীর মতন সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর উপর কত রকমের অত্যাচার হ'চ্চে, অবাধে সব সইচে; মানুষেরও সেই রকম চাই।'

* * * *

স্বামী মহেশ্বরানন্দ বলেন: "শ্রীশ্রীমার কাছে অবস্থান-কালে আমার কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। মা ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'বাবা, তোমার দুখানা কাপড় আমার কাছে আছে, নিয়ে যেয়ো।'*

"আদেশ করা হিসাবে তাঁহাকে কিছু বলিতে শুনি নাই। 'বাবা এটা ক'ল্লে ভাল হয় না?'—এইরূপ তাঁহার বলিবার রীতি ছিল। কাহাকেও কোন আদেশ করিতে তিনি সর্বদাই সঙ্কুচিত হইতেন।" গুরুর জোর আদেশ ব্যতীত শিষ্য যেখানে আত্মকল্যাণকর কার্যবিশেষ কিছুতেই করিবে না, সেখানে মাকে কখন কখন আদেশ করিতে দেখা গিয়াছে। যেমন, বালবিধবার অতিরিক্ত কঠোরতা-প্রবৃত্তি দূর করিবার জন্য বলিতেছেন, 'আমি ব'লচি, তুই জল খা।' এই আদেশের মধ্যে জননীর কল্যাণমূর্তি ছাড়া আর কিছুই নাই—অন্যের উপর নিজের কর্তৃত্বময় প্রভাব বিস্তার করিয়া কৌশলে স্বার্থসিদ্ধি করার নামগন্ধও নাই।

সংসারে মানুষকে অনেক সময়ে পরস্পরের উপর নির্ভর রাখিয়া চলিতে

* প্রভাকর মুখোপাধ্যায় দীক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে জয়রামবাটী গিয়াছেন: মা বলিলেন, 'মন্ত্র নেবে? বেশ তো! তোমাদের জিনিষ আমার কাছে মজুত আছে।'

হয়। উহা যেমন স্বচ্ছতা-বৃদ্ধির সহায়ক, তেমনি নিশ্চিন্ত থাকারও উপায়-স্বরূপ। শ্রীশ্রীমার আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ জীবিকার জন্য কলিকাতায় বাস করিতেন এবং তাঁহার দেশের লোক অক্ষয়কুমার সেনও কলিকাতায় থাকিতেন। মা দেশ হইতে তাঁহাকে লিখিতেছেন, মধ্যে মধ্যে তুমি উহাদের বাসায় যাইবে। কেন-না, দিন খেন খারাপ; তোমাদের ভরসা অনেক করি।'

সংসারে শ্রীশ্রীমা সকল দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন; তাঁহার ভ্রম-প্রমাদ কদাচিৎ হইত। এক ব্রাহ্মণী কলিকাতায় তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূর দীক্ষাগ্রহণের দিন তাহাদের সঙ্গে মার বাড়ীতে আসেন। আহারে বসিবার পূর্বে, তিনি মাতাঠাকুরাণীর জন্য নির্দিষ্ট আসনের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন; কেহ তাহাতে আপত্তি করিলে উত্তেজিত হইয়া বলিতে থাকেন, 'আমরাও কুলীন বামুনের মেয়ে, জপতপ ক'রে থাকি। মা আমাদেরও।' এমন সময় মা আসিয়া তাঁহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া কহিলেন, 'কিছু মনে কোরো না দিদি।' ব্রাহ্মণী অমনি জল হইয়া বলিলেন, 'আমার ছেলেকে আপনাকে দিলুম!' [ত]

শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ ডাক্তারি-পরীক্ষা দিয়া মাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটী যান। সেই সময় জিবট্যার কোন স্ত্রীলোকের পেটে ফোড়া হওয়ায় তাঁহাকে দেখাইতে লইয়া যায়। ফোড়াটা দেখিয়া তিনি পরদিনই কাটিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। মা সেই কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'তাই তো বাবা, কেটে দেবে; তারপরে ভালমন্দ যদি কিছু হয়, লোকে তো আমাকেই দূষ্‌বে!' ফোড়া আর কাটা হইল না—কয়েকদিন পরে আপনা হইতেই ফাটিয়া গেল।

রাজেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন: জয়রামবাটী যাওয়ার পথে শ্রীশ্রীমা বিষ্ণুপুরে সুরেশ্বরবাবুর বাড়ীতে আছেন; বাঁকুড়া হইতে যাইয়া আশু-মহারাজ তাঁহাকে পূর্বদিন দর্শন করিয়াছিলেন। বারটার গাড়ীতে জনৈক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া মাকে দর্শন করিতে গেলাম। আমাদিগকে চারিটার গাড়ীতে ফিরিতে হইবে, ফিরিবার অন্য গাড়ী নাই। খানিক কথাবার্তার পর আমরা চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেই মা বলিলেন, 'ছাখ, আশু কাল গামছা

ভুলে ফেলে গেছে, তুমি নিয়ে যাও।' আশু-মহারাজ আমাকে গামছাখানা লইয়া আসিতে বলিয়াছিলেন, আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। মা গামছা-খানি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, আমাকে দিতেও ভুলিলেন না।

জয়রামবাটীতে রাত্রে আহারের পর উমেশবাবু এক গ্লাস খাবার জল চাহিলে, মা ঐ জল দিয়া কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'ভোর বেলায় নাক দিয়ে জল টানার অভ্যাস আছে।' ইহার পর যতবার তিনি মার বাড়ী গিয়াছেন, প্রত্যেক বারই রাত্রে আহারের পর মা বলিতেন, 'বাবা, তোমার জলটি মনে ক'রে নিয়ে রেখো।'

দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী চলিতে না পারিলে মানুষ দুঃখভাগী হয়। শ্রীশ্রীমা বলিতেন, 'সংসারে কেমন ক'রে থাকতে হয় জান ?—যখন যেমন, তখন তেমন; যাকে যেমন, তাকে তেমন; যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।' নিশিকান্ত মজুমদারকে মা বলিয়াছিলেন, 'মনে ক'রবে এ ঠাকুরের সংসার, তুমিও ঠাকুরের ; ঠাকুরের সংসারে ঠাকুরেরকাজ ক'চ্ছ।' স্বামী বাসুদেবানন্দ এক সময়ে কলিকাতায় মার বাড়ীতে ঠাকুর-পূজা করিতেন, কিন্তু হট্টগোলের জন্য কখন কখন বিরক্তও হইতেন। একদিন আরতির সময় ভয়ানক গোল-মাল হইতেছে আর তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, কি বিপদেই পড়া গেল। তখনই মা যেন রাধুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'হরি-ঠাকুর যেখানে রাখেন সেখানেই থাকতে হয়।'

সংসার কর্মক্ষেত্র। শ্রীশ্রীমা আজীবন অবিশ্রান্ত কর্ম করিয়া মানবকে কর্ম-শিক্ষা দিয়াছেন। কুসুমকুমারী দেবী বলেন : "রাধুর জন্মের পর হইতে জয়রামবাটীতে মাঝে মাঝে যাইয়া দুইতিন মাস করিয়া থাকিতাম। রোজই মনে করিয়াছি মাকে কোনও কাজ করিতে দিব না,কিন্তু তিনি কার্যতঃ তাহা একটি দিনের জন্যও হইতে দেন নাই। রাত্রি চারিটার সময় উঠিয়া মা শৌচে গিয়াছেন, আর আমি তাড়াতাড়ি বাসনপত্র পুকুরেরজলে ভিজাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি ; মা শৌচ হইতে আসিয়াই পুকুরে সেই বাসন দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ পরিষ্কারকরিয়াফেলিয়াছেন। আমি যাইয়া জলেবাসনের অনুসন্ধান করিতেছি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ধোয়া বাসন দেখাইয়া দিয়াছেন।

"সংসারে মার কত খাটুনি ছিল। একে তো বৃহৎ পরিবার, তাহার

উপর তিনজন মুনিষ ও একজন রাখাল ছিল, সকলের রান্নাই মা স্বহস্তে করিতেন। বৌরা তখন কাজে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতেন না এবং গর্ভধারিণীর কষ্ট হইবে বলিয়া মা তাঁহাকেও রাঁধিতে দিতেন না। রাধুর জন্মের দুই বৎসর পরে একজন ব্রাহ্মণীকে রাখা হয়। তিনি কেবল সকালবেলা রাঁধিতেন। রাত্রে রুটি,তরকারী এবং মামাদের-জন্য গরম ভাত মা নিজেই রান্না করিতেন। ভক্তেরা জয়রামবাটী যাইলে তাহাদের জন্য তরকারী মা নিজহাতে করিয়া দিতেন। কিন্তু দিবারাত্র কাজ করিয়াও তাঁহাকে কখন বিরক্ত হইতে দেখি নাই।

"গ্রীষ্মকাল—সারাদিন খাটিয়া মা সন্ধ্যার সময় তাঁহার জননীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ-মূলে যাইয়া বসিতেন। বসিয়াই বলিতেন, 'আঃ বাঁচলুম, ঠাণ্ডা হলুম!' একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা, আপনারও সংসারের তাত লাগে?' উত্তর দিলেন, 'লাগবে না মা? আগুনের ভিতর থাকলে তাত সকলেরই লাগে।' ওখানে মা ঘণ্টাখানেক বসিয়া ধ্যান করিতেন—শরীরে হুঁস আছে বলিয়া বুঝা যাইত না।"

শ্রীশ্রীমার এই কর্মশীলতা শরীর সম্পূর্ণরূপে অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল; স্বহস্তে পূজার যোগাড় করিয়া ঠাকুর-পূজা এবং আত্মীয়-স্বজন ও ভক্তগণের সেবা তাঁহার নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল। শেষাশেষি তাঁহাকে রন্ধন করিতে না হইলেও, স্বহস্তে তরকারী কুটিয়া রান্নার যোগাড় করিয়া দিতেন এবং শরীর সুস্থ থাকিলে পরিবেষণ করিয়াও খাওয়াইতেন। যতদিন শরীরে সামর্থ্য ছিল, স্নানের পর কলসীতে করিয়া জল আনিয়াছেন এবং সংসারের অন্যান্য কাজেও সাহায্য করিয়াছেন। জয়রামবাটীতে স্বামী প্রশান্তানন্দ একদিন দেখিয়াছিলেন, মা খোঁড়া-পায়ে কষ্ট করিয়া কলসীতে খাবার জল লইয়া আসিতেছেন। দেখিয়া তাঁহার বড়ই কষ্ট হয়। ইহার পর যে কয়দিন তিনি ওখানে ছিলেন, নিজেই ঐ জল আনিয়া দিতেন। আর একদিন তিনি দেখিতে পান, মা ছোট-মামীর সঙ্গে ধান বা অন্য কিছু কুটিতেছেন। তজ্জন্য অনুযোগ করায় বলিলেন, 'সামান্য একটু কাজ বাকী ছিল, ক'রবার আর কেউ ছিল না, তাই ঢেঁকিতে উঠেছিলুম।'

শেষবার কলিকাতা আগমনের অল্পকাল পূর্বে একদিন মা তেল মাখিয়া

স্নান করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পুকুরে না যাইয়া কোথায় যে হঠাৎ চলিয়া গেলেন, বুঝিতে পারা গেল না। অনেক অনুসন্ধানের পর যামিনী দেবী দেখিতে পাইলেন, মা গোয়ালের পেছনে যাইয়া গোবর চটকাইয়া ঘুঁটে দিতেছেন। এত লোক থাকিতেও মা দুর্বল শরীরে পরিশ্রম করিতেছেন দেখিয়া যামিনী দুঃখ প্রকাশ করায় উত্তর দিলেন, 'তা হোক, সবাই তো কাজকর্মে আছে মা, আমিই দিয়ে দি।'

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ভক্ত-বৎসলা ঃ নিত্যলীলাময়ী

শ্রীশ্রীমার মর্ত্যলীলার শেষের কয়েক বৎসর যেমন কর্মে নিবিড়, তেমনি করুণায় মহীয়ান। একদিকে আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, অন্যদিকে আশ্রয়প্রার্থী নূতন ভক্তগণের ভিড়ও লাগিয়াই আছে—শারীরিক, মানসিক কোন কাজেরই বিরাম নাই। রাত্রিকালেও তিনি একটুকু বিশ্রামের সময় পান না—ভক্ত-কল্যাণে জাগিয়া সারানিশি নামে-চিন্তায় জপে-ধ্যানে অতিবাহিত করেন। জপ করেন ভক্ত-সন্তানগণের হইয়া তাহাদিগকে প্রদত্ত মহামন্ত্রগুলি, আর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করেন, ধ্যান করেন, ভক্ত-সন্তানগণেরই চিন্ময় রূপ যাহা মন্ত্রপ্রতিপাদ্য ইষ্টে চিরসম্বদ্ধ, চিরমিলিত।[১] তাঁহার ধ্যানে ভক্তগণের স্বরূপ ফুটিয়া না উঠিলে ভক্তেরা লুপ্তজ্ঞান স্বরূপের সন্ধান পাইবে কেমন করিয়া? তিনি স্বরূপের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন বলিয়াই তো তাহারা ব্যাকুল হইয়া, অধীর-আগ্রহে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে! তিনি তো নিজমুখেই কতজনকে বলিয়াছেন, 'ঠাকুরের দয়া' [আগে] পেয়েচ ব'লেই এখানে এসেচ।'

এমনি ভাবেই যদি চিরকাল ভক্ত-ভগবানে খেলা চলিত! কিন্তু তাহা হইবার নহে। 'নরলীলা নরবৎ' হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীমার বয়োধর্মে ক্ষীয়-

১ ইন্দুভূষণ সেনগুপ্তকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'তোমার চিন্তা কি বাবা, তুমি আমার অন্তরে রয়েচ। তোমার জন্যে আমিই ক'চ্চি।'

মাণ শরীর ক্রমবর্ধমান কাজের চাপে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল ; দেশের নিদারুণ ম্যালেরিয়া পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিয়া উহাকে আরও জীর্ণ শিথিল করিয়া তুলিল ; স্বজন-বিয়োগ জনিত আঘাত তাহাতে সহায়তা করিল।

১৩২৩ সালে শ্রীশ্রীমার দেহ আমবাতে আক্রান্ত হয়। এই আমবাত একএক সময়ে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া উঠিত ও তজ্জন্য তেল মালিশ করিতে হইত। তিন বৎসর তিনি এই অসুখে কষ্ট পাইয়াছিলেন।

১৩২৪ সালের ২০শে পৌষ জন্মতিথির দিন শ্রীশ্রীমার শরীরে সামান্য-ভাবে জ্বর দেখা দেয়। চিকিৎসা সত্ত্বেও সেই জ্বর ক্রমশঃ প্রবলাকার ধারণ করে এবং তাঁহার দেহের অবস্থা শঙ্কাজনক করিয়া তুলে। ৫ই মাঘ স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ প্রেরিত তারে সেই সংবাদ পাইয়া স্বামী সারদানন্দ মার প্রিয় শিষ্য ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, ডাক্তার সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, গোলাপ-মা, যোগীন-মা, স্বামী ভূমানন্দ ও দয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া জয়রামবাটী গমন করেন। কাঞ্জিলালের সুচিন্তিত কিকিৎসায় নিরাময় হইয়া মা ১৫ই মাঘ অন্নপথ্য গ্রহণ করেন। [দি]

ইহার কিছুদিন পরে কোয়ালপাড়ায় যাইয়া শ্রীশ্রীমা পুনরায় জ্বরে আক্রান্ত হন ও সেই জ্বর ভীষণাকার ধারণ করে। ২২শে চৈত্র কোয়াল-পাড়া হইতে তার পাইয়া স্বামী সারদানন্দ সেইদিনই ডাক্তার কাঞ্জিলাল, স্বামী ভূমানন্দ ও পরমেশ্বরানন্দকে প্রেরণ করেন ; এবং নিজে অত্যাবশ্যক কাজগুলির যথাসম্ভব সত্বর ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আপন ভ্রাতা ডাক্তার সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীকে সঙ্গে লইয়া কোয়ালপাড়া রওনা হন। বিষ্ণুপুরে একখানি ঘোড়ার গাড়ী যোগাড় করিয়া তিনি সেই গাড়ীতে ৪ঠা বৈশাখ কোয়ালপাড়ায় পৌছেন। [দি] জ্বরের ঘোরে মা প্রায়ই শরৎ-মহারাজের নাম করিতেছিলেন। তিনি আসিয়া পৌছিবার পরদিনই জ্বর ছাড়িয়া যায়।

কোয়ালপাড়া হইতে শ্রীশ্রীমা ১৫ই বৈশাখ জয়রামবাটী চলিয়া যান এবং তথা হইতে ২২শে বৈশাখ রওনা হইয়া, সারদানন্দ-মহারাজের সঙ্গে, ২৪শে রাত্রি আটটায় কলিকাতায় আসেন। [দি]

১৩২৫ সালের ১৪ই শ্রাবণ শ্রীশ্রীমার জীবনে একটি বেদনার দিন। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ-লীলাসহচর, চিরশুদ্ধ-আধার স্বামী প্রেমানন্দ ঐদিন

মর্ত্যলীলা সম্পূর্ণ করিয়া চলিয়া যান। পূর্ববঙ্গে উপর্যুপরি কয়েকবার ঠাকুরের ভাব প্রচার করিতে যাইয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও নানা বিজাতীয় লোকের সংস্পর্শে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ও তিনি কালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শরীর যাইতে মা কাঁদিয়া আকুল হন।

এই ঘটনার মাত্র দুইদিন পূর্বে প্রেমানন্দ-মহারাজের অন্যতম সেবক স্বামী মহাদেবানন্দ শ্রীশ্রীমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'মা, আপনি বলুন যাতে বাবুরাম-মহারাজ সেরে উঠেন।' তাহাতে মা উত্তর দেন, 'আমি কি তা ব'লতে পারি? ঠাকুরের যা ইচ্ছে তাই হবে।' মহাদেবানন্দজী পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিয়াও মার মুখ দিয়া ঐ এককথা—ঠাকুরের যা ইচ্ছে তাই হবে—ছাড়া, আর কোন কথাই বাহির করিতে সমর্থ হন নাই।

শ্রীশ্রীমার পালিতা কন্যা রাধু অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অসুস্থ হইয়া পড়ে। সে কোলাহল একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেছে না দেখিয়া মা তাহাকে লইয়া, কতকটা নির্জনে বাস করিবার জন্য ১৬ই পৌষ নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-বাড়ীতে গমন করেন। [দি] ইহাতেও রাধুর অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া তিনি তাহাকে লইয়া দেশে চলিয়া যান এবং ১৭ই মাঘ হইতে কয়েক মাস কোয়ালপাড়ায় জগদম্বা-আশ্রমে বাস করেন। [দি] রাধুকে লইয়া মা এই সময়ে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে দিন কাটাইতেন; তদুপরি ভক্ত-সমাগমেরও বিরাম ছিল না। ১৩২৬ সালের ৫ই বৈশাখ মাকুর পুত্র ন্যাড়ার মৃত্যু হওয়ায় মা আর একটি আঘাত প্রাপ্ত হন। [দি]

কোয়ালপাড়া হইতে শ্রীশ্রীমা ৪ঠা শ্রাবণ জয়রামবাটী চলিয়া যান। তথায় ২৭শে অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমীর দিন ভক্তেরা তাঁহার জন্মোৎসব সম্পন্ন করেন। যামিনী দেবী বলেনঃ ঐদিন মা স্নান করিয়া ভক্তদের দেওয়া অনেকগুলি কাপড়ের ভিতর হইতে শরৎ-মহারাজের দেওয়া কাপড়-খানি বাহির করিয়া পরিলেন। আমি মার কপালে সিঁদূর-চন্দন, গলায় ফুলের মালা ও পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, প্রণাম করিয়া মুখের দিকে চাহিতেই দেখি, তাঁহার আগেকার রূপ যেন নাই, চকিতের মধ্যে এক ভীষণ-সুন্দর, অপূর্ব, অ-মানব রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে! সে রূপের বর্ণনা ভাষায় দিতে পারি

না ; মনে হইলে এখনও রোমাঞ্চ হয়। খানিক পরেই তিনি পূর্বের মত হইয়া গেলেন, আমাকে বলিলেন, 'এস মা, প্রণাম কর।'

জন্মতিথির দিন হইতে শ্রীশ্রীমার অল্প অল্প জ্বর হইতে লাগিল ; এবং মাঝে মাঝে জ্বরের বিরাম হইলেও ক্রমাগত ভুগিতে ভুগিতে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। কিন্তু এই অসুস্থতার মধ্যেও দীক্ষা দেওয়া বন্ধ হইল না। শরীরে জ্বর লইয়াও তিনি দূরদূরান্তর হইতে আগত ভক্ত-সন্তানগণকে শ্রীপদে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন—'জীবে দয়া' এই কালে তাঁহাকে আত্মহারা করিয়া দিয়াছিল !

এই সময়ে একদিন শ্রীশ্রীমার সঙ্গে উপেন্দ্রচন্দ্র রায়ের নিম্নোক্তরূপ কথাবার্তা হয় ঃ 'মা, তোমার শরীর কেমন আছে ?' 'একটু একটু জ্বর হ'চ্ছে, শরীর দুর্বল—এ শরীর আর রইচে না।' 'তোমার জীবনটা তো কষ্টে কষ্টেই গেল—দক্ষিণেশ্বরে নহবতে থেকে, অনেক দিন ধরে কত কষ্টই না সহ্য করেচ !' 'সে তো বাবা, ভালই গিয়েচে। তখন এমন হ'য়েচে যে আজকের হাগা কালকে হেগেচি ; তাতেও গায়ে লাগে নি। এখন আর এ শরীর বয় না !' মার কথার ভাবে উপেনবাবুর মনে হইল, যেন নূতন শরীর না হইলে তিনি আর কাজ করিতে পারিতেছেন না !

শ্রীশ্রীমার অসুখের সংবাদ পাইয়া স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিবার জন্য স্বামী ভূমানন্দ, আত্মপ্রকাশানন্দ ও শ্রীবশীশ্বর সেনকে পাঠাইলেন। ১২ই ফাল্গুন জয়রামবাটী হইতে রওনা হইয়া মা ১৫ই রাত্রি প্রায় নয়টার সময় কলিকাতায় পৌছিলেন। [দি] জয়রামবাটী হইতে যাত্রা করিবার দিন তিনি পুণ্যপুকুরের ঘাটে পড়িয়া গিয়াছিলেন। যাত্রার সময়, গাড়ীতে উঠিবার পূর্বে,সুবাসিনী দেবী হলুদজলে তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিতে যাইতেছিলেন,—প্রত্যেকবারই যাত্রার সময় তিনি ঐরূপ করিতেন—গাড়ী-গুলি ঘোষপাড়ার কাছে একটু দূরে ছিল বলিয়া মা বলিলেন, 'বড় বৌ,তুমি আর হলুদজল নিয়ে এসো নি ; হরিপ্রেমের হাতে দাও,সে পা ধুইয়ে দেবে।'

শ্রীশ্রীমাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া স্বামী সারদানন্দ চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী,এলোপ্যাথি—একে একে সকলপ্রকার বিধান অনুসারেই চিকিৎসা করানো হইল ; কিন্তু

কিছুতেই কিছু হইল না। কেবল কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতির চিকিৎসায় ৭ই চৈত্র হইতে পনর দিন জ্বর বন্ধ ছিল।[২] অবশেষে ডাক্তার প্রাণধন বসু কালাজ্বর হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন।[৩]

শ্রীশ্রীমাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য স্বামী সারদানন্দ কোন চেষ্টারই ত্রুটি করিলেন না। কেবল মানবীয় চিকিৎসায় ফল হইতেছে না দেখিয়া

---

২ স্বামী সারদানন্দের পত্র হইতে সংগৃহীত।

৩ চিকিৎসার ক্রম ও চিকিৎসকগণের নাম স্বামী সারদানন্দের দিনলিপিতে এইরূপ পাওয়া যায়:

১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী: H. M. [Holy Mother] under Dr. Kanjilal's [ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল] treatment.

২০শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ: H. M. better & free from fever.

২২শে „ ৫ই ” : H. M. had fever upto 101° temp. in the afternoon.

২৯শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ: H. M.'s fever rose higher. Syamadas Kaviraj's [কবিরাজ শ্যামদাস বাচস্পতি] treatment begun.

২৬শে চৈত্র, ৮ই এপ্রিল: H. M. not better with Kavirajee treatment —so Dr. Bipin [ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ] took up Her case from today.

২৮শে চৈত্র, ১০ই এপ্রিল: H. M. suffering from pain in the stomach. Dr. Haran's [ডাঃ হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] medicine relieved Her.

৩০শে চৈত্র, ১২ই এপ্রিল: Bipin (Dr.) absent—at Ghatsila—so Drs. Durga [ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ], Satis [ডাঃ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী] & Kanjilal treated Mother.

২রা বৈশাখ, ১৫ই এপ্রিল: Dr. Bipin returned from Ghatsila, came to see H. M. & altered prescription with Durga.

১৮ই বৈশাখ, ১লা মে: Dr P.D. Bose. [ডাঃ প্রাণধন বসু] called for H. M.

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৬ই মে: P. D. declared H. M.'s case to be K—azar & talked about injection,......

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ২০শে মে: Sponging given with rice diet—fever rose to 100° in the evening.

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ২২শে মে: Swamin injected by Dr. Syamapada [ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়] at 11-30 A. M.

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১লা জুন: Doctors seemed to have come to their tether's end with regard to the case of Holy mother. So Kaviraj Rajendranath [কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন] was called today & given charge of Her case.

তিনি সেই সঙ্গে দৈব-প্রতিকারও আরম্ভ করাইলেন। ৩১শে বৈশাখ হইতে কিছুদিন ধরিয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। [দি][৪]

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন সুনিষ্পন্ন হইল, কিন্তু শ্রীশ্রীমার দেহের অবস্থার উন্নতি হইল না। এই অসুখের মধ্যেও, পাহারায় নিযুক্ত সেবকগণকে বুঝিতে না দিয়া, কিংবা তাঁহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া, তিনি ভক্ত-সন্তানগণের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন—কাহাকেও ইষ্টদর্শন করাইয়া দিয়াছেন, কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেন, কাহাকেও বা সেবা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। দুর্গেশচন্দ্র দাস ১৩২৬ সালের চৈত্র মাসে তাঁহার আত্মীয়া শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া আসিলে মা প্রিয়ম্বদাকে, অপরে নিষেধ করা সত্ত্বেও, মন্ত্রদান করেন। কে বলিবে, ইহাই তাঁহার শেষ দীক্ষাদান কি-না।

কিরূপে পাহারায় নিযুক্ত সেবকগণকে জানিতে না দিয়া শ্রীশ্রীমা দূরবর্তী স্থান হইতে আগত ভক্তগণের মনস্কামনা পূর্ণ করিতেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ভক্তের কাহিনী নিম্নে দিতেছি। শ্রীমাখনলাল সেন লিখিতেছেন ঃ "বিনয়বালা সেনের বাড়ী ঢাকা—সোনারং-গ্রামে। স্বামিগৃহে থাকা কালে সে ঠাকুরের কথা জানিতে পারে এবং মাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। মা কলিকাতায় আছেন জানিয়া সে কোনরূপে কলিকাতায় তাহার

কিছুদিন কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন চিকিৎসা করেন। ঐ সময়ে কবিরাজ কালী-ভূষণ সেনও মাকে দেখিতে আসিতেন। তারপরে কবিরাজ শ্যামাদাসকে পুনরায় আনয়ন করা হয়। তাঁহার ছাত্র কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক নিত্য আসিয়া মাকে দেখিয়া যাইতেন ও স্বহস্তে ঔষধ তৈয়ার করিয়া দিতেন। শেষ তিনদিন ডাঃ কাঞ্জিলাল হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়াছিলেন। একদিন ডাঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও একদিন ডাঃ নীলরতন সরকারকে আনয়ন করা হইয়াছিল। ডাঃ জে-এম্-দাশগুপ্ত মার রক্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

[৪] স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন ঃ শ্রীশ্রীমার জন্য পূজনীয় শরৎ-মহারাজ যত স্বস্ত্যয়ন করাইয়াছিলেন, তাহার সকলগুলিতেই আমি উপস্থিত ছিলাম। মার বাড়ীতে কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা এবং কমলাত্মিকা—এই পাঁচটি মহাবিদ্যার অর্চনা আর পাঁচটি গ্রহপূজা হয়। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীতে শতরূপ চণ্ডীপাঠ হইয়াছিল। সর্বশেষ বারাসতের শ্মশানে একটি স্বস্ত্যয়ন হইয়াছিল। কোন স্বস্ত্যয়নেই কোনরূপ ত্রুটি বা বিঘ্ন হয় নাই।

পিতাব কাছে চলিয়া আসে, পিতা কালীঘাটে থাকিতেন। সে শুনিয়াছিল মা উদ্বোধন-আপিসের বাড়ীতে থাকেন। উহা কোথায় বা কোন্ পথে সেখানে যাইতে হয়, কিছুই না জানিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে পাড়ার একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়া ট্রামে উঠিয়া পড়িল। ট্রামে দুই-এক জনকে উদ্বোধন আপিসের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া সে সঠিক সংবাদ পাইল না, বীডন-বাগানের কাছে নামিয়া পড়িল। সেখানে দুইচারি জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে আবার ট্রামে উঠিল। এইরূপে উদ্বোধন-আপিসে গিয়া যখন পৌঁছিল, তখন বৈকাল হইয়া গিয়াছে। মার বাড়ীতে এই সময়ে পাহারা ছিল, সকলকে উপরে যাইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু বিনয়বালা যখন যায়,তখন কেহ পাহারায় ছিল না। সে সিঁড়ি বাহিয়া উপবে চলিয়া গেল। মা ঘর হইতে বাহিব হইয়া আসিয়া বলিলেন, 'তুমি মা আমাব কাছে মন্ত্র নিতে এসেচ! ওখানে কলঘব আছে, তুমি গিয়ে হাত-পা ধুয়ে এস—তোমাকে মন্ত্র দেব।' বিনয়বালা বলিল, 'মন্ত্র নিবার জন্য আমি তো কিছুই নিয়ে আসি নাই!' মা বলিলেন, 'তোমাব ওসব কিছু লাগবে না।'

"যখন দেহরক্ষার পূর্বে শ্রীশ্রীমার কঠিন পীড়া হয়, তখন একদিন বিনয়-বালা মার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। তখন এমন কড়া পাহারাব ব্যবস্থা যে, প্রবীণ ভক্তেরাও উপরে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু ঘটনা এমনই হইল, বিনয়বালা যখন যায়, পথে বা সিঁড়িতে কেহই পাহারায় নাই। সে সোজা মার ঘরে চলিয়া গেল। মা তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'মা এসেচ? ব'স মা, ব'স। এবার এমন অসুখ হ'য়েচে যে আর শরীর থাকে না! তুমি এসেচ, ভাল হ'য়েচে। ছাখ মা, ছেলেরা কখন এসে প'ড়বে বলা যায় না; আমার পাটা একটু টিপে দাও তো—কেমন ব্যথা হ'য়েচে।'

"শ্রীশ্রীমার অশেষ কৃপা পাইয়া বিনয়বালা অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। বিনয়বালাকে তারপর যখনই দেখিয়াছি, তাহার মুখে কেবলই ঠাকুর ও মার কথা—যেন আনন্দে বিভোর হইয়া আছে। দরিদ্রের সংসার, গৃহে কেহই ঠাকুরের ভক্ত ছিল না, কিন্তু বিনয়বালার আনন্দের সীমা ছিল না! কিছুদিন পরে ক্ষয়রোগে তাহার জীবনান্ত হয়।"

* * * *

এই অসুখের মধ্যেও শ্রীশ্রীমাকে স্বজনবিয়োগ-জনিত তিনটি আঘাত পর পর সহ্য করিতে হইল। ১৩২৭ সালের ১১ই বৈশাখ তাঁহার দক্ষিণেশ্বরের সেবক স্বামী অদ্ভুতানন্দ ৺কাশীধামে মহাসমাধি লাভ করিলেন; ৩১শে বৈশাখ তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ও পরমভক্ত রামকৃষ্ণ বসু কলিকাতায় এবং ৬ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার চতুর্থ সহোদর বরদাপ্রসাদ নিউমোনিয়া-জ্বরে জয়রামবাটীতে দেহত্যাগ করিলেন। তিনটি সংবাদ শুনিয়াই মা অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন।

সময় নিকট জানিয়া শ্রীশ্রীমা তাঁহার মায়িক অবলম্বন রাধারাণীর উপর হইতে মন তুলিয়া লইলেন। রাধুকে সর্বশেষে কেবল এই কথাটি বলিয়াছিলেন, 'তুই আমার কি ক'রবি, আমি কি মানুষ?*' তারপরে স্বামী সারদানন্দকে ডাকাইয়া আনিয়া, তাঁহার অদর্শনে যাহারা নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবে তাহাদের ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত করিলেন। বিভূতিবাবু বলেন ঃ দেহরক্ষার প্রায় সাতদিন পূর্বে, আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় মা আমাকে বলিলেন, 'বিভূতি, শরৎকে ডেকে নিয়ে এস।' আমি নীচে যাইয়া শরৎ-মহারাজকে বলিলাম,'মহারাজ, মা আপনাকে ডাকচেন।' মহারাজ বলিলেন, 'যাচ্চি।' আমি তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া দেখি,মা অপলক-নেত্রে চাহিয়া আছেন। দুইতিন দিন পূর্বে তাঁহাকে মেঝের উপর বিছানায় শোয়ানো হইযাছে। আমি বলিলাম, 'মা, মহারাজ আসচেন।' মা বলিলেন, 'তুমি আমাকে জোরে হাওয়া কর।' আমি বড় পাখাটা নিয়া হাওয়া করিতে লাগিলাম। শরৎ-মহারাজ আসিলেন; আসিয়াই মার পায়ের তলায় বাঁদিকে হাঁটু গাড়িয়া বুক নীচু করিয়া বসিয়া যেমন মার হাতের উপরে নিজের হাত বুলাইতে যাইবেন, মা অমনি শরৎ-মহারাজের ডান হাতটি নিজের বাঁ হাতের নীচে রাখিয়া বলিলেন, 'শরৎ, এরা সব রইল।' সেই সময়ে মার মুখ খুব কাতর দেখা গেল। মা হাত সরাইয়া নিলেন; মহারাজ আস্তে আস্তে দাঁড়াইয়া পেছন দিকে হাঁটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

* কি অর্থে যে শ্রীশ্রীমা এই কথাটি বলিয়াছিলেন, বলা কঠিন। রাধুও ঠিক বুঝিতে পারে নাই। আমাদিগকে সে বলিয়াছিল, 'আমি তো তাঁকে নিজের পিসীমা ব'লেই জানতুম। আমি কি জানতুম যে তিনি মানুষ নন, দেবতা? ঐ কথাটি ব'লে তিনি আর আমাকে কিছু ব'লবার সুযোগ দেন নাই—অজ্ঞান (?) হ'য়ে গেছলেন।

প্রথম প্রথম কেবল শ্রীমতী সরলা ও মন্দাকিনী শ্রীশ্রীমার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। কিন্তু যখন মার শরীরের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়িল ও সর্বদাই নিকটে লোক থাকা আবশ্যক বিবেচিত হইল তখন, শ্রীমতী সুধীরার বন্দোবস্তে, শ্রীমতী মীরা, চপলা, প্রফুল্ল, বাণী প্রভৃতি নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের মেয়ে-ভক্তেরা পালাক্রমে সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৬]

সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, চিকিৎসা-সূত্রে আগত ডাক্তার-কবিরাজ-দিগকে দর্শনাদি দানে কৃতার্থ করিয়া শ্রীশ্রীমা সন ১৩২৭ সাল বা ১৮৪২ শকাব্দে, সৌর শ্রাবণের চতুর্থ দিনে, মঙ্গলবারে, রাত্রি ১৬ দণ্ড ৫৩ পল সময়ে স্থূলদেহে লীলা সম্বরণ করিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই কমলা ঘোষ স্বপ্ন দেখিলেন, মা বলিতেছেন, 'বৌমা, আমার কায়া গেছে, ছায়ার মতন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।' ইহার পরের বৎসর ৺দেবী-পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় উমেশবাবুকে লিখিতেছেন ঃ সেদিন স্বপ্ন দেখিলাম, মা বলিতেছেন, 'তুমি আমার দেহত্যাগ যা দেখিয়াছিলে, সে দেহ মায়িক ; এই দেখ আমি সেইরূপই রহিয়াছি।'

শ্রীশ্রীমার জনৈক সন্ন্যাসী সন্তান বলিয়াছেন ঃ কলিকাতায় মার বাড়ীর অতি নিকটে বাস করিলেও শেষের দিকে দীর্ঘকাল আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই নাই। কেবল একদিন মাত্র ব্রহ্মানন্দ-মহারাজের দেওয়া দুইটি আম তাঁহাকে দিতে গিয়াছিলাম। তারপর মা দেহরক্ষা করিলেন, মহারাজেরও শরীর গেল—নিজেকে নিরাশ্রয় জ্ঞান করিতে লাগিলাম। এইরূপ অবস্থায় একদিন রাত্রে মা একজনকে দেখা দিয়া বলিলেন, ('আমার

---

৬ বিদ্যালয়ের কাজ শেষ করিয়া সুধীরার সাথে মীরা আসিতেন ও উভয়ে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মার কাছে অবস্থান করিতেন। অতঃপর চপলা রাত্রি ২টা পর্যন্ত ও প্রফুল্ল ভোর ৫টা পর্যন্ত থাকিতেন। বাণী, মালতী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম বয়সের মেয়েরা দিনের বেলা থাকিয়া মাকে বীজন করিতেন। এতদ্ব্যতীত দুইজন সেবক, সাতু ও বরদা (অসিতানন্দ ও ঈশানানন্দ), প্রয়োজনীয় যে-কোন কাজ করিবার জন্য দিবা ও রাত্রির অধিকাংশ সময় উপস্থিত থাকিতেন।

নাম করিয়া) অমুক তোমার কাছে আছে, তুমি ওকে দেখো। ও বড় অভিমানী, আমাকে ভাবে আমি নিষ্ঠুর! ও জানে না, ঠাকুর পর্যন্ত আমাকে ব'লতেন, দয়াময়ী।' এই কথা কহিয়া মা অজস্র ক্রন্দন করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন, 'ওর এই অভিমানের জন্যে আমার যে কত কষ্ট হয় তা সে একেবারেই বুঝে না!' যাহাকে মা এই স্বপ্ন দিয়াছিলেন, ইহ জীবনে সেই এখন আমার একমাত্র বন্ধু।

১৩৩৯ সালে দোল-পূর্ণিমার দিন আবীর খেলার সময় কোন ছেলের অসাবধানতা-বশতঃ সুষমাসুন্দরী দেবীর কানের ঠিক পেছনে রঙের ঘটীর আঘাত লাগে ও তিনি মূর্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িয়া যান। তাঁহার কান দিয়া প্রথম দুইএক দিন জল পড়িবার পর রক্ত ও পূঁজ পড়িতে আরম্ভ করিল এবং অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। স্বামীর অর্থার্জন যথেষ্ট না থাকায় তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করানো সম্ভবপর হইল না। অনন্যোপায় দম্পতী জীবনের একমাত্র আশ্রয় ও ভরসার স্থল শ্রীশ্রীমার শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঁচ-মাস অতীত হওয়ার পর ৺জন্মাষ্টমীর রাত্রে যন্ত্রনা ভীষণাকার ধারণ করিল, এবং ঘা মাস্তিষ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রাত্রের মধ্যেই একটা কিছু হইয়াযাইবে এইরূপ নিশ্চিত অভিমত দিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। সেই রাত্রে রোগিণী অনবরত ভুল বকিতে বকিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'আমার ঘাড়ের উপর কে বসল? আমি কি এত ভার সইতে পারি? আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শীগ্‌গির আলো জ্বাল,দেখি।' তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, 'মা এসে-ছিলেন, তাঁর পরণে লাল নরুণপেড়ে কাপড়।' তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং পরদিন ডাক্তার আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, রোগ সারিয়া গিয়াছে; কানের ভিতর আঁচড়ের দাগের মত দেখা যাইতেছে, তাহা ছাড়া কোথাও কিছু নাই! তিনচারি দিন পরে তাহাও আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

প্রমীলাবালা বসু লিখিতেছেন: আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রবোধকুমার সিংহ—তখন বয়স কুড়ি একুশ বৎসর হইবে—বোম্বাই প্রদেশের ধারোয়ার নামক স্থানে ছিল এবং সেখানে সে প্রত্যহ বিকালে নদীর তীরে বসিয়া গীতাপাঠ করিত। একদিন হঠাৎ একটা গরু নদীর ওপার হইতে আসিয়া

তাহার কাছে শুইয়া পড়ে। সে নিজের ভাবেই গীতাপাঠ করিতেছিল আর গরুটা থাকিয়া থাকিয়া তাহার কোলের উপর মুখখানা তুলিয়া দিতেছিল। সে উহার মুখ বারবার কোল হইতে নামাইয়া দিলেও, গরুটা নিবৃত্ত না হওয়ায় পাঠের ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া, একটু বেশী জোরে মুখখানা সরাইয়া দেয়। ইহার অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, গরুটা মারা গিয়াছে। হিন্দুর ছেলে হইয়া গো-হত্যা করিলাম ভাবিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ফিরিয়া কাহারও সহিত দেখা করিল না, এক নিভৃত ঘরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর- ও শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ করিয়া গো-হত্যা-জনিত পাপ মোচন করিবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। ভোররাত্রিতে মা তাহাকে দেখা দিয়া কহিলেন, 'বাবা, তুমি গো-হত্যা কর নাই। গরুটার তিনদিন থেকে অসুখ ছিল, তোমার মুখে গীতা শুনে সে গো-জন্ম থেকে মুক্ত হ'ল'।' তৎক্ষণাৎ তাহার সকল অশান্তি দূর হইয়া গেল। পরদিন সে যখন নদীর তীরে যাইয়া গীতাপাঠ করিতে বসিয়াছে, একটি রাখাল ওপার হইতে আসিয়া বলিল, 'আমাদের একটা গরু কাল বিকেলে ওপার থেকে এসে মারা গেছে। গরুটা তিনদিন কিছুই খায় নি, মরে যাবে মনে করে মালিক তার গলার দড়ি খুলে রেখেছিল।' ধারোয়ারে যখন এই ব্যাপার ঘটে, শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। পরে কলিকাতায় আসিলে আমি তাঁহাকে সকল কথা নিবেদন করিয়া বলিলাম, 'মা, ভক্ত কাতর হয়ে ডাকলে আপনি কোথায় না যান?' মা হাসিতে লাগিলেন।

* * * *

শ্রীশ্রীমা একদিন বলিয়াছিলেন, 'তিনি [ঠাকুর] শতবৎসর সূক্ষ্মশরীরে ভক্তহৃদয়ে বাস ক'রবেন ব'লেচেন ; [১] আর তাঁর অনেক শ্বেতাঙ্গ ভক্ত আসবে!' [গ] স্বামী বিবেকানন্দ 'বেলুড়-মঠের নিয়মাবলী' পুস্তিকায়

[১] "শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের কথা বলিতেছিলেন, তাহা শুনিতে শুনিতে বলিলাম, 'মা, ঠাকুর শরীর ধারণ ক'রে জগৎকে এলেন, কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম নাই!' তাহাতে মা নিজের শরীর দেখাইয়া বলিলেন, 'এর ভিতর তিনি সূক্ষ্মদেহে আছেন। ঠাকুর নিজমুখে ব'লেছিলেন, আমি তোমার ভিতর সূক্ষ্মদেহে থাকব।' "—স্বামী কেশবানন্দ লিখিত 'শ্রীশ্রীমার অস্ফুট স্মৃতি।'

লিখিয়াছেন, 'শ্রীভগবান এখনও রামকৃষ্ণ-শরীর ত্যাগ করেন নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে এখনও সেই শরীরে দেখিয়া থাকেন ও উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং সকলেই ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতে পারেন। যতদিন তিনি পুনর্বার স্থূলশরীরে আগমন না করিতেছেন ততদিন তাঁহার এই শরীর থাকিবে।'

শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুর হইতে অভিন্না। ঠাকুর হইতে তাঁহার ভিন্নরূপ অস্তিত্ব কল্পিত হইতে পারে না। তিনিও আজ সূক্ষ্মদেহে ভক্তহৃদয়বাসিনী। জীবনের বিশেষ সঙ্কট-মুহূর্তে ও মনের অতিব্যাকুল অবস্থায় ভক্ত-সন্তান তাঁহার দর্শনাদি লাভ করিয়া যেরূপে কৃতার্থ হইতেছে, উপরিধৃত ঘটনাগুলি তাহার নিদর্শন।

নরলীলায় অবলম্বিত স্থূলসূক্ষ্ম উভয়বিধ দেহ পরিত্যক্ত হইলেও শ্রীভগবানের লীলা-বিগ্রহ বিনষ্ট হয় না। সে চিন্ময় বিগ্রহ নিত্যবৃন্দাবনে নিত্যকাল বর্তমান থাকিয়া রাস-রসে বিভোর। ঠাকুরের শ্রীমুখের উক্তি,—'লীলাও সত্য।'

নিম্নোক্ত ঘটনায় ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীশ্রীমার নিত্যলীলার আভাস পাওয়া যায়। বলরামবাবুর বাড়ীর ছাদে বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে একদিন মা সমাধিস্থ হন। পরে বাহ্য-সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে বলিয়াছিলেন, "দেখলুম, কোথায় চলে গেছি। সেখানে সকলে আমাকে কত আদরযত্ন ক'চ্চে। আমার যেন খুব সুন্দর রূপ হ'য়েচে। ঠাকুর রয়েচেন সেখানে, তাঁর পাশে আমাকে আদর ক'রে বসালে। সে যে কি আনন্দ, ব'লতে পারি নি। একটু হুঁস হ'তে দেখি যে, শরীরটা প'ড়ে রয়েচে। তখন ভাবচি, কি ক'রে এই বিশ্রী শরীরটার ভিতর ঢুকব? ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছে হ'চ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পাল্লুম ও দেহে হুঁস এল'।"[৮]

শতবৎসর ভক্তহৃদয়ে বাস করিয়া ঠাকুর পুনরায় নরদেহে অবতীর্ণ হইবেন; শ্রীশ্রীমাও সেই সঙ্গে আসিবেন। নলিনবাবু একদা মাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, সব অবতারেই কি আপনি এসেচেন?' মা উত্তর দেন, 'হ্যাঁ বাবা।'

আশুতোষ রায় নামে এক ব্যক্তি কখন কখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন

---

৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা।

করিতে যাইতেন। তিনি খর্বকায় ছিলেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে 'ঝুনো সরষে' বলিয়া ডাকিতেন এবং তাঁহার হাত তোল করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোর হবে, তবে একটু দেরীতে।' তিনি পরে শিলঙে কম্প্‌ট্রোলারের আপিসে কাজ পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার বাসাস্থিত হরিসভায় ও অন্যান্য ভক্তদের বাড়ীতে ঠাকুরের ভক্তগণ মিলিত হইয়া কথামৃত-পাঠ ও কীর্তনাদি করিতেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম যুক্ত হইয়া আপিস যখন ঢাকায় স্থানান্তরিত হইল তখন ভক্তদের প্রায় সকলেই ঢাকায় আসিলেন বটে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে আলোচনাদি একরূপ বন্ধ হইল। তখন ঢাকায় মোহিনীবাবুর বাড়ীতে রামকৃষ্ণ-মিশনের উৎসবাদি হইত এবং যাহার ইচ্ছা উহাতেই যোগদান করিতেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম বিচ্ছিন্ন হইয়া ঢাকার আপিস উঠিয়া গেলে ঐ দলের অনেকে রাঁচিতে বদলি হইলেন; সেই সময়েও নিজেদের মধ্যে আলোচনাদি বন্ধ থাকে। এরূপ অবস্থায় রাঁচিতে একদিন গভীর রাত্রে কাহার ডাক শুনিয়া আশুবাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি 'ও ঝুনো সরষে!' আহ্বান শুনিয়া চমকিয়া উঠেন; কারণ, ঠাকুর ব্যতীত তাঁহার ঐ নাম আর কেহ জানিত না। মাঘী পূর্ণিমা—রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। দরজা খুলিয়া দেখেন ঠাকুর রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া—পরিধানে গৈরিকবস্ত্র, পায়ে খড়ম, হাতে চিমটা। ঠাকুর আশুবাবুকে বলিলেন, 'এখানকার কিছু কথা হ'ত'। তা ঢাকায় না হয় দরকার না ছিল, এখানে ওটি বন্ধ কেন ক'ল্লে? উটি কোরো না।' এই কথা বলিয়াই ঠাকুর অন্তর্হিত হন।

এই ঘটনা সম্বন্ধে স্বামী অরূপানন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীমার নিম্নোক্তরূপ কথাবার্তা হয়ঃ "মা, খড়ম-পায়ে, চিমটে-হাতে কেন দেখলে?" "সন্ন্যাসীর বেশ। তিনি যে বাউল-বেশে আসবেন ব'লেচেন। বাউল-বেশ—গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি, এতখানি দাড়ি। ব'ল্লেন, 'বর্ধমানের রাস্তায় দেশে যাব। পথে কাদের ছেলে হাগবে, হয়তো ভাঙ্গা কড়ায় রান্না হবে, ভাঙ্গা পাথর-বাসন হাতে, ঝুলি বগলে।' যাচ্চেন তো যাচ্চেন, খাচ্চেন তো খাচ্চেন—কোন দিক্‌-বিদিক্ খেয়ালই নাই!" "বর্ধমানের রাস্তা কেন?" "ঐ দিকে দেশ।" "তবে কি বাঙ্গালী?" "হ্যাঁ বাঙ্গালী। আমি শুনে ব'ল্লুম, 'ও কি গো, তোমার একি সাধ?' তিনি হেসে ব'ল্লেন, 'হ্যাঁ, তোমার

হাতে হুঁকো-কল্‌কে থাকবে।' যখন বৃন্দাবনে যাই, ছেলেরা সবাই রেল থেকে নেমে চলেচে, পেছনে আমরা। গোলাপ জিনিষপত্র সকলকে নামিয়ে দিচ্ছিল। আমার হাতে লাটুর হুঁকো-কল্‌কে দিয়েচে—ওরা ফেলে গেছে। লক্ষ্মী ব'লচে, 'এই তোমার হুঁকো-কল্‌কে ধরা হ'য়ে গেল!' আমিও 'ঠাকুর, ঠাকুর, এই আমার হুঁকো-কল্‌কে ধরা হ'য়ে গেল'—ব'লেই অমনি ফেলে দিয়েচি।" [গ]

নিকুঞ্জদেবীকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন একদিন [ঠাকুর] ব'ল্লেন, 'তুমি আর লক্ষ্মী কে, আমি জানতে পেরেচি, তোমাদের ব'লব না। তোমার ধার শোধবার জন্মে আমি বাউল হব আর তোমাকে সঙ্গে নেব।'

এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা আরও বলিয়াছিলেন: লক্ষ্মী ব'লেছিল, 'আমাকে তামাক-কাটা ক'ল্লেও আর আসচি না।' তিনি হেসে ব'ল্লেন, 'আমি যদি আসি তো থাকবি কোথা? প্রাণ টিকবে না। কলমীর দল, এক জায়গায় ব'সে টানলেই সব আসবে।' [গ]

তারকনাথ রায়চৌধুরী একদা শ্রীশ্রীমাকে এই মর্মে পত্র লিখেন,—'মা, আমার জন্মভূমি শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাস্থান হইতে বহুদূরে; তাহার লীলা দর্শন করা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। আমার সাধ, ঠাকুর যখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আবার আসিবেন তখন আমি তাঁহার নবলীলা দেখিতে পাই।' উত্তরে মা লিখিয়াছিলেন, 'তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।'

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীমার কোষ্ঠী-বিচার

জন্ম-শকাব্দাদি—১৭৭৫।৮।৭।২৮।৩০ বৃহস্পতিবার।

জন্ম—১২৬০ সাল, ৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার; সূর্যোদয় হইতে জন্ম দং ২৮।৩০ পল; রাত্রি জন্ম দং ২।৯ পল।

ইংরাজী তারিখ—২২শে ডিসেম্বর, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

জন্মে কৃষ্ণা সপ্তমী, মিথুনলগ্ন, সিংহরাশি, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র নরগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ, আয়ুষ্মান্ যোগ।

জন্মে বিংশোত্তরী মতে রবির দশা, ভোগ্য বর্ষাদি ৫।১১।১৯ দিন।

জন্মে অষ্টোত্তরী মতে মঙ্গলের দশা, ভোগ্য বর্ষাদি ২।৭।২৫ দিন।

জন্ম সময়ে গ্রহস্ফুট

রবি ৮।৯।১৯
চন্দ্র ৪।২৬।৫৪
মঙ্গল ৪।২২।১৫
বুধ ৭।১৭।৩২
বৃহস্পতি ৮।১৩।২৪
শুক্র ৯।২৬।৩১
শনি ১।৪।৩৯ (বক্রী)
রাহু ১।১৮।২
কেতু ৭।১৮।২
লগ্ন ২।১৯।৩০
দশম ১১।১০।৩০
অয়নাংশ ২১°।২২′

শ ৩ (বং)
রা ৪
লং
জন্মকুণ্ডলী
শু ২৩
ম ১১
চ ১২
বু ২০
র ১৯
কে ১৮
বৃ ১৮

অয়নাংশ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। কোনও মতে ১২৬০ সালের অয়নাংশ ২১° অংশ ৪৮′ কলা হয়। ইহা গ্রহণ করিলে উপরিলিখিত প্রত্যেক গ্রহস্ফুট হইতে ২৬′ কলা বিয়োগ করিতে হইবে এবং শ্রীশ্রীমার জন্মনক্ষত্র পূর্ব্বফল্গুনী, বিংশোত্তরী শুক্রের দশা ভোগ্য বর্ষাদি ০।৬।১৮ এবং অষ্টোত্তরী মঙ্গলের দশা ভোগ্য বর্ষাদি ২।৮।২৬ হইবে।

তিরোভাব—১৩২৭ সাল, ৪ঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবার, রাত্রি ১টা ৩০ মিনিট অর্থাৎ রাত্রি

১৬ দণ্ড ৫৩ পল। ইংরাজী ২০শে জুলাই, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ। শুক্লা ষষ্ঠী, কন্যারাশি, হস্ত-নক্ষত্র, শিবযোগ।

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ জননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর যে সকল জন্মপত্রিকা প্রচলিত আছে তাহাতে জন্মসময়ের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। ১২৬০ সালে অর্থাৎ প্রায় ৮৭ বৎসর পূর্বে সুদূর বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। সুতরাং জন্মসময় যে সঠিকভাবে রক্ষিত হয় নাই ইহা আশ্চর্য নহে। তাঁহার সাতখানি জন্মপত্রিকা পাইয়াছি তাহাতে লিখিত জন্মসময়গুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

	জন্মপত্রিকা	জন্মতারিখ ও সময়
১।	বেলুড়মঠে রক্ষিত ৺নারায়ণচন্দ্র (জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় প্রণীত	শকাব্দাদি ১৭৭৪।৮।৭।২৮।৩০ রাত্রি জাত দং ২।২
২।	জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরে রক্ষিত ...	শকাব্দাদি ১৭৭৩।৮।৭।২৯।০৮
৩।	স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক শ্রীযুত আশুতোষ মিত্রকে প্রেরিত ...	শকাব্দাদি ১৭৭৫।৮।৭।২৯।৪৮।১৬
৪।	শ্রীযুত গণেন-মহারাজের নিকট রক্ষিত ...	শকাব্দাদি ১৭৭৫।৮।৭।২৯।৪৮।১৬
৫।	শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র ঘটক মহাশয় প্রেরিত ...	শকাব্দাদি ১৭৭৫।৮।৭।২৬।২১
৬।	শ্রীযুত গৌরীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় প্রেরিত .	শকাব্দাদি ১৭৭৫।৮।৭।২২।১৮।১৬
৭।	শ্রীযুত কালীকুমার সিংহ মহাশয় প্রণীত ও শ্রীযুত অক্ষয়কুমার সেন কর্তৃক স্বামী সারদানন্দের নিকট প্রেরিত এবং সাপ্তাহিক 'ভারত' পত্রিকায় (১৬ই পৌষ ১৩৪৩) প্রকাশিত	শকাব্দাদি ১৭৭৫।৮।৭।২২।১৮।১৬

এই জন্মপত্রিকাগুলিতে লিখিত জন্মতারিখ ও রাশিচক্রে গ্রহসংস্থান সম্বন্ধে কোন মতভেদ দেখা যায় না, কিন্তু জন্মসময় সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। ১নং কোষ্ঠীতে জন্মশকাব্দা ১৭৭৪ লিখিত আছে, ইহা "১৭৭৪ গতে" এইরূপ বুঝিতে হইবে। ২নং কোষ্ঠীতে জন্মশকাব্দা ভুল লেখা আছে।

কোষ্ঠীগুলিতে দিবামান ২৬ দণ্ড ২৩ পল লিখিত আছে। এই দিবামান অনুসারে ৬নং ও ৭নং কোষ্ঠীতে প্রদত্ত জন্মসময় ২২ দণ্ড ১৮ পল ১৬ বিপল সূর্যাস্তের প্রায় ৪ দণ্ড পূর্বে পড়ে এবং বৃষলগ্নে জন্ম হয়। অন্য সকল কোষ্ঠীগুলির জন্মসময় ঠিক সূর্যাস্তকালে বা সূর্যাস্তের পর এবং উক্ত সময় অনুসারে মিথুনলগ্ন পাওয়া যায়। বৃষলগ্ন হইলে সপ্তমভাব

অত্যন্ত পীড়িত হয় এবং অন্যান্য কারণে শ্রীশ্রীমার স্বামি-সৌভাগ্য, অপূর্ব দাম্পত্যজীবন ইত্যাদি তাঁহার জীবনের বিশেষ ফলগুলির মিল হয় না। এইজন্য এই জন্মসময় ও বৃষলগ্ন গ্রহণ করা যায় না।

৫নং কোষ্ঠীতে প্রদত্ত জন্মসময় ২৬ দণ্ড ২১ পল ঠিক সূর্যাস্তকালে পড়ে। দিবরাত্রির সন্ধিক্ষণ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকাল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের গৃহে আহ্নিকপূজার প্রশস্ত সময়। সূর্যাস্তকালে জন্ম হইলে উহা সকলেরই মনে থাকা সম্ভব এবং কোষ্ঠীগুলিতে বিভিন্ন জন্মসময় লিখিত হইত না। এই কোষ্ঠীখানিতে গ্রহস্ফুটগুলিও ঠিক নাই। রবি ধনুর ১২ অংশ এবং লগ্ন মিথুনের ১২ অংশ দেওয়া আছে। ইহা হইতে উক্ত কোষ্ঠীতে লিখিত ৮ই পৌষ তারিখে জন্ম পাওয়া যায় না, ১২ই পৌষ তারিখে জন্ম হয়। ইহা অবশ্যই ঠিক নহে।

শ্রীযুত গণেন-মহারাজের নিকট সযত্নে রক্ষিত, তুলট কাগজে লেখা, অতি পুরাতন ও জীর্ণ যে জন্মপত্রিকাখানি দেখিয়াছিলাম তাহা বর্তমান সকল কোষ্ঠীর মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া মনে হয়। ইহা শ্রীশ্রীমার বাল্যকালে প্রস্তুত ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইবে। স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক প্রেরিত ও জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরে রক্ষিত দুইখানি কোষ্ঠীরই জন্মসময় ও অন্যান্য বিষয় এই পুরাতন কোষ্ঠী হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। ইহাতে জন্মসময় ২৯ দণ্ড ৪৮ পল অর্থাৎ রাত্রি ৩ দণ্ড ২৬ পল লিখিত আছে। তখনকার দিনে পল্লীগ্রামে ঘড়ির অভাবে সঠিক জন্মসময় রাখা সম্ভব নহে। এই কারণে জন্মসময় রাত্রি ৩ দণ্ড ২৬ পল গ্রহণ করিতে আপত্তি থাকিতে পারে। এই জন্মসময়ের সহিত কোষ্ঠীতে লিখিত দণ্ডাধিপ এবং লগ্নের বর্গগুলির সামঞ্জস্য হয় না।

এই কোষ্ঠীতে লিখিত আছে,—বৃহস্পতির যামার্ধে, রবির দণ্ডে মিথুনলগ্নে জন্ম এবং লগ্ন বুধের ক্ষেত্রে, চন্দ্রের হোরায়, শুক্রের দ্রেক্কাণে, বৃহস্পতির নবাংশে, শনির দ্বাদশাংশে ও বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে। স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রেরিত কোষ্ঠীতে অবিকল ঐগুলি লিখিত আছে। জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরে রক্ষিত কোষ্ঠীতে লগ্নের বর্গগুলির উল্লেখ নাই। রাত্রি ৩ দণ্ড ২৬ পল সময়ে রবির দণ্ড কিংবা ঐ সময়ের লগ্নস্ফুট (মিথুনের ২৭° অংশ) শুক্রের দ্রেক্কাণ, বৃহস্পতির নবাংশ, শনির দ্বাদশাংশ এবং বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ পায় না।

কোষ্ঠীগুলিতে লিখিত রাত্রিমান অনুসারে ২ দণ্ড ৭ পল হইতে ৩ দণ্ড ৯ পল পর্যন্ত বৃহস্পতির যামার্ধে রবির দণ্ড পাওয়া যায়। সুতরাং জন্মসময় রাত্রি ২ দণ্ড ৭ পল হইতে ৩ দণ্ড ৯ পল মধ্যে একরূপ মনে করা অবশ্যই অসঙ্গত হইবে না। রাত্রি ২ দণ্ডের পর মাত্র কয়েক পল সময়ের মধ্যে জন্ম হইলে ত্রিংশাংশ ভিন্ন লগ্নের উপযুক্ত অন্য বর্গগুলি পাওয়া যায়। লগ্ন বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ পায় না, বুধের ত্রিংশাংশে পড়ে।

এই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জীবন-কথা পর্যালোচনা করিয়া,

৺নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় প্রণীত, বেলুড় মঠে রক্ষিত তাহার জন্মপত্রিকায় যে রাত্রি ২ দণ্ড ৯ পল জন্মসময় লিখিত হইয়াছে, সেই জন্মসময় গ্রহণ করা সঙ্গত বোধ করি।

১২৬০ সালের ৮ই পৌষ তারিখে রাত্রি ২ দণ্ড ৯ পল সময়ে মিথুনের ১৯ অংশ ৩০' কলা উদিত হইয়াছিল। তখন লগ্নের তৃতীয়ে চন্দ্র মঙ্গল, ষষ্ঠে কেতু বুধ, সপ্তমে রবি বৃহস্পতি, অষ্টমে শুক্র এবং দ্বাদশে শনি রাহু অবস্থিত ছিল।

শ্রীশ্রীমার স্বামি-সৌভাগ্য, অলৌকিক দাম্পত্যজীবন, অসাধারণ চরিত্রবল, সহিষ্ণুতা এবং অপূর্ব মাতৃভাব তাহার পরম বিশেষত্ব ছিল। এই সকল কারণে তিনি সর্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত। এইরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহগুলি শুভভাবে অবস্থিত থাকিবে এইরূপ আশা করা যায়। কেন্দ্র ও ত্রিকোণ শুভস্থান। পরাশর মতে কেন্দ্র ও ত্রিকোণপতির সম্বন্ধ হেতু অর্থ, যশ, সম্মান ও সৌভাগ্য সূচক রাজযোগ হয়। এইরূপ কোন নির্দোষ রাজযোগ তাহার জন্মকুণ্ডলীতে নাই। বরং অধিকাংশ গ্রহ দুঃস্থানগত অর্থাৎ ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশস্থ হওয়ায় অশুভফলপ্রদ। লগ্ন হইতে রাশিচক্রের যেরূপ ফল বিচার করা হয় জন্মরাশি হইতেও সেইরূপ বিচার হইয়া থাকে। এস্থলে জন্মরাশি সিংহ। শুক্র ভিন্ন অন্য সকল গ্রহগুলি সিংহরাশির কেন্দ্র-ত্রিকোণে অর্থাৎ শুভস্থানে অবস্থিত এবং শুভফলপ্রদ। জন্মলগ্ন এবং জন্মরাশি হইতে ফলের বিভিন্নতা হইতেছে। শ্রীশ্রীমার গৌরবময় জীবনকাহিনী আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার জন্মকুণ্ডলী হইতে স্পষ্ট বুঝা কঠিন।

লঘুপারাশরী মতে কেন্দ্র ও ত্রিকোণপতি স্বয়ং দোষযুক্ত হইলেও সম্বন্ধ হেতু বলবান এবং যোগকারক হন। গ্রহগণ যে ভাবের যোগকারক হন সেই ভাবের পুষ্টিসাধন অর্থাৎ শুভফলের বৃদ্ধি এবং অশুভ ফলের হ্রাস করেন। নির্দিষ্ট ভাব হইতে কেন্দ্র ত্রিকোণ ইত্যাদি স্থানে যোগকারক গ্রহের অবস্থিতি অনুসারে ভাবফলের হ্রাস বৃদ্ধির তারতম্য হইয়া থাকে। রাশিচক্রে যেরূপ লগ্ন হইতে যোগকারক নির্ণয় করা হয় সেইরূপ প্রত্যেক ভাবটিকে লগ্ন কল্পনা করিয়া তাহার যোগকারক এবং শুভ বা অশুভ ফলের হ্রাস বৃদ্ধি নির্ণয় করা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীমার জন্মকুণ্ডলীতে প্রত্যেক ভাবটিকে লগ্ন কল্পনা করিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে রাশিচক্রে গ্রহগুলি যে যে ভাবে অবস্থিত আছেন সেই সেই ভাবের এবং কোন কোন স্থলে তাহার কেন্দ্র ও ত্রিকোণ স্থানের যোগকারক হইয়াছেন। সিংহে মঙ্গল, মকরে শুক্র এবং বৃষে শনি প্রত্যেকটি উক্ত রাশি নির্দিষ্ট ভাবের যোগকারক। চন্দ্র মঙ্গল ও বৃহস্পতির যোগ লগ্ন হইতে ষষ্ঠ ও দশম ভাবের যোগকারক। শনি, রাহু ও বুধের যোগ চতুর্থ, অষ্টম, নবম ও দ্বাদশ ভাবের যোগকারক। রবি বৃহস্পতির যোগ তৃতীয় ও সপ্তম ভাবের যোগকারক। লগ্নে ও একাদশে বৃহস্পতির দৃষ্টি শুভসূচক। সুতরাং দ্বাদশ ভাবের মধ্যে দ্বিতীয় ও পঞ্চমভাব ভিন্ন বাকি দশটি ভাব শুভদৃষ্ট কিম্বা শুভযোগযুক্ত। যোগকারক গ্রহগুলি সম্বন্ধ হেতু বলবান এবং ভাবগুলির

শুভফল বৃদ্ধি ও অশুভফলের হ্রাস করিতেছেন। পাচটি গ্রহ দুঃস্থানে থাকা সত্ত্বেও রাশিচক্রে গ্রহদিগের যেরূপ স্থিতি ও পরস্পর সম্বন্ধ দেখা যায় তাহাতে তাঁহার জীবনের গতি যে সাধারণ মানবের মত নহে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

উপর্যুক্ত কারণে লগ্ন হইতে দুঃস্থানগত গ্রহগুলির অশুভফলের হ্রাস হইলেও তাহারা যে কিছু দুঃখদায়ক এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। সারদা দেবীর জীবনে দুঃখের নানা কারণ বর্তমান থাকিলেও তাঁহার জন্মকুণ্ডলীতে রবি চন্দ্র এবং লগ্ন পীড়িত না হইয়া, সাম্যভাবকারক বৃহস্পতির দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট থাকায় তিনি সুখ দুঃখ বিষয়ে সমভাবাপন্ন ছিলেন। বৃহস্পতির প্রভাব হেতু দুঃখ তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই।

রাশিচক্রের সপ্তমস্থান হইতে স্ত্রীলোকের স্বামী এবং সৌভাগ্য বিচার করিতে হয়। সপ্তমভাবে কোন পাপগ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি নাই। সপ্তমভাবস্ফুট বৃহস্পতি ও শুক্র এই দুইটি শুভগ্রহের মধ্যগত। ধনুরাশিতে গ্রহরাজ রবি মিত্রগ্রহ দেবগুরু বৃহস্পতির সহিত যুক্ত হওয়ায় বলবান এবং যোগকারক সুতরাং শুভফলপ্রদ হইয়াছেন। সপ্তমভাবে এই শুভযোগের ফলে তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণের ন্যায় যুগাবতারের পত্নী হইবায় সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং এই বিবাহ হেতু, তাঁহার জীবন পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হইতে পারে এরূপ অনুকূল অবস্থা ও সুযোগ পাইয়াছিলেন।

বৃহস্পতি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন। রবি মহত্ত্ব, শুচিতা, শক্তি ও সত্ত্বগুণ-প্রধান। এইজন্য সপ্তমে বৃহস্পতিযুক্ত রবির প্রভাবে তিনি কামনাশূন্য ছিলেন। তিনি স্বামীর উন্নতির অন্তরায় না হইয়া বরং তাঁহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির শীর্ষস্থানে আরোহণ করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য তাঁহার জীবনে যেমন বৈশিষ্ট্য, সেইরূপ বা ততোধিক বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের দাম্পত্যজীবন। বস্তুতঃ এই অপূর্ব দাম্পত্যজীবন তাঁহার চরিত্রকে অত্যন্ত মহিমান্বিত করিয়াছে। ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, ফলহারিণী কালিকা-পূজার রাত্রে ঠাকুর মাকে অভিষেক পূর্বক ষোড়শী-পূজা করেন। এই ঘটনাটি তাঁহাদের কামগন্ধহীন দাম্পত্যজীবনের পূর্ণ পরিচয়। এই সময়ে মার বয়স মাত্র ১৯ বর্ষ ৫ মাস। তখন তাঁহার বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশায় মঙ্গলের দশমস্থ বৃষরাশিগত শনির অন্তর্দশা এবং অষ্টোত্তরী বুধের দশায় বুধের দশমস্থ সিংহরাশিগত মঙ্গলের অন্তর্দশা ভোগ হইতেছে। এই গ্রহগুলির অবস্থিতি হিসাবে ইহাদের দশা ও অন্তর্দশা যে বিশেষ গৌরব ও সমুন্নতির সময় তাহা জ্যোতির্বিদ মাত্রেই বুঝেন।

সপ্তমপতি বৃহস্পতি অস্তগত, চন্দ্রের সপ্তমস্থানে একাধিক পাপগ্রহের দৃষ্টি এবং শুক্রের সপ্তমপতি চন্দ্র শুক্র হইতে অষ্টমস্থ, এই সকল যোগ পতিবিয়োগ-দুঃখ-দায়ক। তাঁহার ৩২ বর্ষ ৮ মাস বয়সে, বিংশোত্তরী রাহুর দশায় রাহুর সপ্তমস্থ পীড়িত বুধের অন্তর্দশায় এবং অষ্টোত্তরী অস্তগত সপ্তমপতি বৃহস্পতির দশা ও অন্তর্দশায় পরমহংসদেবের তিরোধান হয়।

লগ্নপতি বুধ ষষ্ঠস্থ ও পীড়িত। বুধ যুক্তিতর্ক ও রজোগুণের কারক। এইজন্য যাঁহাদের ভক্তিমার্গে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় তাঁহাদের জন্মকুণ্ডলীতে বুধের প্রাধান্য প্রায়ই দেখা যায় না। লগ্নপতি বুধ চারি বর্গে বৃহস্পতির বর্গগত, লগ্ন এবং চন্দ্র বৃহস্পতির দ্বারা দৃষ্ট, রবি স্বক্ষেত্রগত বৃহস্পতিযুক্ত। বৃহস্পতির এইরূপ প্রভাব হেতু তিনি সত্ত্বগুণসম্পন্ন, অসাধারণ সংযতচিত্ত, আত্মসমাহিত, উন্নতমন ও শক্তিশালিনী ছিলেন। দ্বাদশভাব মুক্তি, ত্যাগ ও সন্ন্যাসের সূচক। পঞ্চমভাব ভক্তি ও নবমভাব ধর্মানুষ্ঠান নির্দেশ করে। দ্বাদশস্থ নবমপতি শনির সহিত দ্বাদশ ও পঞ্চমপতি শুক্রের এবং লগ্নপতি বুধের সম্বন্ধ বিশেষভাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্দেশ করে। বুধ কৈবল্যদায়ী কেতুযুক্ত এবং লগ্নের দ্বাদশস্থ আড়ম্বরহীন ও কঠোরতপস্বী শনিগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট—ইহা ধর্মপথে বিশেষ উন্নতি সূচনা করে। তিনি নিজের অপরিসীম শক্তি নিজের মধ্যে সংযত রাখিতেন, উহা বাহিরে প্রকাশ পাইত না। তিনি ছিলেন মহাশক্তির আধার। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ তাঁহাকে দেবী জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। গুরুপত্নী বলিয়া যে তিনি এতখানি সম্মান পাইয়াছিলেন এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে; কারণ তাহা হইলে পরমহংসদেবের তিরোধানের পর তাহা এতদিন স্থায়ী হইত না। বস্তুতঃ পরবর্তী কালেই তাঁহার মর্যাদা ও প্রভাব অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মধ্যে এই প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে নাই বাহিরের জনসমাজেও তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি যে কেবলমাত্র রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-জননী তাহা নহে তিনি, সর্বসাধারণের 'মা'।

ষষ্ঠ অষ্টম ও দ্বাদশে বুধ, কেতু, শুক্র শনি ও রাহু অবস্থিত থাকায় বাত এবং উদর-সংক্রান্ত পীড়ায় বহুকষ্ট তিনি পাইয়াছিলেন। ৬৬ বর্ষ ৭ মাস বয়সে বিংশোত্তরী শনির দশায় শুক্রের অন্তর্দশায় এবং অষ্টোত্তরী শুক্রের দশায় চন্দ্রের অন্তর্দশায় শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে, কন্যারাশিস্থ হস্তানক্ষত্রে ও শিবযোগে তাঁহার তিরোভাব হয়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমার জীবনের ঘটনাবলীর

সময়-নির্দেশ

বঙ্গাব্দ	খ্রীষ্টাব্দ		ঘটনা
১২৬০, ৮ই পৌষ (কৃষ্ণা সপ্তমী)	১৮৫৩, ২২শে ডিসেম্বর	...	শ্রীশ্রীমার জন্ম।
১২৬৬, বৈশাখের শেষ	১৮৫৯, মে	...	বিবাহ, শ্বশুরালয়ে গমন।
১২৬৭, অগ্রহায়ণ	১৮৬০	...	২য় বার শ্বশুরালয়ে গমন।
১২৭১	১৮৬৪	...	দেশে দুর্ভিক্ষ।
১২৭৩	১৮৬৬	...	৩য় ও ৪র্থ বার গমন।
১২৭৪	১৮৬৭	...	৫ম বার গমন, পতি-সম্মিলন।
১২৭৮, ১১ই চৈত্র	১৮৭২, ২৩শে মার্চ	...	দক্ষিণেশ্বরে আগমন।
১২৮০, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ	১৮৭৩, ২৫শে মে	...	ঠাকুরের ৺ষোড়শী পূজা।
১২৮০, আশ্বিন বা কার্তিক	১৮৭৩	...	জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন।
১২৮০, ১৪ই চৈত্র	১৮৭৪, ২৬শে মার্চ	...	পিতা রামচন্দ্রের দেহত্যাগ।
১২৮১, বৈশাখ	১৮৭৪, এপ্রিল	...	২য় বার দক্ষিণেশ্বরে।
১২৮২, আশ্বিন	১৮৭৫	...	রোগাক্রান্ত হইয়া জয়রামবাটী। ৺সিংহবাহিনী-জাগরণ।
১২৮২, ১৬ই ফাল্গুন	১৮৭৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারী	...	চন্দ্রমণির গঙ্গাপ্রাপ্তি। মার প্লীহা-চিকিৎসা।
১২৮২, ৫ই চৈত্র	১৮৭৬, ১৭ই মার্চ	...	৩য় বার দক্ষিণেশ্বরে।
১২৮৩, ১০ই জ্যৈষ্ঠ	১৮৭৬, ২২শে মে	...	সাবিত্রীব্রত।
১২৮৩	১৮৭৬, নভেম্বর	...	দেশে গমন।
১২৮৩, মাঘ	১৮৭৭	...	ডাকাত-বাবার ঘটনা।
১২৮৪, ৩০শে কার্তিক	১৮৭৭, ১৪ই নভেম্বর	...	প্রথম জগদ্ধাত্রীপূজা।
১২৮৭, ফাল্গুন বা চৈত্র	১৮৮১	...	দক্ষিণেশ্বরে আগমন।
১২৮৮, মাঘ বা ফাল্গুন	১৮৮২	...	,, ,,
১২৯০, মাঘ	১৮৮৪	...	,, ,,
১২৯১, ফাল্গুন	১৮৮৫, মার্চ	...	,, ,,
১২৯২, আশ্বিন হইতে ২৬শে অগ্রহায়ণ	১৮৮৫	...	শ্যামপুকুরে ঠাকুরের সেবা
১২৯২, ২৭শে অগ্রহায়ণ হইতে ১২৯৩, ৩১শে শ্রাবণ	১৮৮৫, ১১ই ডিসেম্বর হইতে ১৮৮৬, ১৫ই আগষ্ট		কাশীপুরে ঠাকুরের সেবা। তারকেশ্বরে হত্যাদান।
১২৯৩, ১লা ভাদ্র	১৮৮৬, ১৬ই আগষ্ট	...	ঠাকুরের তিরোভাব।

বঙ্গাব্দ	খ্রীষ্টাব্দে		ঘটনা
১২৯৩, ৬ই ভাদ্র	১৮৮৬, ২১শে আগষ্ট	...	কাশীপুর ত্যাগ।
১২৯৩, ১৫ই ভাদ্র	১৮৮৬, ৩০শে আগষ্ট	...	৺বৃন্দাবন যাত্রা। সম্বৎসর শ্রীরাধার ভাবে।
১২৯৪, ভাদ্র	১৮৮৭	...	বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া কামারপুকুর গমন।
১২৯৫, কার্তিক পর্যন্ত ৬ মাস	১৮৮৮	...	বেলুড়। নির্বিকল্প সমাধি।
১২৯৫, ২১শে কার্তিক	১৮৮৮, ৫ই নভেম্বর	...	৺পুরী যাত্রা।
১২৯৫, ২৯শে পৌষ	১৮৮৯, ১২ই জানুয়ারী	...	কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন।
১২৯৫, ফাল্গুন	১৮৮৯, ফেব্রুয়ারী	...	আঁটপুর হইয়া কামারপুকুর।
১২৯৬, ফাল্গুন	১৮৯০	...	কলিকাতা পুনরাগমন।
১২৯৬, চৈত্র	১৮৯০	...	গয়া যাইয়া পিণ্ডদান।
১২৯৭ ১লা বৈশাখ	১৮৯০, ১৩ই এপ্রিল	...	বলরাম বসুর দেহত্যাগ।
১২৯৭, জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র	১৮৯০	...	ঘুসুড়ীতে। রক্তামাশয়।
১২৯৭, আশ্বিন	১৮৯০	...	বরাহনগরে।
১২৯৭, কার্তিক	১৮৯০	...	দেশে প্রত্যাবর্তন।
১৩০০, আষাঢ় হইতে কয়েক মাস	১৮৯৩	...	বেলুড়ে দ্বিতীয় বার। পঞ্চতপা।
১৩০০, শেষভাগ	১৮৯৪	...	কৈলোয়ারে দুইমাস।
১৩০১, প্রথমভাগ	১৮৯৪	...	বেলুড়।
১৩০১, আশ্বিনের শেষভাগ	১৮৯৪, অক্টোবর	...	দুর্গোৎসবে আঁটপুরে।
১৩০১, ফাল্গুন হইতে ১৩০২, বৈশাখ	১৮৯৫	...	২য় বার কাশী বৃন্দাবন।
১৩০২	১৮৯৫, মধ্যভাগ	...	মাষ্টারের কলুটোলার বাড়ীতে ও ৫৯-২ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে।
১৩০৩, প্রথমভাগে ৫।৬ মাস	১৮৯৬	...	সরকারবাড়ী লেনে।
১৩০৪, শেষভাগ হইতে ১৩০৬, শ্রাবণ	১৮৯৮, মার্চ—৯৯, আগষ্ট	...	১০-২ বোসপাড়া লেনে।
১৩০৫, ২৮শে কার্তিক	১৮৯৮, ১৩ই নভেম্বর	...	বেলুড়-মঠের ভূমিতে পদার্পণ; স্বহস্তে ঠাকুরপূজা।
১৩০৫, ১৫ই চৈত্র	১৮৯৯, ২৮শে মার্চ	...	স্বামী যোগানন্দের মহাসমাধি।
১৩০৬, ১৮ই শ্রাবণ	১৮৯৯, ২রা আগষ্ট	...	অভয়ের দেহত্যাগ।
১৩০৬, ১৩ই মাঘ	১৯০০, ২৬শে জানুয়ারী	...	রাধারাণীর জন্ম।
১৩০৭, মাঘ বা ফাল্গুন হইতে প্রায় এক বৎসর	১৯০১—২	...	১৬ বোসপাড়া লেনে।

বঙ্গাব্দ	খৃষ্টাব্দ	ঘটনা
১৩০৮, ১—৫ কার্তিক	১৯০১, ১৮—২২ অক্টোবর	... ৺পূজা উপলক্ষ্যে বেলুড়ে।
১৩০৯, ২০শে আষাঢ়	১৯০২, ৪ঠা জুলাই	... স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি।
১৩১০, মাঘ হইতে প্রায় দেড় বৎসর	১৯০৪—৫	... ২-১ বাগবাজার ষ্ট্রীটে।
১৩১১, অগ্রহায়ণের মধ্যভাগ হইতে মাঘের প্রথমভাগ	১৯০৪—৫	... ২য় বার পুরীধামে।
১৩১১, চৈত্র	১৯০৫	... নীলমাধবের দেহত্যাগ।
১৩১২, মাঘের ১ম সপ্তাহ	১৯০৬, জানুয়ারী	... শ্যামাসুন্দরীর দেহত্যাগ।
১৩১৩ ২৪শে আষাঢ়	১৯০৬, ৮ই জুলাই	... গোপালের মার গঙ্গাপ্রাপ্তি।
১৩১৪ আশ্বিনের শেষভাগ হইতে ২৪শে কার্তিক	১৯০৭ অক্টোবর নভেম্বর	... গিরিশবাবুর ৺পূজা উপলক্ষ্যে বলরাম-ভবনে।
১৩১৫, ফাল্গুনের শেষভাগ	১৯০৯, মার্চ	... ঠাকুরের জন্মোৎসবে কামারপুকুরে।
১৩১৬ ৯ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ৩০শে কার্তিক	১৯০৯, ২৩শে মে হইতে ১৬ই নভেম্বর	কলিকাতায় নিজ বাড়ীতে। বসন্তরোগ।
১৩১৭, ১৯শে অগ্রহায়ণ হইতে মাঘের শেষ	১৯১০, ৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৯১১ ফেব্রুয়ারী	কোঠারে।
১৩১৭, মাঘের শেষ হইতে ২ মাস	১৯১১	... দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ; রামেশ্বর দর্শন।
১৩১৭, ১০—১৩ চৈত্র	১৯১১ ২৪—২৭ মার্চ	... বাঙ্গালোরে।
১৩১৭, ২৮শে চৈত্র	১৯১১, ১১ই এপ্রিল	... পুরী হইতে কলিকাতা।
১৩১৮, ৩রা জ্যৈষ্ঠ	১৯১১, ১৭ই মে	... জয়রামবাটী যাত্রা।
১৩১৮, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ	১৯১১, ১০ই জুন	... রাধারাণীর বিবাহ।
১৩১৮, ৪ঠা ভাদ্র	১৯১১, ২১শে আগষ্ট	... স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মহাসমাধি।
১৩১৮, ৮ই অগ্রহায়ণ	১৯১১, ২৪শে নভেম্বর	... কলিকাতা আসা। পথে কোয়ালপাড়া-মঠে ঠাকুরের ও নিজের ফটো প্রতিষ্ঠা।
১৩১৯, ৩০শে আশ্বিন হইতে ৫ই কার্তিক	১৯১২ ১৬—২১ অক্টোবর	... ৺দুর্গোৎসবে বেলুড়ে।
১৩১৯, ২০শে কার্তিক হইতে ২রা মাঘ	১৯১২, ৫ই নভেম্বর হইতে ১৯১৩, ১১৫ই জানুয়ারী	৩য় বার কাশীতে।
১৩১৯, ৩রা মাঘ হইতে ১১ই ফাল্গুন	১৯১৩, ১৬ই জানুয়ারী হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী	কলিকাতায়।

বঙ্গাব্দ	খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১৩২০ ১৩ই আশ্বিন	১৯১৩, ২৯শে সেপ্টেম্বর	... দেশ হইতে কলিকাতা।
১৩২২ ৬ই বৈশাখ	১৯১৫ ১৯শে এপ্রিল	... শরৎ-মহারাজের সঙ্গে দেশে যাত্রা। [দি]
১৩২২, ভাদ্র	১৯১৫	... কোয়ালপাড়ায় ১৫ দিন।
১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ	১৯১৬ মে	... জয়রামবাটীতে নূতন গৃহে প্রবেশ।
১৩২৩ ১৭—২০ আশ্বিন	১৯১৬ ৩—৬ অক্টোবর	... ৺দুর্গোৎসবে বেলুড়ে।
১৩২৩ ১৮ই মাঘ	১৯১৭ ৩১শে জানুয়ারী	... কলিকাতা হইতে যাত্রা। [দি] বিষ্ণুপুরে ২ দিন।
১৩২৪ ২০শে পৌষ হইতে মাঘের মাঝামাঝি	১৯১৮, ৪ঠা জানুয়ারী হইতে সমগ্র মাস	জয়রামবাটীতে ভীষণ জ্বর।
১৩২৪ ফাল্গুনের শেষ হইতে ১৩২৫ ৫ই বৈশাখ	১৯১৮	... কোয়ালপাড়ায়। পুনরায় ভীষণ জ্বর।
১৩২৫ ২৪শে বৈশাখ	১৯১৮ ৭ই মে	... জয়রামবাটী হইতে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে কলিকাতা।
১৩২৫ ১৪ই শ্রাবণ	১৯১৮ ৩০শে জুলাই	... স্বামী প্রেমানন্দের মহাসমাধি।
১৩২৫ ১৬ই পৌষ	১৯১৮ ৩১শে ডিসেম্বর	... নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিংএ কয়েক দিন।
১৩২৫ ১৩ই মাঘ	১৯১৯, ২৭শে জানুয়ারী	... দেশে যাত্রা। দি
১৩২৫ ১৩—১৬ মাঘ	১৯১৯ ২৭—৩০ জানুয়ারী	... বিষ্ণুপুরে। [দি]
১৩২৫, ১৭ই মাঘ হইতে ১৩২৬, ৪ঠা শ্রাবণ	১৯১৯, ৩১শে জানুয়ারী হইতে ২০শে জুলাই	কোয়ালপাড়ায়।
১৩২৬, ৭ই বৈশাখ	১৯১৯ ২০শে এপ্রিল	ন্যাড়ার মৃত্যু।
১৩২৬, ২৭শে অগ্রহায়ণ	১৯১৯ ১৩ই ডিসেম্বর	... জন্মতিথি হইতে জ্বর।
১৩২৬ ১২ই ফাল্গুন	১৯২০ ২৪শে ফেব্রুয়ারী	... কলিকাতা যাত্রা।
১৩২৬, ১৫ই ফাল্গুন	১৯২০, ২৭শে ফেব্রুয়ারী	... কলিকাতা আগমন।
১৩২৭, ১৩ই বৈশাখ	১৯২০, ২৬শে এপ্রিল	... স্বামী অদ্ভুতানন্দের মহাসমাধি।
১৩২৭, ৩১শে বৈশাখ	১৯২০, ১৪ই মে	... রামকৃষ্ণ বসুর দেহত্যাগ।
১৩২৭, ৬ই জ্যৈষ্ঠ	১৯২০, ২০শে মে	... বরদাপ্রসাদের দেহত্যাগ।
১৩২৭, ৪ঠা শ্রাবণ	১৯২০, ২০শে জুলাই	... তিরোভাব।

ভানুপিসীর কথা

শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়ে, জয়রামবাটী-অঞ্চলের বিরল যে দুইএকটি ভক্ত ঈশ্বরবুদ্ধিতে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ভানুপিসী তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। সুদীর্ঘকাল তিনি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে কাটাইয়াছেন, এবং তাঁহার সঙ্গে কলিকাতা, কাশী ইত্যাদি স্থানে বাস করিয়া আসিয়াছেন। মা তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

পরবর্তী কালে, ১৩১৭ সালের কাছাকাছি, ভানুপিসীকে ভক্তেরা যখন দেখিয়াছেন, তখন তাঁহার বয়স অনুমান ৬০ বৎসর। পাতলা সরলতামাখা চেহারা, সদা সহাস্য মুখ আর নিঃসঙ্কোচ ভাব—ভিতরের আনন্দ যেন বাহিরে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম।

ভানুপিসী জয়রামবাটীর ৺ক্ষেত্র বিশ্বাসের কন্যা। জাতিতে সদ্গোপ। তাঁহার 'ফুলুই'-গ্রামে বিবাহ হয়। একটি কন্যা জন্মিবার পর প্রায় কুড়ি বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে বাস করিতেন। কন্যাটি ইতঃপূর্ব্বেই মারা গিয়াছিল। পরে কচিৎ কখন শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইলে তাঁহার নিত্যপূজিত ঠাকুরটি ইন্দুমতী দেবীর হাতে দিয়া বলিতেন: মা, দুটি ক'রে তুলসী তুলবে; 'তুলসীপত্রং রামকৃষ্ণায নমঃ' ব'লে ঠাকুরের পাদপদ্মে দেবে।

ভানুপিসী ব্রজগোপীর ভাবে ভাবিতা ছিলেন। হাতমুখ নাড়িয়া, নাচিয়া গাহিয়া কথা কহিতেন; ভক্তদের কাছে ঐশ্বরিক প্রসঙ্গ করিয়া আর শেষ হইত না। যাহারা দুইচারি দিন জয়রামবাটীতে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেন, ভানুপিসীর কাছে ঠাকুর ও মার কথা শুনিতে শুনিতে আনন্দে তাঁহাদের অবসরকাল কাটিত। সময়বিশেষে কাহাকেও কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া ভানুপিসী ঠাকুরের প্রসাদী পান[১], কড়াইভাজা, তালবড়া ইত্যাদি খাওয়াইয়া ভক্তসেবা করিতেন। ভক্তদের সকলেই ছিলেন তাঁহার

---

১ ঠাকুরকে পান-ভোগ দেওয়ার ইতিহাস ভানুপিসীর মুখে শুনিয়া শ্রীনীলকান্ত চক্রবর্তী নিম্নোক্তরূপ লিখিয়া দেন: ঠাকুর জয়রামবাটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার রঙ্গরস ও সঙ্গীত একটি আনন্দের হাট সৃষ্টি করিয়াছে। জনৈকা রমণী তাঁহার শ্রীঅঙ্গে একগাছি ফুলের মালা দিবামাত্র তিনি ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং মধুরকণ্ঠে 'যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি'—এই গানটি গাহিতে গাহিতে একেবারে গভীর সমাধিতে ডুবিয়া গেলেন। বাড়ীতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেহ কেহ অনুমান করিলেন, মালার ফুলের মধ্যে লুকায়িত থাকিয়া বিষধর সর্প তাঁহাকে দংশন করিয়াছে। প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা অতীত হইলে পরদিন সমাধি ভঙ্গ হইল। এই ঘটনার পরে আর কাহাকেও বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে দেওয়া হইত না। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া

নাতি। তন্মধ্যে কাহাকেও 'বড়লাতি' কাহাকেও বা 'বন্ধু' সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন। সুরেনবাবুকে বলিয়াছিলেন, 'বড়লাতি এক গিরিশবাবুকে ব'লতুম, আর তোমাকে ব'লচি।' গিরিশবাবুর মত তিনিও থিয়েটার করিতে ভালবাসেন শুনিয়া ভানুপিসীর কি আনন্দ। কেন না, নামকরণ ঠিকঠিক হইয়াছে। শ্রীশচন্দ্র ঘটক ছিলেন 'বন্ধু'।

শিলং হইতে কতিপয় ভক্ত মাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। ভানুপিসী জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোথা থেকে আসচ?' ভক্তেরা বলিলেন 'অনেক দূর।' ভানুপিসী বলিলেন 'তা হবে না? বিষ্টুপুর, তমলুক থেকে লোক আসে, আর আমাদের পোড়া দেশের কিছু হ'ল' না। প্রদীপের নীচে আলো হয় না।'

ভক্তদের কাছে ভানুপিসী ঠাকুরের শ্রীশ্রীমার, মার গর্ভধারিণীর ও নিজের কথা এইভাবে গল্প করিয়াছিলেন: 'ঠাকুর শ্বশুরবাড়ী এলে জয়রামবাটীর লোকেরা তাঁকে খ্যাপা জামাই ব'লত'। তিনি কখন কখন লাফ দিয়ে উঠে বলতেন, এবার যবন চণ্ডাল আদি করি কাকেও বাকী রাখব না। তা শুনে তারা ব'লত' 'কি খ্যাপা গো, কি খ্যাপা!'

আমার ঠাকুরের উপর প্রবল অনুরাগ ছিল। ঠাকুর যখন জয়রামবাটী আসতেন তাঁকে দেখবার জন্যে ছুটছুট যেতুম। তাঁকে দেখতে পাড়ার যত মেয়েরাও এসে জড় হ'ত', মেয়েদের দেখে ঠাকুর এমন সব কথা কইতেন যে হেসে হেসে তাদের পেট ফেটে যেত' ও লজ্জায় পালাত'। তখন ঠাকুর ব'লতেন 'দেখলে গা, আগড়াগুলো সব উ-উড়ে গেল। এবার তোমরা ব'স, কথা হবে।'

তখন কম বয়েস—মুখুজোদের পাগলা জামাইয়ের কাছে যেতে আমার বড় ভাই গৌর-দাদা নিষেধ ক'র্ত্ত'। কখন কখন ঠাকুর 'ঐ গৌর দাদা এল' ব'লে ভয় দেখাতেন, আর আমি জড়সড় হতুম। আমাকে জড়সড় দেখে ঠাকুর ব'লতেন, 'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।'

"তাঁর কাছে আসি ব'লে আমাকে অনেক সইতে হয় জেনে ঠাকুর ব'লেছিলেন,

---

ভানুপিসীর বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি সারাদিন ঘরে বসিয়া কাঁদিলেন তাঁহার মনে হইল ঠাকুরকে একটা পান খাওয়াইতে পারিলেও সারাজীবনের প্রাণভরা আকাঙ্ক্ষা কতকটা তৃপ্ত হইত। ঐদিন বিকালে ঠাকুর বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন হঠাৎ ভানুপিসীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন 'একটা পান দেবে?' বলিয়াই তিনি তালপুকুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভানুপিসী কয়েকটি পান সাজিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, ঠাকুর তালপুকুরের ধারে আপন মনে পাদচারণ করিতেছেন কোনদিকে খেয়াল নাই। হঠাৎ তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলিলেন, 'পান এনেচ? বেশ। আজ থেকে তুমি আমাকে পান খাওয়াবে।'

'যখন গৌর-দাদা তোকে শাসাতে আসবে, তখন তুই দুহাত তুলে হাততালি দিয়ে নাচবি আর ব'লবি, ভজ মন গৌর নিতাই। তা হ'লে তোকে পাগল মনে ক'রে সে আর কিছু ব'লবে না।' ঠাকুরের কথাই সত্যি হয়েছিল।

"একদিন ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, 'তোমার নাম কি?' আমি ব'ল্লুম 'মানগরবিণী।' 'এ তোমার কে হয়?—কি ব'লে ডাকে?' 'এ কে?' 'সারদা। 'পিসী।' 'তবে আজ থেকে তোমার নাম হ'ল, ভানুপিসী।' এই ব'লে ঠাকুর গান ধ'রলেন, 'গরবিণী নাম ঘুচেচে।'

"একবার ঠাকুর জয়রামবাটী থেকে কামারপুকুর ফিরবার সময় আমাকে ব'ল্লেন ওরে, তুই খি-খি-খিলি তৈরি ক'রে খাওয়াতে পারিস?' অমনি তাঁর জন্যে কয়েকটি পান সাজতে ছুটে গেলুম। পান নিয়ে ফিরে এসে দেখি, ঠাকুর অনেকদূর চলে গেছেন। আমি পেছনে ছুটতে লাগলুম। ঠাকুর বেগে চলেচেন—মেয়েমানুষ—সাহস ক'রে তাকে ডাকতে পাল্লুম নি। দুই একখানি গ্রাম ছাড়িয়ে যাওয়ার পর তিনি পেছন ফিরে দাঁড়ালেন, আর আমাকে দেখতে পেয়ে ব'ল্লেন ওরে, তুই এতদূর এসেচিস? আমি ব'ল্লুম, 'আপনি পান খেতে চাইলেন, তাই নিয়ে এসেচি।' ঠাকুর খুব খুসী হ'য়ে ব'ল্লেন, 'তোর হবে—তোর হবে—তোর হবে।' তারপর পান হাতে ক'রে ব'ল্লেন 'মেয়েমানুষ হ'য়ে এতদূর এলি, এখন বাড়ী ফিরে গেলে তোরে যে ঠেঙ্গাবে। তুই এক কাজ করিস, কুমোরবাড়ী থেকে একটা হাড়ি হাতে ক'রে নিয়ে বাড়ী যাস। তা হ'লে তারা মনে ক'রবে যে তুই কুমোরবাড়ী গিয়েছিলি।'

"আমার খুব কঠিন অসুখ ক'রেছিল—মরণাপন্ন অবস্থা। মা দেখতে এসে ব'ল্লেন 'পিসী, তুমিও চলে যাবে? আমি কার সঙ্গে কথা কইব?' আমি ব'ল্লুম, 'মা, আমি কি জানি; তুমি ইচ্ছে ক'ল্লেই রাখতে পার।' আমার কথা শুনে মা চলে গেলেন সেইদিনই সন্ধ্যার সময় দেখি, মা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে, আমার মুখে চরণামৃতের মত কিছু দিয়ে ব'লচেন, 'পিসী, খাও—খাও।' তার পর হ'তেই ভাল হ'তে লাগলুম। সুস্থ হ'য়ে মাকে ব'ল্লুম, 'মা, তুমি এমন করে আমাকে বাঁচালে?' মা ব'ল্লেন, 'পিসী, ওসব ঠাকুরের ইচ্ছে।'

"একদিন সাদাচোখে মাকে চতুর্ভুজারূপে দর্শন ক'রেছিলুম। যখন মা সামনের দিকে মুখ ক'রে, তখন দেখেছিলুম ঠিক এমনি মা—দ্বিভুজা মূর্তি, আর যখন আমার দিকে পেছন ফিরে, তখন চতুর্ভুজা মূর্তি।

"একদিন মাকে ব'ল্লুম, 'আমি যেন ঠাকুরের গান শুনতে পাই যখন তুমি গাও।' মা ব'ল্লেন, 'কি জানি বাপু, তুমিই জান।' আমি ব'ল্লুম, 'ঠাকুর তোমার ভিতর আছেন।' মা ব'ল্লেন, 'আমার কি চার হাত দেখতে পাও?'

"ঠাকুরের শাশুড়ী আগে দুঃখ ক'রে ব'লতেন, 'আমার সারদার ছেলেপুলে হবে না।' মা এখন বলেন, 'পিসী, দ্যাখ আমার কত ছেলেপুলে।'

ঠাকুরের শাশুড়ী আগে বলতেন, 'খ্যাপা জামাই গো খ্যাপা জামাই।—আমার সারদার কত কষ্ট হবে।' পরে তাকে ঠাকুরের পট পূজো ক'ত্তে দেখে বলতুম, 'এখন কেন গো, আগে যে খ্যাপা জামাই ব'লতে।'২

একদিন ভক্তদের সাক্ষাতে ভানুপিসী শ্রীশ্রীমাকে কহিলেন মা লোকে তোমাকে আগে ব'লত', 'খ্যাপার বউ।' এই কথা বলিয়াই গান ধরিলেন 'খ্যাপা খ্যাপা সবে বলত' দিগম্বরে যন্ত্রণা সয়েছ কত ঘরে পরে দ্বারী নাকি এবার হ'য়েছে তোমার দ্বারে, দর্শন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে—কি আনন্দের কথা উমে।' তারপর বলিলেন 'মা, এবার শরৎ-মহারাজ তোমার দ্বারী হয়ে ব'সে আছেন; তার দর্শন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে—(ভক্তদের প্রতি) তোমরা সব ইন্দ্র চন্দ্র যম কত কষ্ট করে মার দর্শন পাচ্ছ।' শুনিয়া মা ঈষৎ হাস্য করিলেন।

১৩১০ সালের পৌষ মাস। শ্রীশ্রীমা সেই সময় কাশীতে—আশ্রমের সন্নিকটে লক্ষ্মী-নিবাসে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন, নীচের তলায় ভানুপিসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। দেখা হইতেই দুইজনে ফষ্টিনষ্টি আরম্ভ হইল। ভানুপিসী স্বভাবসুলভ রসিকতা বশে হাত নাড়িয়া গান ধরিলেন: কালো বেরাল কে পালেছে পাড়াতে, তোরা ধ'রে দে গো ললিতে। সেই বেরালকে ধ'রতে পেলে বাঁধব নেবাল পাটেতে॥ কোন ভাতার-পুত-খাগী ও সে বেরাল-সোহাগী ভাঁড়ে রাখতে দেয় না ননী, দই খেয়েছে ভাঁড় ভেঙ্গেছে, মুখ পুঁছেছে কাঁথাতে॥ গান শুনিতে শুনিতে শ্যামের উদ্দীপন হইয়া মহারাজ ভাবাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি হইতে অবিরল এত অশ্রু বহিতে লাগিল যে গায়ের জামার সম্মুখভাগ একেবারে ভিজিয়া গেল! তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, 'ভানি, তুই তো সামান্য নস—যে রাখাল মহাসাগর, তাকেও উদ্বেলিত ক'রে দিয়েছিস।'

জয়রামবাটীতে সুরেনবাবু মাকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, রাস্তায় ভানুপিসির সঙ্গে দেখা। পিসী বলিলেন 'ওগো, এখানে ব'স। আগে বৃন্দার সঙ্গে পরিচয় কর, তবে না রাধার দর্শন পাবে!' একদিন তিনি ভানুপিসীর সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছেন, মা রাধুকে পাঠাইলেন তাঁহাকে ডাকিয়া লইতে। রাধু আসিয়া বলিল, 'বেলা অনেক

২ শাশুড়ী জামাইয়ের মধ্যে বরাবর একটি স্নেহমধুর সম্বন্ধ ছিল যাহা পরে ভক্ত ভগবানের সম্পর্কে পরিণত হয়। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: কামারপুকুরে আমার মা আসাতে ঠাকুর কত আদরযত্ন ক'ল্লেন আর ব'ল্লেন 'আপনি আচার তৈরি করে খাওয়ান।' [নি]

হ'য়েচে, মা আপনাকে এখুনি যেতে ব'ল্লেচেন—চলুন।' তখনও গল্পের জের চলিতেছিল, যাই যাই করিয়াও যাওয়া হইতেছিল না। তাহাতে রাধু বিরক্ত হইয়া কহিল, 'আপনি এই পাগলটার সঙ্গে ব'সে কি গল্প ক'চ্চেন?—চলুন।' পিসী বলিলেন, 'ওলো কুটিলে! গেলি নি সে বনে, ক'ল্লি নি কৃষ্ণ-সেবনে। তুই কেবল মা মা-ই ক'চ্চিস, তোর মা যে কে, তুই জানিস?'

আর একবার সুরেনবাবু জয়রামবাটী গিয়াছেন: তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভানুপিসী ছুটিয়া আসিলেন এবং গায়ে হাত দিয়া গান ধরিলেন: বহুদিন পরে বধুয়া এল'। ছিল প্রাণ, তাই দেখা যে হ'ল'॥ দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল। মথুরানগরে ছিলে তো ভাল? তোমার বিরহে স'হিলাম যত। পাষাণ হইলে ফাটিয়া যেত'॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর ভানুপিসীর কি অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরই না ছিল! সুরেনবাবু প্রথম যেবার কলিকাতায় মার বাড়ীতে যান, মা তখন কোঠারে। ভানুপিসীর সঙ্গে দেখা হইতে গল্প আরম্ভ হইল—ক্রমে সন্ধ্যা। 'এখন আস, কলকাতায় নূতন এসেচি, রাস্তাঘাট ভুল হ'য়ে যাবে।'—একথা শুনিয়াই পিসী আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, 'সে কি গো, তোমরা যে ঠাকুরের ছেলে! ভুল হ'লেও তিনি পথ দেখিয়ে দেবেন। আমি একদিন গঙ্গা-দর্শন ক'ত্তে গিয়েচি, রাস্তা ভুলে গিয়ে কিছুতেই পথ পাই না। তখন ঠাকুর এসে আমার হাত ধ'রে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

স্বভাবতঃ তাহার বায়ুপ্রধান-ধাত ছিল। ভক্তদের কাছে বলিয়াছিলেন, সারারাত ঘুম হয় না। তাই ঠাকুরকে বলি, 'ঠাকুর, তুমি খাও আর আমি নাচি।' এই ব'লে নাচি, আর 'ভজ মন গৌরনিতাই' বলি।

তাঁহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না; অনেকবার কঠিন অসুখেও ভুগিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দ্বন্দ্বপূর্ণ জগতের ঊর্ধ্বে, আর এক ভাবরাজ্যে বাস করিতেন বলিয়া সংসারের সুখদুঃখ তাঁহাকে বড় একটা স্পর্শ করিতে পারিত না। শ্রীশ্রীমার শরীর থাকিতেই তিনি অভীষ্ট আনন্দলোকে প্রয়াণ করেন।

শ্রীস্বামিজী ও শ্রীমহারাজ

ঠাকুরের পার্ষদভক্তগণ শ্রীশ্রীমাকে কিরূপ ভক্তি করিতেন বা মার সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করিতেন, গ্রন্থমধ্যে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। ঠাকুরের দুই শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ শ্রীনরেন্দ্র ও শ্রীরাখাল (স্বামিজী ও মহারাজ) মার সান্নিধ্যে আসিলেই অনেক সময় ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। মহারাজ তো মার সন্নিকটে বড় একটা আসিতে চাহিতেন

না বলিয়াই মনে হইত। এই অধ্যায়ে তাঁহাদের সম্বন্ধে কতিপয় নূতন ঘটনার উল্লেখ করিব।

স্বামী সারদানন্দকে অতুলচন্দ্র চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনারা যে মাকে এত ভক্তি করেন সেটা কি গুরুপত্নী ব'লে?' শরৎ-মহারাজ উত্তর দেন, 'না, তা নয়। ঠাকুর ও মা অভেদ। তবে ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করা চলত, মার সঙ্গে চলে না।'

স্বামিজী নৌকায় করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। স্বামিজী বারবার গঙ্গাজল পান করিতেছেন দেখিয়া হরি-মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, 'ঘোলা জল বারবার খাচ্চ, শেষকালে কি সর্দি ক'রে বসবে?' স্বামিজী কহিলেন, 'না ভাই, ভয় করে; আমাদের তো মন—মার কাছে যাচ্চি, ভয় করে!'[১]

নীলকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ ভক্তগণকে স্বামী প্রেমানন্দ বলিয়াছিলেন: স্বামিজী যেদিন মাতৃদর্শনে যাইবেন, পূর্ব হইতেই নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতেন। একদিন ভোরে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন; পুনঃপুনঃ ডুব দিতে লাগিলেন, যেন কিছুতেই পবিত্রতা আনিতে পারিতেছেন না। শেষকালে যদিও বা উঠিলেন, সেবককে কহিলেন, 'ওরে, আমার গায়ে গঙ্গাজলের ছিটে দে, গঙ্গাজলের ছিটে দে।' কোনওরূপে মার ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়াছেন, আর চলিতে পারিলেন না; ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া গেলেন। অমনি মা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার নরেন্দ্রকে তুলিয়া ধরিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

রাঁচিতে স্বামী শুদ্ধানন্দ বলিয়াছিলেন: আমেরিকা হইতে ফিরিয়া স্বামিজী মাকে দর্শন করিতে গেলেন। মা স্বামিজীর গুণকীর্তন করিয়া কহিলেন, 'তুমি যা ক'রেচ এমনটি আর কেউ করে নি।' স্বামিজী কহিলেন, 'এসব কি ছাইপাঁশ বলচ? এসব আমি করেচি, না তুমি করেচ? তুমি ইচ্ছামাত্র আমার মত লাখো বিবেকানন্দ করতে পার, তা কি আমি জানি না?' মা হাসিতে লাগিলেন। [ঐ]

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: বোসপাড়ার বাড়ীতে আমরা আছি। শুনতে পাচ্চি, নীচের তলায় নরেন এসে গোলাপকে ব'লচে, 'গোলাপ মা, আমার বড় খিদে পেয়েচে।' গোলাপ গোটাকতক মিছরির টুকরো নিয়ে যেয়ে নরেনের হাতে দিয়েচে। নরেন তো রেগেই খুন! আমি একটা থালায় ক'রে খাবার পাঠিয়ে দিলুম। নরেন খায় আর বলে, 'একেই বলি মা। ঠাকুর আঙ্গুলে দেখিয়ে, এইটি আমার বাবুরাম খাবে, এইটি আমার ও খাবে বলতেন। পূজুরি বামুনের মেয়ে মা কেমন ক'রে এমন হল আমি বুঝতে পাচ্চি না!' [বি[২]

---

[১] স্বামী হরানন্দের নিকট শ্রুত।

[২] স্বামিজীর লিখিত একখানি পত্রের কিয়দংশ এইরূপ: 'মায়ের কৃপা আমার উপর লক্ষগুণ

স্বামী অমৃতানন্দ বলেন: এক বৎসর ঠাকুরের সাধারণ উৎসবের দিন সকালবেলা শ্রীশ্রীমা স্ত্রী-ভক্তগণ সহ মঠে আসিয়াছেন। মহারাজ গেটের কাছে দাঁড়াইয়া 'মহামায়ী কি জয়' বলে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে মঠের ভিতর লইয়া গেলেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শঙ্খাদি বাজাইয়া অনুগমন করিল। মা উপরে যাইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং নামিয়া আসিয়া, মহারাজের প্রার্থনায়, ঠাকুর ঘরের সিঁড়ির প্রায় আট হাত দক্ষিণে আসনের উপর দক্ষিণমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজ মার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কম্পিতহস্তে ও রোমাঞ্চিত কলেবরে ঘণ্টা ও পঞ্চপ্রদীপ দ্বারা আরতি করিলেন। মহারাজের আদেশে সাধুভক্তগণ দুই সারি হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং করজোড়ে 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে' ইত্যাদি স্তব পাঠ করিয়া, মার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিলেন। মা তখন চিত্রার্পিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া—মুখের ঘোমটা খানিকটা উপরে উঠিয়াছে; মহারাজ তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে পূর্বাস্য হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া—চক্ষে ধারা। সেইদিন মহারাজ বালকের মত হইয়া গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় দেখা গেল, বহুলোক উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে আর তিনি দুই হাতে তাহাদিগকে আটকাইতে যাইয়া গলদ্ঘর্ম হইতেছেন ও বলিতেছেন 'না না ওপরে যেতে দেওয়া হবে না—মার কষ্ট হবে।' লোকগুলি তাহার কথা না শুনিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছিল; তাহাদিগকে মহারাজের পরিচয় দিয়া বুঝাইয়া বলাতে নিবৃত্ত হইল।

সকালবেলা মহারাজ বাবুরাম-মহারাজ প্রভৃতি কলিকাতার বাড়ীতে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন, পরদিন মা দেশে চলিয়া যাইবেন। প্রণাম করিবার পর মহারাজ নীচে শরৎ-মহারাজের ঘরে আসিয়া বসিলেন—ঠিক যেন একটি শিশু। উপর হইতে মিষ্টান্নাদি মার প্রসাদ আসিতেই মহারাজ ভাবের ঘোরে তাড়াতাড়ি খাইয়া যাইতে লাগিলেন। সে খাবার নিঃশেষ হইলে মুড়ি-প্রসাদ আসিল। তাহাও নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া শরৎ-মহারাজ সত্বর একখানা কচুরী আনাইলেন। মাকে দেখাইয়া সেই কচুরী মহারাজের সম্মুখে রাখা হইল—মহারাজ খাইয়া যাইতেছেন। তখন শরৎ-মহারাজ অস্থির হইয়া 'মহারাজ আর খেয়ো না—মহারাজ আর খেয়ো না' বলিতে

বড়—মায়ের দয়া মায়ের আশীর্বাদ। বাপ এসেছিল মায়ের সেবার জন্য, মায়ের ছেলে ডেকে আনতে আবার কি। মায়ের গোলাম বাপ দাদা। মাপ করবে ছোট খোলা কথা বলে ফেললুম। এ মায়ের দিকে আমি একটু গোঁড়া মায়ের হুকুম হলেই বীরভদ্র সব করতে পারে। তারকভায়া। আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে বলেছিলাম, তিনি যেমন আশীর্বাদ দিলেন অমনি হুপ্ করে সাগর পার। এই বুঝ দাদা। এই শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার দিয়ে লড়াই করে টাকার যোগাড় করছি মায়ের মঠ হবে বলে। ......মায়ের কথা সময় সময় মনে করলে বলি, 'কো রাম' —ঐ যে বলছি ঐখানটায় আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন, কি মানুষ ছিলেন যাহা হয় বল, কিন্তু দাদা, যার মায়ের উপর ভক্তি নাই তাকে ধিক্কার দিও।" [সাপ্তাহিক 'ভারত' (১৬ই পৌষ, ১৩৪৩) হইতে উদ্ধৃত]

বলিতে সেই প্রসাদ কাড়িয়া লইয়া নিজে খাইতে লাগিলেন এবং অন্য সকলকেও তদ্রূপ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।' সকলে সেই প্রসাদ তাড়াতাড়ি করিয়া লইয়া নিঃশেষ করিলে মহারাজ কিছুকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। [ম]

বিভূতিবাবু বলেন: ৺কাশীতে মহারাজ প্রায় প্রতিদিনই সকালবেলা শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে আসিতেন। উড়ে 'ভোগিয়া' চাকরটির সঙ্গে নানারূপ ফষ্টিনষ্টি করিতেন। কখনও উপরের ঘরে মাকে প্রণাম করিতে যাইতে দেখি নাই। মহারাজ নীচের বারান্দায় আসিলেন, মাও শুনিলেন, ইহার অধিক আর কিছু দেখিতাম না। কেবল একদিন দেখিয়াছি হাওড়া ষ্টেশনে: মা জয়রামবাটী যাইতেছেন, মহারাজ ভুবনেশ্বরে, প্লাটফরমের একদিকে মার গাড়ী দাঁড়াইয়া, আর একদিকে মহারাজের; মার গাড়ী সাড়ে নয়টায় ছাড়িবে, মহারাজের দশটা ছয় মিনিটে। ষ্টেশন সাধু ও ভক্তে পরিপূর্ণ। গাড়ী ছাড়িবার একটু আগে মহারাজ মার গাড়ীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিলেন। দাঁড়াইয়া মার দিকে সম্পূর্ণরূপে না তাকাইয়া—মার তখন মাথায় ঘোমটা—বলিলেন 'মা, আপনাকে ভুবনেশ্বরে যেতে হবে। আমি ভুবনেশ্বরে ঠাকুরের বেশ ভাল মঠ করেছি।' মা ঘোমটার ভিতর হইতে মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। সে কি দৃশ্য! সে মিলন ধ্যানের বস্তু।

চন্দ্রমোহন দত্ত লিখিয়াছেন: একদিন বৈকালে মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি, মা তখন ঠাকুর ঘরের বারান্দায় বসিয়া জপ করিতেছিলেন। প্রণাম করিতেই হঠাৎ মনে হইল মহারাজ তো একদিনও এখানে আসিয়া মাকে প্রণাম করেন না! বলিলাম, 'মা, বাবুরাম-মহারাজ, শরৎ-মহারাজ, মহাপুরুষ, যোগেন মহারাজ হরি-মহারাজ সকলেই আপনাকে প্রণাম ক'রে যান, মহারাজ আসেন না কেন?' মা কহিলেন 'রাখাল যে সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমাকে যখন ইচ্ছা করে তখুনি দেখতে পায়।'

স্বর্ণবালা ঘোষ বলেন: কলিকাতায় একদিন আমি যখন শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে আছি, মহারাজ আসিলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া মা দোতলার বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজ উপরে গেলেন না। তিনি ও শরৎ মহারাজ, দুই বিরাট মহাপুরুষ উঠানে পাশাপাশি দাঁড়াইলেন ও উপরের দিকে না তাকাইয়া, জোড়হস্ত নিজেদের মস্তকোপরি ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপন করিয়া চিত্রার্পিতবৎ স্থির হইয়া রহিলেন। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। আমার বোধ হইতেছিল, সমস্ত বাড়ীখানিই যেন হিমালয়-প্রমাণ গাম্ভীর্যে ভরিয়া গিয়াছে!

বিবরণ-দাতৃগণের নামধাম

শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের সাধুগণ: স্বামী অব্যয়ানন্দ, অমৃতানন্দ, অরূপানন্দ, অসিতানন্দ, ঋতানন্দ, কেশবানন্দ, কৈবল্যানন্দ, গিরিজানন্দ, গৌরীশানন্দ, জগদানন্দ, জপানন্দ, জ্ঞানানন্দ, তন্ময়ানন্দ, তপানন্দ, তারকেশ্বরানন্দ, ত্র্যম্বকানন্দ, ধর্মানন্দ, ধ্রুবানন্দ, নিত্যানন্দ (কানপুর), প্রণবানন্দ, প্রশান্তানন্দ, প্রাণাত্মানন্দ, প্রেমেশানন্দ, বরদানন্দ, বাসুদেবানন্দ, বিশ্বেশ্বরানন্দ, ব্রজেশ্বরানন্দ, ভজনানন্দ, মহাদেবানন্দ (আরারিয়া), মহেশ্বরানন্দ, মুক্তেশ্বরানন্দ, রামানন্দ, শৈলানন্দ, শ্যামানন্দ (রেঙ্গুন), সৎসঙ্গানন্দ, সাধনানন্দ, সারদেশানন্দ, সিদ্ধানন্দ, স্ব-স্বরূপানন্দ, হরানন্দ।

কাশী: শ্যামাচরণ চক্রবর্তী। সরযূবালা সেনগুপ্ত।

পাটনা: চারুবালা, জিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী বি-এ—মকনপুর রোড। উপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

রাঁচি: শশিভূষণ ঘোষ এম-এ। ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত বি-এ; গৌরীকান্ত বিশ্বাস—ডুরাণ্ডা।

মানভূম: রাজেন্দ্রলাল দে—পুরুলিয়া। সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—বাগদা। ব্রজেশ্বরী দেবী—পুঞ্চা।

জামসেদপুর: মাখনলাল দত্ত।

ভুবনেশ্বর: তারাসুন্দরী।

কটক: কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্-এ; রাজলক্ষ্মী দেবী। হরিবল্লভ ঘোষ—জামালপুর।

সম্বলপুর: সুশীলকুমার সরকার।

মেদিনীপুর: মহিমচন্দ্র দত্ত এম্-এ, বি-এল। ভূষণচন্দ্র পুইল্যা—দন্তাল-চাঁদাবিলা। শবাসনা দেবী; দুর্গা দেবী, ডাঃ নলিনবিহারী সরকার—চন্দ্রকোণা। শম্ভুচরণ মণ্ডল—দেউলকুন্দরা। হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পাঁচবেড়িয়া (খড়্গপুর)। সিন্ধুনাথ পাণ্ডা—খাগড়াবনী।

বাঁকুড়া: রোহিণীবালা, কমলা, বিভূতিভূষণ ঘোষ বি-এ; রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ। কালীকুমার মুখোপাধ্যায়; ইন্দুমতী, সুবাসিনী দেবী; আহ্লাদিনী ঘোষ—জয়রামবাটী। রাধারাণী, মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়—তাজপুর। যামিনী দেবী, নন্দরাণী দত্ত, প্রমীলা বসু, হরিপদ মাঝি—কোয়ালপাড়া। রাখালচন্দ্র নাগ—কোতুলপুর। গোপালকিঙ্কর সেন—ময়নাপুর।

হুগলি: সুগন্ধাবালা, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ—শ্যামবাজার। লক্ষ্মণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—নবাসন। ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায়—আরামবাগ। তুলসীরাম, শান্তিরাম ঘোষ—আঁটপুর। গোকুলদাস দে এম্-এ—মশাট।

বর্ধমান: ভবদেব ঘোষাল। ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়—আসানসোল। উপেন্দ্রনাথ সরকার বি-এ—সীতারামপুর। রামচন্দ্র মজুমদার—কুমারপাড়া।

হাওড়া: ডাঃ হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—রামকৃষ্ণপুর।

কলিকাতা : 'শ্রীম', নিকুঞ্জদেবী—১৩-২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। গণেন্দ্রনাথ—৫-৫ এ বীরচাঁদ গোঁসাই লেন। কিরণচন্দ্র দত্ত—১ লক্ষ্মী দত্ত লেন। প্রমীলাবালা বসু—৫৮বি রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট। কুসুমকুমারী দেবী—১২ বৃন্দাবন পাল লেন। সুখবালা অঘোরনাথ ঘোষ এম-বি—পি ২০ নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। দুর্গাপদ ঘোষ এম বি। আশুতোষ মিত্র। নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এম্ এ—৭-১ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেণ্ড লেন। হেমপ্রভা কাঞ্জিলাল—১২২বি ল্যান্সডাউন রোড।

নদীয়া : রতিকান্ত মজুমদার—কুষ্টিয়া।

যশোহর : প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার বি এ—মহেশপুর।

খুলনা : অন্নদাচরণ সেনগুপ্ত। যতীন্দ্রনাথ ঘোষ—মহেশ্বরপাশা।

বরিশাল : ডাঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়, ডাঃ সুরেন্দ্রকুমার সেন, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি এসসি, কৈলাসকামিনী রায়।

ফরিদপুর : সুবর্ণাসুন্দরী শ্রীশচন্দ্র ঘটক—বিঝারি। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বি এ—কাশ্যপপাড়া।

ঢাকা : যোগেশচন্দ্র ঘোষ বি এল। লক্ষ্মীকান্ত দত্ত (উকীল)—৩ ঈশ্বরদাস লেন। নিরুপমা রায়—তেওতা। তারকনাথ রায়চৌধুরী—বালিয়াহাটি। সুশীলাবালা ডাঃ উমেশচন্দ্র দত্ত—বড়লিয়া। মোহনলাল সেন বি এ—সোনারং। অশ্রুমতী, ব্রজনাথ সেন বি এ—বেত্রাবতী। গিরিবালা গুপ্ত—আউটসাহী। স্নেহলতাসেন—মধ্যপাড়া। একনাথ নাথ—পশ্চিমপাড়া। শচীবালা সুরেন্দ্রকান্ত সরকার—বাপুর। চন্দ্রমোহন দত্ত—গাউপাড়া। নিশিকান্ত মজুমদার—মূলচর।

ময়মনসিংহ : ডাঃ নবদ্বীপচন্দ্র রায়বর্মণ—শ্যামগঞ্জ। কাশীনাথ রায়বর্মণ—কুমরপুর। ডাঃ বসন্তকুমার সরকার—গফরগাঁও। পূর্ণচন্দ্র ভৌমিক—জোযাইর। সুরেন্দ্রনাথ, সৌযেন্দ্রনাথ মজুমদার, নীলকান্ত চক্রবর্তী বি-এ—ঘাবিন্দা। কিশোরীমোহন ভৌমিক বি এল—খুপিপাড়া। প্রিয়ম্বদা মজুমদার—বনকোরা। পীতাম্বর নাথ—মির্জাপুর। সুরেশচন্দ্র ঘোষ—সহস্রাম।

পাবনা : সুষমা, কালীপদ রায় বি-এ ; ডাঃ সারদাকিঙ্কর রায়—সিরাজগঞ্জ। নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, যতীন্দ্রনাথ রায়—রাণীগ্রাম। ধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক—কানসোনা।

চট্টগ্রাম : রমণীমোহন চৌধুরী এম্-এ—মলিযাইস। সুরেন্দ্রনাথ রায়—থৈয়াছড়া।

ত্রিপুরা : প্রফুল্লমুখী বসু—কুমিল্লা। সারদারঞ্জন দত্তগুপ্ত বি-এ—পাইকপাড়া।

শ্রীহট্ট : লাবণ্যকুমার চক্রবর্তী—ঢাকাদক্ষিণ। যতীন্দ্রচন্দ্র দত্ত—সুপাতলা। অতুলচন্দ্র চৌধুরী বি-এ—দেবশ্রী। কর্ণাটকুমার চৌধুরী—ব্রাহ্মণডোবা।

শিলং : নগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এম্-এ।

গ্রন্থকার-প্রণীত :

১। শ্রীশ্রীসারদা দেবী

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ **স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ :** বেশ হয়েছে, চমৎকার হয়েছে! দেখেই বোঝা যায়, কতখানি মনপ্রাণ দিয়ে কাজটি করা হয়েছে। মার আশীর্বাদ পড়বে তোমার উপর—আরও অনেকের পড়বে তার সঙ্গে : সুখে থাক, আনন্দে থাক।

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রণেতা **শ্রীসুকুমার সেন** এম্-এ, পিএইচ-ডি (রেডিও সমালোচনা—২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৭) : ·এরকম well-documented (সুপ্রামাণিক) জীবনীগ্রন্থ এযাবৎ বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই প্রকাশিত হয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা (৩০শে আশ্বিন ১৩৪৬) : যে শ্রদ্ধা ও অনুভূতিপ্রবণ মন লইয়া এই শ্রেণীর জীবন সম্পূর্ণরূপে না হউক, যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে পাঠকসমাজের নিকট উপস্থিত করা যায়, গুরুকৃপায় গ্রন্থকার তাহার অধিকারী। তাহার ভাষা সংযত ও বর্ণনাভঙ্গী সরল। শ্রীমার পুণ্যস্মৃতি ভক্ত গ্রন্থকার মধুকরের মত বহু ভক্তের হৃদয়পদ্ম হইতে সংগ্রহ করিয়া অপূর্ব মধুচক্র নির্মাণ করিয়াছেন।

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রণেতা **শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী** বি-এ :·· তুমি শ্রীশ্রীমায়ের অজস্র আশীর্বাদ সর্বথা প্রাপ্ত হইয়াছ। ভাষার ভঙ্গিমা, ভাবের অনাবিল অভিব্যক্তি, সর্বোপরি শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদপ্রেরণা গ্রন্থের স্থানে স্থানে স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইয়া তোমার ভক্তি ও সত্যানুরাগ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।··

শ্রীহট্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাসমিতির প্রতিষ্ঠাতা, খ্যাতনামা লেখক **স্বামী প্রেমেশানন্দ :** · তোমার লিখিত মায়ের জীবনী পড়িয়া আমি এত আনন্দিত হইয়াছি যে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। এই গ্রন্থ মায়ের সর্বোত্তম জীবনীরূপে চিরকাল গণ্য থাকিবে। অবতার সম্বন্ধে এইরূপ গ্রন্থ লেখা তাঁর বিশেষ কৃপা ছাড়া সম্ভব হয় না। ··লিখিয়া তুমি অমর হইলে।

২। বাঙ্গলার দুই ঠাকুর

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী :····ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনলীলা অবলম্বনে বাঙ্গলার দুই ঠাকুর রচিত। এই দুই লীলার অন্তর্নিহিত অভিন্নত্ব সমগ্রভাবে ও নানাদিক দিয়া আস্বাদন করা এবং আস্বাদন করানো গ্রন্থকারের

উদ্দেশ্য।...পাশাপাশি বাঙ্গলার এই দুই ভাবের ঠাকুরের জীবনের লীলারস-প্রসঙ্গ লেখকের শ্রদ্ধার অবদানে সর্বত্র সাবলীল এবং মধুর হইয়া ফুটিয়াছে। গ্রন্থকারের বর্ণন-ভঙ্গীটি বড় সুন্দর। ভাষার সহজগতি গভীরভাবে মনকে স্পর্শ করে। গূঢ়তত্ত্ব কথাগুলিও রসভঙ্গীতে যুক্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। ভাবানুভূতির বৈচিত্র্যে উচ্ছল ও উজ্জ্বল এমন আলোচনা পাঠ করিয়া সকলে উপকৃত হইবেন। [**দেশ :** ১১ই আষাঢ়, ১৩৫৬]

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য এম্‌-এ : ·উভয় অবতার-পুরুষের জীবন, সাধনা ও মত এইগুলির সামঞ্জস্য দেখাইতে গ্রন্থকার উভয়ের সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রায় সকল গ্রন্থ হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। যে ভাবে তিনি উভয়ের জীবনের ঘটনার অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে হয়।··গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য, অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারশক্তি সমান প্রশংসার যোগ্য। [**আনন্দবাজার পত্রিকা :** ৮ই শ্রাবণ, ১৩৫৬

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পিএইচ-ডি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) :... শ্রীচৈতন্যের শক্তি-আরাধনা সম্বন্ধীয় এরূপ সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থকার যেরূপ অখণ্ডনীয় যুক্তিতর্কের সাহায্যে মাধবেন্দ্রপুরীর শাঙ্কর-সম্প্রদায়-ভুক্তি প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহাতে বিরুদ্ধমতাবলম্বী পণ্ডিতগণেরও মত-পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয়। [**দৈনিক বসুমতী :** ২২শে শ্রাবণ, ১৩৫৬

Amrita Bazar Patrika (October 23 1949) ···Well-written and well documented the book is a valuable contribution to the literature on Sri Ramakrishna and Sri Chaitanya Dev. It is indeed a new approach to the comparative study of the lives of two greatest world personalities·

৩। শ্রীশ্রীসারদামঙ্গল

আনন্দবাজার পত্রিকা :...অলৌকিক চরিত্রের কাহিনী যখন কবিতার মধ্যে রূপ লইল তখনই তাহা স্থায়ী হইয়া গেল। কারণ জনসাধারণের সর্বস্তরের হৃদয়ে পৌঁছিবার পথ প্রবন্ধে নহে, কবিতায়। কবিতায় রচিত হইলেও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকাহিনীর ক্রম ও ঘটনা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। রচনার মধ্যে অত্যন্ত সরল বর্ণনায় লেখক জীবনকাহিনীকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। কবিতাগুলির রচনা সরল ও সুন্দর। গ্রন্থের অধিকাংশ পয়ার ছন্দে রচিত হওয়ায় অনেকটা পুরাণের আকার পাইয়াছে। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের

আপনার অনুভূতি ও উপলব্ধি এই রচনার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া ইহাকে মাত্র জীবনকাহিনী অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে উঠাইয়াছে। তাহার শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিতে পারি ; তাহা অপেক্ষাও অধিক সার্থক হইয়াছে তাঁহার ভক্তি।

Hindusthan Standard This handy volume treats of the principal events of Holy Mother's life beautifully depicted in simple Bengali verse Ramakrishna said of Holy Mother She is Sarada Goddess of learning incarnated to impart knowledge' The author is Her direct disciple and that he inherits Her gift of knowledge' is evident from his skilful setting and knitting of facts in the most concise form This precious attempt is the first of its kind and its plainly alluring style will, no doubt, facilitate an easy access into every hearth and home of Bengal

The author is lucky enough to have the unique privilege to fulfil the sacred mission of bringing to light the life portrait of the Divine Motherhood of this new era

৪। শ্রীশ্রীসারদানন্দ-প্রসঙ্গ

(জীবনী—কথাবার্তা—উপদেশ)

দেশ : পুস্তকের প্রথম ভাগে স্বামিজীর জীবনকথা সম্পাদক মহাশয় সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তাহার রচনা চিত্তাকর্ষক এবং সাধারণের উপযোগী। বইখানি যে ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে তাহাতে ইহা সাধারণ লোকের পক্ষে ধর্মজীবনের নির্দেশক হইতে পারে।

উত্তরা'য় বিখ্যাত সাহিত্যিক **শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :** শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য, চির আত্মগোপন-অভ্যাসী এই মহাপুরুষের জীবনী ও উপদেশাদি পুস্তকাকারে গ্রথিত ক'রে, একটি খুব বড় কাজ করেছেন। বহু নরনারী বইখানি প'ড়ে শান্তি ও জ্ঞাতব্য কথা পাবেন, যা তাঁদের মনে মধ্যে মধ্যে উদয় হয়েছে অথচ পরিষ্কার হয় নি, যার সরল সমাধান তাঁরা পান নি।